কলকাতার গুপ্ত সমিতি : উনিশ শতক

প্রতাপ মুখোপাধ্যায়

পরিবেশক

পুস্তক বিপণি

২৭, বেনিয়াটোলা লেন ॥ কলিকাতা-৯

প্রকাশক : প্রতীপকুমার মুখোপাধ্যায়, এম্, এস্, সি
মৈত্রেতি-প্রকাশন
পি-৫৭, ব্লক-ডি, বাঙ্গুর এ্যাভেনিউ,
কলিকাতা—৫৫

প্রথম প্রকাশ : শুভ মহালয়া, ১৩৯২

প্রচ্ছদ শিল্পী : রবিন মণ্ডল

প্রচ্ছদ ব্লক ও মুদ্রণ : ইম্প্রেসন হাউস, কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর : শ্রীপুলিন বেরা
দি সরস্বতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২, গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন
কলিকাতা—৬

পূজনীয় পিতৃদেব ভূতনাথ মুখোপাধ্যায়
পূজনীয়া মাতৃদেবী সরোজা দেবী
পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে —

সূচীপত্র ঃ

মুখবন্ধ ঃ

মুখ বন্ধ না করে খুলে বলাই ভাল যে আমি ঐতিহাসিক নই, নিছক সাহিত্যের ছাত্র মাত্র। এক যুগেরও অধিককাল পূর্বে, অবিভক্ত বাংলার প্রত্যন্ত জেলা চট্টগ্রামের উনিশ-বিশ শতকের কবি-সাহিত্যিকদের সম্পর্কে অনুসন্ধান-সূত্রে 'হিন্দুস্থান ইউনিয়ন নামে কলকাতার সাধারণ ছাত্র-সৃষ্ট একটা গুপ্ত-সমিতির সন্ধান পাই। তারপর থেকে ধীরে ধীরে আমার সাধ্যমত পরিশ্রম ও অনুসন্ধানে 'কলকাতার প্রথম গুপ্তসমিতি' নামে একটা প্রবন্ধ খাড়া করে তুলি। প্রবন্ধটির খসড়ায় 'সঞ্জীবনী সভা' সম্পর্কে সাধারণ কিছু মন্তব্য ছিল। প্রবন্ধটি পুস্তিকাকারে প্রকাশের জন্যে আমার কিছু শুভার্থীর অনেকদিনের তাগিদায় বৎসর খানেক আগে প্রবন্ধটিকে, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'সাফ সোফ' করতে বসে বিষয়টি নিয়ে আবার নতুন করে ভাবনা-চিন্তা ও বইপত্রাদি দেখা শুরু করি। তার ফলে 'সঞ্জীবনী সভা' সম্পর্কে আমার বক্তব্যকে প্রকাশ করতে 'সঞ্জীবনী-সভা ঃ কিছু প্রাসঙ্গিক সংশয় ও প্রশ্ন' নামে একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধের সৃষ্টি হয়। উপস্থিত ক্ষেত্রে সেই প্রবন্ধ দুটিকে গ্রন্থবদ্ধ করার ফলে দুটি সমিতির সময়কালের মধ্যে পার্থক্য খুব অল্প হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই বহু তথ্যের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। আশা করি সহৃদয় পাঠক এটি ক্ষমা করবেন।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বিতীয়বার (১৮৭৫ সালে কলকাতায় ফেরা এবং মেট্রোপলিটান ইন্‌ষ্টিটিউশন ও স্টুডেন্টস্ এ্যাসোসিয়েশনে যোগদান সম্পর্কে লেখা আমার একটি প্রবন্ধ দীর্ঘকাল 'কলকাতা পুরশ্রী' পত্রিকায় প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে। পাদটীকায় সেটির উল্লেখ থাকার জন্য লজ্জিত।

কোন এক অপরাহ্নে ঝড়ের মধ্যে গঙ্গার ধারে 'সঞ্জীবনী সভা'র সভাপতি বৃদ্ধ রাজনারায়ণ বসুর হাত-পা নেড়ে প্রবল উৎসাহে গান গাওয়ার দৃশ্যকে বর্ণনা করতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'সূত্রের চেয়ে ভাষ্য যেমন অনেক বেশি হয়…' ইত্যাদি, এই গ্রন্থেও অনেকটা সেই ব্যাপারই হয়েছে। এখানে মূলরচনার চেয়ে পাদটীকার বাহুল্য দেখে অনেকেরই 'বারো-হাত কাঁকুড়ের তেরো-হাত বিচি'র কথা মনে পড়বে। এক্ষেত্রে কথাকার সৈয়দ মুজতবা আলীর একটি রচনাংশ স্মরণ করে ভরসা পাবার চেষ্টা করছি, '…ফুটনোটে থাকবার কথা মূলগল্পের বক্তব্যের সঙ্গে সম্পর্কিত নানা প্রকারের আশা-কথা পাশ-কথা, যেগুলো অত্যধিক কৌতূহলী পাঠক পড়েন যাতে করে কিঞ্চিৎ ফাল্‌তো জ্ঞানসঞ্চয় হয়, কিংবা / এবং যাঁরা

বইখানা পয়সা দিয়ে কিনেছেন বলে বিজ্ঞাপনতক্ বাদ দেন না…' ('হিটলার', ১৩৭৭। পৃঃ ১২৬)

এ গ্রন্থ প্রকাশে যাঁরা আমাকে উৎসাহ দিয়েছেন—অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু, অধ্যাপক ডঃ অমলেন্দু দে, অধ্যাপক চিত্তপ্রিয় ঘোষ (কবি শঙ্খ ঘোষ), অধ্যাপক মৃদুলকান্তি বসু, অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুরউদ্দিন (ঢাকা), অধ্যাপক ডঃ আহমদ শরীফ (ঢাকা), জনাব আবদুল হক চৌধুরী (চট্টগ্রাম), অধ্যাপক ডঃ নরেশচন্দ্র জানা, অশোক উপাধ্যায়, হরিপদ ভৌমিক—এঁদের সঙ্গে আমার যেরূপ সম্পর্ক, তাতে মামুলী ধন্যবাদ জ্ঞাপনের অবকাশ নেই। গ্রন্থের প্রুফ দেখা, শব্দসূচী প্রস্তুত করা ইত্যাদি যাবতীয় কর্মের দায়িত্ব নিয়ে আমার স্ত্রী অধ্যাপিকা ডঃ প্রীতি মুখোপাধ্যায় আমাকে নিশ্চিন্ত করেছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, জাতীয় গ্রন্থাগার, প্রেসিডেন্সী কলেজ ও সংস্কৃত কলেজ লাইব্রেরী থেকে প্রয়োজনীয় গ্রন্থাদি পাওয়ার ব্যাপারে অকৃপণ সহায়তা পেয়েছি। এই সব গ্রন্থাগারের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে এজন্য বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। শিল্পী রবিন মণ্ডল-কৃত প্রচ্ছদ আমাদের আবাল্যের বন্ধুত্বের স্মারক।

দি সরস্বতী প্রিন্টিং ওয়ার্কর্সের কর্মিবৃন্দের প্রচেষ্টায় গ্রন্থটির মুদ্রণ কার্য সম্পন্ন হয়েছে এবং পুস্তক বিপণির শ্রীঅনূপ মাহিন্দার গ্রন্থটি পরিবেশনার দায়িত্ব নিয়েছেন। এজন্য এঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

পরিশেষে মহাকবি কালিদাসের একটি মহাবাক্য স্মরণ করে আমার মুখ বন্ধ করছি—'আপরিতোষাদ্ বিদুষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগ-বিজ্ঞানম্'।

শুভ মহালয়া ১৩৯২

পি-৫৭, ব্লক ডি, বাঙ্গুর এ্যাভেনিউ, কলিকাতা-৫৫

প্রতাপ মুখোপাধ্যায়

১০
হিন্দুস্থান ইউনিয়ন

১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে বঙ্গবিভাগকে উপলক্ষ করে উভয় বঙ্গেই অসংখ্য গুপ্ত সমিতির উদ্ভব হয়েছিল, যেগুলির মাধ্যমে ভারতবর্ষ থেকে ইংরেজ শাসন উচ্ছেদের জন্যে অচিরে নাশকতামূলক কাজকর্ম শুরু হয়। ক্রমেই তার পরিধি বিস্তৃত হয়ে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে, এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে উগ্র বিপ্লবীদের নেতৃত্বে ভারতব্যাপী সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রয়াস ব্যর্থ হলে ইংরেজ সরকার আতংকিত হয়ে পড়ে। ফলে, এই অবস্থার কার্যকরী প্রতিষেধক অন্বেষণার্থে তদানীন্তন ভারত সরকার বিচারপতি রাউলাটের নেতৃত্বে চার সদস্য বিশিষ্ট যে অনুসন্ধান-সমিতি ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে গঠন করে, সেই কমিটি ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে সরকারের কাছে একটি বিস্তৃত বিবরণ পেশ করে, যা 'Sedition Committee (1918) Report' নামে পরিচিত। এই রিপোর্টের 'Revolutionary Conspiracies in Bombay' শীর্ষক প্রথম অধ্যায়ে লেখা হয়েছিল যে, বোম্বাইয়ের 'গণপতি উৎসব' ও 'শিবাজী উৎসব'কে কেন্দ্র করে ভারতে বিপ্লবাত্মক কর্মধারার সূত্রপাত হয়।

ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপে লিপ্ত না হলেও (কেননা তখনো ঠিক সেরূপ অবস্থা সৃষ্টি হয়নি) ইংরেজ শাসন-শোষণে বীতস্পৃহ কলকাতার কিছু কিশোর ও সদ্য যৌবন-প্রাপ্ত ছাত্র, গণপতি বা শিবাজী উৎসবের প্রায় বৎসর কুড়ি আগেই যে গুপ্ত-সভাদি স্থাপনে অগ্রসর হয়েছিল, সেই সংবাদ বলতে গেলে আমরা প্রথম পাই 'প্রবাসী' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে (মাঘ ১৩৩৩ থেকে বৈশাখ ১৩৩৫ পর্যন্ত) প্রকাশিত বিপিনচন্দ্র পাল-এর (১৮৫৮-১৯৩২) স্মৃতিকথা 'সত্তর বৎসর' নামক রচনার 'বিপ্লব বাদের খেলা' (১৩৩৪ মাঘ) শীর্ষক অধ্যায়টি থেকে (সমগ্র রচনাটি ১৯৬২ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে 'সত্তর বৎসর' গ্রন্থ রূপে প্রকাশিত), যেখানে তিনি লিখেছেন—"কি করিয়া ম্যাটসিনি ও ইয়ং ইতালী (Young Italy) সমাজের সভ্যবা নিজেদের মাতৃভূমিকে অষ্ট্রিয়ার শাসন হইতে মুক্ত করিবার চেষ্টা করেন, সুরেন্দ্রনাথের মুখে এই কাহিনী শুনিয়া আমাদের অন্তরে একটা নূতন স্বদেশপ্রেমের প্রেরণা আসে। ম্যাটসিনি প্রথমে প্রাচীন বিপ্লববাদী কারবনারাইদিগের (Carbonari) সঙ্গে

ছুটিয়া পড়েন। কারবনারাই দল দেশময় বহু সংখ্যক গুপ্ত রাষ্ট্রীয় সমিতি গঠন করিয়াছিলেন…কারবনারাইদিগের কথা কলিকাতার ছাত্রমণ্ডলীকে একরূপ পাগল করিয়া তুলিয়াছিল, দলে দলে মিলিয়া তাহারা কারবনারাই-দিগের অনুকরণে নিজেদের মধ্যে ছোট ছোট গুপ্ত সমিতি বা (Secret Society) গড়িবার চেষ্টা করেন।" (পৃ. ৪৮০) বৎসর পাঁচেকের মধ্যেই ইংরেজি ভাষায় 'Memories of My Life and Times' লেখবার সময়ে 'Birth of our new Nationalism' অধ্যায়ে বিপিনচন্দ্র ঐ একই কথা বলেছেন—"…the new inspiration imparted to young Bengal by Surendranath's presentation of the life of Mazzini and the Italian freedom led many of us to form secret organisations. Calcutta student community was at that time almost honey-combed with these organisations" (p.247)। তিনি এরূপ কোনো গুপ্ত-সমিতির নামধাম ('সত্তর বৎসর'-এর মতো) এই রচনাতেও বলেন নি। তবে এমন একটি সমিতির কথা বলেছেন, যে সমিতির সভ্যরা তলোয়ারের অগ্রভাগ দ্বারা বুকের রক্ত বার করে সেই রক্ত দিয়ে প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষর করতো[১], এবং সঙ্গে সঙ্গে এ সংবাদও দিয়েছেন যে, সুরেন্দ্রনাথ এইরূপ বহু গুপ্ত-সমিতির 'সভাপতি' ছিলেন।[২]

বিপিনচন্দ্র পালের অনেক আগেই রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি' ধারাবাহিক ভাবে 'প্রবাসী' পত্রিকায় (ভাদ্র ১৩১৮ থেকে শ্রাবণ ১৩১৯ পর্যন্ত ১২টি সংখ্যায়) প্রকাশিত হয়, এবং পত্রিকায় প্রকাশিত এই রচনার সঙ্গে বহু অংশ সংযোজিত ও কিছু অংশ বর্জিত ও সংশোধিত হয়ে ১৯১২ খ্রীস্টাব্দের ২৫ জুলাই 'জীবনস্মৃতি' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।[৩] এই গ্রন্থের 'স্বাদেশিকতা' অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কৈশোরকালে (রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন বছর ষোল) জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উৎসাহে ও রাজনারায়ণ বসুর 'সভাপতি'ত্বে ঠনুঠনের এক পোড়ো বাড়িতে তাঁদের যে একটি 'গুপ্ত সভা' গড়ে উঠেছিল, তার বর্ণনা করেছেন। এই সভাটির কোনো নাম তিনি বলেন নি, সঠিক সময়কালও নির্দেশ করেন নি, বলেছেন 'স্বাদেশিকের সভা'।[৪] এর দু-বৎসরের মধ্যে 'ভারতী' পত্রিকায় (১৩২১ বৈশাখ সংখ্যা থেকে বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় অনুলিখিত) 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়ে ১৩২১ ফাল্গুন সংখ্যায় সমাপ্ত হয়। (এ রচনাটিও 'পরিবর্ধিত, পরিবর্তিত ও পরিবর্জিত' হয়ে 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি' নামেই

১৩২৬ ফাল্গুনে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।) এখানে দেখা যায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 'সঞ্জীবনী সভা' নামে একটি গুপ্ত-সমিতির কথা উল্লেখ করেছেন, যার 'অধ্যক্ষ' ছিলেন 'বৃদ্ধ রাজনারায়ণ বসু' এবং 'কিশোর রবীন্দ্রনাথ', নবগোপাল মিত্র প্রভৃতি তার সভ্য ছিলেন।[৫] 'জ্যোতিবাবুর উদ্ভাবিত এক গুপ্ত ভাষায়' সভার 'কার্যবিবরণী' লিখিত হতো এবং 'এই গুপ্ত ভাষায়, 'সঞ্জীবনী সভা'-কে হাঞ্চুপামুহাফ ['হাম্চুপামুহাফ্'] বলা হইত।' এখানেও সমিতিটির সময়কাল বলা হয়নি।

সাপ্তাহিক 'বিজলী' পত্রিকার ১৩২৯-৩০ সালে বহু-বিজ্ঞাপিত ও একাধিকবার নাম পরিবর্তনের[৬] পর প্রায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত বারীন্দ্রকুমার ঘোষের 'বোমার যুগের কাহিনী' রচনাটিতে এই সমিতিটির উল্লেখ পাওয়া যায় এই ভাবে : "প্রথম যখন দাদাবাবুরা [তাঁর 'দাদাবাবু' অর্থাৎ মাতামহ রাজনারায়ণ বসু] যুবা ও হাজার হুজুগের রঙ্গী ছিলেন, তখন তাঁরা একবার এক গুপ্ত-সমিতি স্থাপন করেন, এখনকার অনেক বড় বড় মানুষ তাতে ছিলেন, তাঁদের কয়েকজন এখনও ইহলোকে, বাকি পরলোকে।"[৭] এখানেও সমিতিটির নাম বা তার সময়কাল বলা হয়নি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সত্তর বৎসর পূর্তি উপলক্ষে কলকাতার টাউন হলে পাঠ করবার জন্যে যে রচনাটি লেখেন, সেখানে আর একবার তাঁদের এই সমিতিটির কথা এইভাবে স্মরণ করেছিলেন : "জ্যোতিদাদা এক গুপ্ত সভা স্থাপন করেছেন, একটি পোড়ো বাড়িতে তার অধিবেশন, ঋগ্‌বেদের পুঁথি, মড়ার মাথার খুলি আর খোলা তলোয়ার নিয়ে তার অনুষ্ঠান, রাজনারায়ণ বসু তার পুরোহিত, আমরা সেখানে ভারত উদ্ধারের দীক্ষা পেলেম।"[৮] এখানে রবীন্দ্রনাথ সভাটিকে 'গুপ্ত সভা' বলে উল্লেখ করেছেন বটে, কিন্তু তার নাম দেননি বা সময়কালও বলেন নি।

বিপিনচন্দ্র পাল-কথিত উনিশ শতকের সত্তরের দশকে ছাত্রদের গুপ্ত-সমিতি স্থাপনের সংবাদ এবং ঐ কালেই গঠিত 'সঞ্জীবনী সভা'র উল্লেখ পেয়ে কোনো কোনো ঐতিহাসিক সত্তরের দশকের ছাত্রদের গুপ্ত-সমিতির নিদর্শন হিসাবে এই 'সঞ্জীবনী সভা'কে দাঁড় করাবার যে চেষ্টা করেছেন, তা যে কোনো-ভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়, এ বিষয়ে আমরা পরবর্তী 'সঞ্জীবনী সভা' অধ্যায়ে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করে দেখিয়েছি। এই 'সঞ্জীবনী সভা' ছাড়া বিপিনচন্দ্রের বক্তব্যকে সমর্থন করবার মতো ছাত্রদের সৃষ্ট আর কোনো গুপ্ত-সমিতির সন্ধান বিপ্লব-আন্দোলনের ইতিহাস লেখকরা আমাদের এতাবৎকাল দিতে পারেন

নি। দীর্ঘদিন নানা বিষয়ে ইতস্তত অনুসন্ধান-সূত্রে উনিশ শতকের সত্তরের দশকের এরূপ ছাত্র-সৃষ্ট একটি গুপ্ত-সমিতির অস্তিত্ব সম্পর্কে আমরা কিছু সংবাদ সংগ্রহ করেছি, যে-সমিতিটি পূর্বোক্ত 'সঞ্জীবনী সভা'র[৯] কিছু পূর্বে, ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দের প্রায় শেষদিকে (সঠিক সময় কাল পাইনি) কলকাতার ছাত্র সমাজে গড়ে উঠেছিল।

তবে সে সমিতিটির সম্পর্কে আলোচনা করার পূর্বে দেশের তৎকালীন আবহাওয়া, বিশেষভাবে তৎকালীন ছাত্রদের অবস্থা সম্পর্কে আমাদের কিঞ্চিৎ অবহিত হওয়া প্রয়োজন বলে মনে করি। ঐতিহাসিকরা একটি বিষয়ে সকলেই প্রায় একমত যে, উনিশ শতকের এই সত্তরের দশকটি নানা কারণে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।[১০] কিন্তু এই দশকটি স্বয়ম্ভূ নয়, বিভিন্ন ঘটনার টানাপোড়েন ও ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে এই দশকের যে বিশেষ আব-হাওয়াটি গড়ে উঠেছিল, যা তৎকালীন ছাত্রদের মধ্যে গুপ্ত-সমিতি স্থাপনের মতো প্রেরণা-সঞ্চারক বাতাবরণ সৃষ্টি করেছিল—সেই বিশেষ দশকটির তাৎপর্য বোঝবার জন্যে আমাদের ইতিহাসের কিছু উজানে যাওয়া দরকার।

ইংরেজ 'বণিকের মানদণ্ড' কিভাবে ভারতের 'রাজদণ্ড' হয়ে উঠেছিল, তা আমাদের জানা আছে, এবং প্রথমাবধি ভারতের সকল শ্রেণীর সমস্ত মানুষই যে ইংরেজ-ভক্তিতে গদগদ ছিল না, এ সংবাদও আমাদের অজানা নয়। সেই দূর-অতীতের সমস্ত কিছুর পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা বা বিশ্লেষণের মধ্যে না গিয়ে, আমরা বর্তমান ক্ষেত্রে উপস্থাপিত বিষয়টির প্রাথমিক ধারণালাভের জন্যে কতকগুলি স্থূল ঘটনার দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

উনিশ শতকের তিনের দশকে নারকেলবেড়িয়ায় বাঁশের কেল্লা নির্মাণ করে তিতুমীর যেভাবে ইংরেজ-শক্তিকে প্রতিহত করার চেষ্টা করেছিলেন, একালের রাজনীতি-মনস্ক গবেষক তার মধ্যে ইংরেজ শাসনের[১১] বিরুদ্ধে গণ-অসন্তোষের বীজ আবিষ্কার করার চেষ্টা করেছেন।[১২] একে 'গণ-অসন্তোষ' বলে মেনে নিতে যাঁদের আপত্তি আছে, তাঁদের আমরা ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের 'সিপাহী বিদ্রোহে'র কথা স্মরণ করিয়ে দিতে পারি। নানা কারণে সেকালের শিক্ষিত সমাজের একটা বড় অংশ সেদিন সিপাহিদের অভ্যুত্থানকে নিন্দা করে ভারতে ইংরেজ-রাজত্বের স্থায়িত্ব কামনা করেছিল বটে, কিন্তু সেই সমাজেরই একটা ক্ষুদ্র অংশ যে এই অভ্যুত্থানকে সমর্থন জানিয়েছিল[১৩], এমনকি সিপাহিদের সাহায্যার্থে সাধারণ মানুষও যে কোথাও কোথাও এগিয়ে এসেছিল[১৪], সংবাদ হিসাবে এগুলিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। বস্তুত-

অভিজাত তথা রাজন্যবর্গের স্বার্থের সঙ্গে কিছু সংখ্যক সাধারণ মানুষের সহেতুক ইংরেজ-বিদ্বেষও যে এই বিদ্রোহ ব্যাপারে জড়িত ছিল, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই, এবং এই কারণে এই বিদ্রোহের চরিত্রটিকে ঐতিহাসিকের ভাষায় অনেকটা 'feudal revolt though national in magnitude'[১৫] বলে উল্লেখ করা যায়।

এই সঙ্গে আরো কয়েকটি বিষয়েও আমাদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়। প্রথম- ৮৫ খ্রীস্টাব্দের ঘোষণাপত্র ('Proclamation') দ্বারা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির 'কোর্ট অফ ডিরেকটার্সে'র হাত থেকে মহারাণী ভিকটোরিয়া ভারতের শাসনভার নিজের হাতে তুলে নিচ্ছেন। দ্বিতীয়— বিদ্রোহ দমনের অজুহাতে প্রতিহিংসা পরায়ণ ইংরেজরা সিপাহিদের সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ-লক্ষ নিরীহ ভারতবাসীকেও হত্যা করছে[১৬], এবং তৃতীয়— বিদ্রোহের কারণ হিসেবে সদ্য-প্রতিষ্ঠিত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কেও দায়ী করে এক শ্রেণীর ইংরেজ সেদিন মত প্রকাশ করেছে।

সিপাহি বিদ্রোহের পর থেকেই ইংরেজ ও ভারতবাসীর মধ্যে সম্পর্কটা তিক্ত হয়ে উঠতে থাকে।[১৮] অবশ্য কেউ কেউ এই পারস্পরিক সম্পর্কের ক্রমাবনতি ১৮৪৯ খ্রীস্টাব্দের 'কালা-কানুন' ('Black Act') থেকে সূচিত হয়েছে বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন।[১৯] এর অনেক আগে, ১৮২২ খ্রীস্টাব্দের ১১ অকটোবর তারিখে সাপ্তাহিক ফার্সি পত্রিকা 'মিরাৎ-উল-আখবার'-এ রাজা রামমোহন রায় আয়ারল্যাণ্ডে ইংরেজ শাসনের নগ্নরূপকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেছিলেন,[২০] অত্যাচারী শাসকের পতন যে অনিবার্য তা ১৮২৫ খ্রীস্টাব্দের ১১ সেপটেম্বর তারিখে বাকিংহামকে (J. S. Bucking-ham) লেখা এক পত্রে ঘোষণা করেছিলেন।[২১] নানা দুর্দৈবের মধ্যে সদ্য জাগ্রত দেশবাসীর অন্তরে রাজা রামমোহনের বাক্যাবলী যে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভার' (১৮৩৮) খ্রীস্টাব্দের ২০ ফেব্রুয়ারি স্থাপিত 'Society for the Acquisition of General Knowledge) ১৮৪৩ খ্রীস্টাব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারির অধিবেশনে রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় (১৮১৪-৭৮) তৎকালীন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ভারত-শাসন নীতির যে তীব্র সমালোচনা করেন, সেখানে।[২২]

প্রকৃতপক্ষে সম্পর্কের ক্রমাবনতির মূলকারণ যে দেশীয়দের প্রতি শাসক জাতির সন্দেহ ও ভয় এবং তাদের (দেশীয়দের) সর্ব প্রযত্নে প্রবঞ্চিত ও অপমানিত করা থেকে উদ্ভূত হয়েছে, এটা ঐ কালেই কোনো কোনো

সহৃদয় ইংরেজও বুঝেছিলেন। বিখ্যাত 'Friend of India' পত্রিকার একদা সম্পাদক James Routledge তাঁর '*English Rule and Native opinion in India*' (London, 1878) গ্রন্থের ১৯৭ পৃষ্ঠায় জনৈক ভারতীয়ের '*Mementoes of the Government and the People*' গ্রন্থে মুদ্রিত Sir Thomas Munro-র যে উক্তি উদ্ধার করেছেন, তাই থেকে ভারতীয়দের শাসকশ্রেণী কি দৃষ্টিতে দেখেছিল, তার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়-- "The main object of our system is the degraded state in which we hold the natives. We exclude them from every situation of trust and emolument We confine them to that lowest offices, with scarcely a bare subsistence, and even these are left in their hands from bare necessity, because Europeans are utterly incapable of filling them. We treat them as an inferior race of beings." তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে রাটলেজ সাহেব আবার Sir Charles Napier-এর প্রায়-সদৃশ বক্তব্যও উদ্ধার করেছেন—"We must mix with the people, give them justice. give them riches give them honours give them share in all things until we blend with them, and become one nation. When a half caste or a full native can be Governor-General. we shall not hold India as a colony or conquest, but be part inhabitants, and as numerous as will be required to hold it as our own."

পরাধীনতার দুঃখ বেদনা প্রথমদিকে দেশীয় ভাষায় রচিত কাব্যাদির মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজেছে— ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত 'পদ্মিনী উপাখ্যান' কাব্যের মধ্য দিয়ে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২৭-৮৭) 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায় ?'— এই প্রশ্নবোধক আত্ম-বিচারণাতেই জাতির পুঞ্জীভূত মর্মবেদনাকে ভাষারূপ দান করলেন। এর দু-বছরের মধ্যেই নীলকর সাহেবদের অত্যাচারে জর্জরিত বাংলার কৃষককুলের প্রথম সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ ও অভ্যুত্থান ঘটলো এবং তদুপলক্ষে দীনবন্ধু মিত্রের (১৮৩০-৭৩) যুগান্তকারী নীলদর্পণ' (১৮৬০ খ্রীস্টাব্দ) নাটকখানি প্রকাশিত হলো। পরের বৎসর মধুসূদন দত্তর (১৮২৪-৭৩) সুবিখ্যাত 'মেঘনাদবধ কাব্য' আত্মপ্রকাশ করলো— এখানে রামায়ণাশ্রিত কথাবস্তুর বাতাবরণ ভেদ করে স্বাদেশিকতার মহৎবাণী উদ্‌গীত হয়েছে। সাহিত্যকে

আশ্রয় করে নিপীড়িত-নির্যাতিত জাতি অতঃপর দ্রুত আত্মস্থ হবার, তথা আত্মসম্বিৎ ফিরে পাবার চেষ্টা করেছে। এবং আত্মস্থ হবার চেষ্টায় বৃথা কালক্ষেপও যে তাকে করতে হয়নি, তার প্রমাণ রয়ে গেছে অনতিবিলম্বে বাংলায় প্রকাশিত সাময়িক পত্রিকাদির ক্রমবর্ধমান সংখ্যায়।

বস্তুত সিপাহি বিদ্রোহের পর দশ বৎসর অতিক্রান্ত হবার পূর্বেই বাংলা দেশে দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক ইত্যাদি পত্রিকা মিলিয়ে ৮০টিরও অধিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল[২৩], যার সবগুলিই নিছক সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্র মাত্র ছিল না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ (১৮১৯-৮৬) সম্পাদিত ও ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকাটির নাম করা যায়। প্রথমাবধি পত্রিকাটি যেন 'যুদ্ধং দেহি'মূর্তিতেই আবির্ভূত,হয় এবং লাঠির বদলে লাঠি অর্থাৎ আঘাতের বদলে আঘাত করার নীতিই যে একমাত্র গ্রহণীয়,তা নির্ভয়ে ঘোষণা করে। ভারতবর্ষ যে ভারতীয়দের এবং এদেশ শাসনের একমাত্র অধিকার যে তাদেরই, পাকে-প্রকারে একথা জ্ঞাপন করে সেদিন এই পত্রিকাটি ভয় পায়নি।[২৪] এর ওপর ইয়োরোপ ও আমেরিকার সমকালীন ঘটনাবলী,যেমন সিরিয়ায় ফরাসি-দের অনুপ্রবেশ, ইংল্যাণ্ড ও রাশিয়ার যুদ্ধ, অস্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরি এবং ডেনমার্ক ও প্রাশিয়ার সম্পর্ক, ইতালির মুক্তিসংগ্রামে কাভুরের বীরত্ব—এই সব পৃথিবী-ব্যাপী নানা সংবাদ পরিবেশনের মাধ্যমে দেশব্যাপী জাতীয়তা-উদ্বোধনে অধ্বর্যুর কাজই পত্রিকাটি করেছিল, এবং ঐতিহাসিকের মতে এইভাবে পরবর্তী কালের চরমপন্থী বিপ্লবীদের অভ্যুত্থানের পথ তৈরি হয়েছিল।[২৫] সমসাময়িক 'পূর্ণিমা', ঢাকা দর্পণ', 'পাবনা দর্পণ' ইত্যাদি পত্রিকাও দেশবাসীর মনে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্বেষভাব সৃষ্টিতে সহায়তা করেছিল।

এইসব পত্রিকার প্রভাব আলোচনা প্রসঙ্গে স্মরজিৎ চক্রবর্তী তাঁর ইংরেজিতে লেখা *'The Bengali Press'* (1977 গ্রন্থে যে মন্তব্য করেছেন, তা খুবই সমীচীন: "The post rebellion period witnessed a rapid and remarkable growth of patriotic fervour in Bengal. A powerful factor behind this development was the Press that helped the dissemination of the spirit of nationalism." (p.182)

শতাব্দীর ছয়ের দশকের মাঝামাঝি সময়েই ইংরেজ ও ভারতবাসীর মধ্যে সম্পর্কের কতদূর অবনতি ঘটেছে, তার নিঃসংশয় প্রমাণ পাওয়া যায় ভারতীয়,

বিশেষত ভারতীয় নারীদের সম্পর্কে R. Scott Moncrief নামে জনৈক স্কচ-ব্যবসায়ী যেসব অশালীন মন্তব্য করেছিলেন, তার প্রতিবাদ ও প্রত্যুত্তর দিতে গিয়ে কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-৮৪) ১৮৬৬ খ্রীস্টাব্দের ৫ই মে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের থিয়েটার হলে 'Jesus Christ: Europe and Asia' নামে যে 'বিতর্কিত'[২৬] ভাষণ দেন, তার মধ্যে। ভাষণে কেশবচন্দ্র দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানান যে, ইংরেজরা ভারতবাসীদের যেমন 'চতুর শৃগাল' বলে মনে করে, তেমনি এদেশীয়রাও ইংরেজদের 'হিংস্র ও ক্ষুধার্ত নেকড়ে বাঘ' বলে জানে।[২৭]

প্রায় এই সময়েই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫) অনন্যকর্মা যুবক নবগোপাল মিত্রের (১৮৪০-৯৪) সম্পাদনায় ১৮৬৫ খ্রীস্টাব্দের ৭ই আগস্ট থেকে '*National Paper*' নামে যে সাপ্তাহিক পত্রিকাটির প্রকাশ শুরু করেছিলেন, তাতে রাজনারায়ণ বসু-প্রস্তাবিত 'জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী [গৌরব সম্পাদনী] সভা'র অনুষ্ঠানপত্রটি প্রকাশিত হয়।[২৮] রাজনারায়ণের প্রস্তাব দ্বারা উদ্বুদ্ধ[২৯] হয়ে এবং দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৪০-১৯২৬) সহযোগিতায়[৩০] জাতীয় জীবনের সর্বদিক প্রাণবন্ত ও পুষ্ট করার উদ্দেশ্যে ১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দের ১২ এপ্রিল নবগোপাল মিত্র 'চৈত্র (হিন্দু) মেলা'র সূত্রপাত করেন। ভারতবর্ষে প্রকৃত ঐক্যবদ্ধভাবে রাজনীতি-চর্চার সূত্রপাত এখানেই প্রথম ঘটে, একথা বলা যায়।

১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দ থেকেই ভারতীয়দের 'সিভিল সার্ভিসে' প্রবেশাধিকারের জন্যে British Indian Association (১৮৫১ খ্রীস্টাব্দের ২৯ অকটোবর স্থাপিত) আবেদন করে আসছিল।[৩১] ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দে 'Indian Civil Service Act' পাশ হয়, এবং সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪২-১৯২৩) ১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দে পরীক্ষোত্তীর্ণ হয়ে সিভিল সার্ভিসে যোগদান করলে, বিলাতের ইংরেজ মহলে তা বিশেষ অসন্তোষ সৃষ্টি করে।[৩২] একারণে ঐ সার্ভিসে ভারতীয়দের প্রবেশাধিকারের পথ বন্ধ করার জন্যে ১৮৬৫ খ্রীস্টাব্দে ঐ পরীক্ষার পরীক্ষার্থীদের সর্বোচ্চ বয়ঃসীমা ২২ বৎসর থেকে কমিয়ে ২১ বৎসর করা হয়, যার ফলে ঐ বছর সর্ববিধ যোগ্যতা সত্ত্বেও মনোমোহন ঘোষ (১৮৪৪-৯৬) বাতিল হয়ে যান।[৩৩] ভারতে এই ব্যাপারে তীব্র অসন্তোষ দেখা দেয়। ভারতীয়-ছাত্রদের মঙ্গলার্থে দাদাভাই নৌরোজী (১৮২৫-১৯১৭) কর্তৃক ১৮৬৬ খ্রীস্টাব্দে লণ্ডনে প্রতিষ্ঠিত সমিতি 'East India Association' সিভিল

সার্ভিসে প্রবেশাধিকারের চক্রান্তের বিরুদ্ধে ১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দ থেকে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করতে শুরু করে। ১৮৬৮ খ্রীস্টাব্দের ১৩ মার্চ British Indian Association পুনরায় এই বিষয়ে (অর্থাৎ বয়ঃসীমা না কমানোর জন্যে) আবেদন পেশ করে।[৩৪] 'শিক্ষিত বাঙালিদের উত্তরোত্তর চাহিদা বৃদ্ধির বহর দেখে বহু ইংরেজই তখন মনে করতে শুরু করেছিল যে, ভারতীয়দের শিক্ষা দিলেও তারা আর ঠিক সন্তুষ্ট বা যথেষ্ট রাজভক্ত হয়ে উঠবে না।[৩৫] ভারতীয়দের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার সম্পর্কে ইংরেজদের এই প্রকার সহানুভূতিহীন কঠোর মনোভাবের কারণ অনুসন্ধান-সূত্রে ১৮৬৮ খ্রীস্টাব্দের ১২ মার্চ তারিখের 'বেথুন সোসাইটি'র (১৮৫১ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত) সভায় তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (১৮৪১-৮৯) যা বলেন, তার মূল কথাটি হলো- ইংরেজরা ভারতবর্ষ ত্যাগ করে না যাওয়া পর্যন্ত ভারতের সত্যকার উন্নতির কোনো আশা নেই।[৩৬]

মূলত ধর্মীয় ব্যাপার হলেও উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ভারতে 'ওয়াহাবী'দের যে সন্ত্রাসমূলক[৩৭] কার্যকলাপ শুরু হয়েছিল, সিপাহি-বিদ্রোহের প্রায় পাশাপাশি রাজনৈতিক লক্ষ্যানুসারী সেই আন্দোলনের তীব্রতা সেদিন ভারতে ইংরেজ শাসনকে রীতিমতো শঙ্কিত ও কিছু পরিমাণে পর্যুদস্ত করে তুলেছিল। নানা কূটকৌশল অবলম্বন করে ও সামরিক শক্তির সহায়তায় ছয়ের দশকের শেষদিকে ইংরেজ সরকার ওয়াহাবী-আন্দোলনকে প্রায় ধ্বংস করে দেয় এবং এই আন্দোলনের সঙ্গে কোনোভাবে-জড়িত এরূপ সাবধানী-সন্দেহ-ক্রমে ধৃতব্যক্তিদের ভারতের বিভিন্ন স্থানে ও বাংলার রাজশাহী, রাজমহল, মালদহ প্রভৃতি স্থানে ১৮৬৯ খ্রীস্টাব্দ থেকে বিচারকার্য শুরু করে। কলকাতার কলুটোলার বিখ্যাত চর্ম-ব্যবসায়ী ৮০ বৎসর বয়স্ক আমীর খাঁ ও তাঁর ভ্রাতা হাসমৎ দাদ খাঁকে কারাগারে বন্দী করে কলকাতা হাইকোর্টে তাঁদের বিচারের ব্যবস্থাও হয়— প্রায় এই সময়ে।

আবার ছয়ের দশকের শেষদিকে আয়কর প্রথা ('Income Tax') চালু হলে, ১৮৬৯ খ্রীস্টাব্দের অকটোবর মাসে তা জনসাধারণের মধ্যে প্রবল আতঙ্কের সৃষ্টি করে, এবং দেশীয় সংবাদপত্রগুলি এই বিষয় নিয়ে আন্দোলন গড়ে তোলে।[৩৮]

এই সময়ে ধর্মীয় তথা সামাজিক ক্ষেত্রে দেখা যায়, কেশবচন্দ্র ও তাঁর মতানুবর্তী প্রাগ্রসর ব্রাহ্মসমাজ সমাজ-সংস্কারের উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যেই যে নূতন বিবাহবিধি প্রণয়নের জন্যে চেষ্টা শুরু করেছিলেন, তার বিরুদ্ধে রক্ষণ-

শীল হিন্দু সমাজ ও 'আদি ব্রাহ্মসমাজ' সোচ্চার হয়ে উঠেছে। এমনকি British Indian Association-ও প্রতিবাদ-পত্র প্রেরণ করেছে।[৩৯]

ভারতবর্ষকে চতুর্দিক থেকে অকটোপাশের মতো দীর্ঘদিন ধরে ঘিরে ইংরেজরা উপোসী ছারপোকার মতো যেভাবে শোষণ করে আসছিল[৪০] তাতে ভারতের সর্বত্র ক্রমান্বয়ে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ ঘটছিল[৪১], নিত্যব্যবহার্য জিনিস-পত্রের মূল্য সাধারণ মানুষের ক্রয়-ক্ষমতার বাইরে চলে যাচ্ছিল[৪২], মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে বেকারের সংখ্যা অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছিল।[৪৩] এরূপ অবস্থার সম্ভাবনার প্রতি ইঙ্গিত করে কিছুদিন পূর্বেই 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকা যেন সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিল—"রাজপুরুষেরা ভারত-ভূমিকে কামদুঘ বোধ করিয়া নিরন্তর অর্থ দোহন করিতেছেন, কিন্তু ইহার সন্তানগণ অজ্ঞান অন্ধতমসে মগ্ন হইয়া বিষণ্ণ হইতেছেন। ইহা অত্যন্ত ক্ষোভের বিষয়।"[৪৪] এই ধূমায়িত 'ক্ষোভ' অতঃপর নবগোপাল মিত্র সম্পাদিত '*National Paper*'-এর মধ্য দিয়ে ছয়ের দশকের শেষ দিকে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে।[৪৫]

মোটামুটি ভাবে দেশের এই প্রকার আবহাওয়া তথা পারিপার্শ্বিকের পট-ভূমিকায় সত্তরের দশক শুরু হলো। এই দশকটির প্রারম্ভেই 'উন্নতির সূত্রপাত হয়েছে' বলে তদানীন্তন গভর্নর-জেনারেল লর্ড মেয়ো (Lord Mayo) ঘোষণা করেছিলেন।[৪৬] ১৮৭০ খ্রীস্টাব্দ থেকে বাংলা তথা ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের 'এক নূতন পর্ব' শুরু হয়, এরূপ অভিমতও কেউ কেউ প্রকাশ করেছেন।[৩৬ক] যোগেশচন্দ্র বাগল এই দশকটিকে বাঙালি-জীবনের একটি 'গৌরবময় যুগ' অভিধায় চিহ্নিত করেছেন।[৪৭] রামায়ণ মহাকাব্যের উপোদ্‌ঘাতে ক্রৌঞ্চবধ-ঘটনাটি যেমন সমগ্র কাব্যটির রসসিদ্ধির সূচক, তেমনি এই দশকের শুরুতেই, অর্থাৎ ১৮৭০ খ্রীস্টাব্দে, রাজদ্রোহ-মূলক রচনাদির জন্যে শাস্তির ব্যবস্থা করে ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধি আইনে ('Indian Penal Code যে সংশোধন ও সংযোজন করা হলো, তা এই গুরুত্বের পূর্বসূচনা করেছে বলা যায়।[৪৮]

অনেক দিন ধরেই ভারতীয়দের, বিশেষত শিক্ষা-দীক্ষায় ভারতের অন্য প্রদেশ থেকে অগ্রগামী বাঙালিদের[৪৯] উচ্চশিক্ষার পথ রুদ্ধ করার চক্রান্ত বিলাতের কর্তৃপক্ষ মহলে শুরু হয়েছিল। ভারতের বড়লাট লর্ড মেয়ো তাঁর জনৈক বন্ধুকে এ বিষয়ে এক পত্রে লিখেছিলেন: "If you wait till the bad English, which the four hundred Babus learn in Calcutta,

filters down into the 40 millions of Bengal, you will be ultimately a Silurian rock instead of a retired judge. Let the Babu learn English by all means. But let us also try to do some thing towards teaching the three R's to Rural Bengal."[৫০] অতএব দেশের অশিক্ষিত মানুষের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের অজুহাতে উচ্চ শিক্ষার পথ রুদ্ধ করার জন্যে ১৮৬৯ খ্রীস্টাব্দের সেপটেম্বর মাসে ভারত সরকারের সিদ্ধান্ত ('Government of India's Resolution of September, 1869') ঘোষিত হলো।

ভারত সরকার বাংলা দেশে ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারের বিরোধী বলে বাঙ্গালিদের মনে অনেক দিন থেকে যে বিশ্বাস জন্মেছে, তাতে ভারত সরকারের বর্তমান সিদ্ধান্ত যে বিষময় প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে, একথা জানিয়ে তদানীন্তন বাংলার ছোটলাট স্যার উইলিয়াম গ্রে (Sir William Grey) বিষয়টি পুনর্বিবেচনার জন্যে ভারত সরকারকে অনুরোধ করলেন।[৫১] কিন্তু ইতিমধ্যেই বিষয়টি নিয়ে বাংলা দেশের শিক্ষিত মহলে প্রবল আলোড়ন উপস্থিত হলো জেলায় জেলায় প্রতিবাদ-সভা অনুষ্ঠিত হতে লাগলো। British Indian Association-এর উদ্যোগে ও রমানাথ ঠাকুরের (১৮০১-৭৭) সভাপতিত্বে কলকাতা টাউন হলে ১৮৭০ খ্রীস্টাব্দের ২রা জুলাই একটি বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত হলো। বাংলা দেশের ১৯টি জেলার প্রতিনিধিরা সভায় উপস্থিত হলেন। সভায় সরকারের শিক্ষানীতির সমালোচনা করে যাঁরা বক্তব্য রাখেন, তাঁদের মধ্যে রাজা জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (১৮০৮-৮৪), মহারাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববাহাদুর (১৮২২-১৯০৩), রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র (১৮২২-৯৪) ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার (১৮৩৩- ৯০৪) অন্যতম। প্রারম্ভে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যায় এ বিষয়ে ইতিমধ্যেই যে ৪৩টি সভা হয়ে গেছে, তার বিবরণাদি (reports) আলোচনার জন্যে উপস্থাপিত হয়েছিল। বিস্তারিত আলোচনার শেষে সভায় গৃহীত প্রস্তাব ভারত-সচিব (Secretary of State) কাছে পাঠিয়ে শিক্ষানীতির পুনর্বিবেচনার জন্যে অনুরোধ করা হয়।[৫২]

১৮৭০ খ্রীস্টাব্দের ২১ মার্চ কেশবচন্দ্র সেন বিলাতে গিয়ে পৌছান। ভারতে, বিশেষভাবে বাংলা দেশে উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা খর্ব করবার জন্যে ১৮৬৮ খ্রীস্টাব্দ থেকে ইংরেজ-প্রভুরা যে চিন্তা ও চেষ্টা শুরু করেছিল, তার বিরুদ্ধে কেশবচন্দ্র ১৮৭০ খ্রীস্টাব্দের ২৪ মে 'England's duties to India' শীর্ষক বক্তৃতায় তীব্র প্রতিবাদ জানান। কিন্তু শুধুমাত্র শিক্ষানীতিই নয়,

ইংরেজ শাসনকর্তারা যেভাবে ও যে হারে ভারতীয়দের মদ্যপানাসক্তিকে উৎসাহ দিয়ে রাজস্ব বৃদ্ধি করেছেন, তার বিরুদ্ধেও প্রবল বিষোদ্গার করে কেশবচন্দ্র ঐ বক্তৃতায় জানান যে, বন্দুকের সঙ্গীন দিয়ে ভারত-শাসনের দিন চলে গেছে। তিনি বজ্র নির্ঘোষে জানালেন—"If England seeks to crush down two hundred millions of people in this glorious country, to destroy their nationality, to extinguish the fire of noble antiquity and the trill of ancient patriotism, and if England's object of governing the people of India is simply to make money, then I say, perish British Rule this moment".[৫৩]

এই সময়ে একটি বিশেষ ঘটনায় শুধু কলকাতা নয়, সারা ভারতবর্ষের সম্প্রদায় নির্বিশেষে শিক্ষিত মানুষমাত্রই বিশেষ বিচলিত ও উত্তেজিত হয়ে ওঠে। ঘটনাটি হলো কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি John Paxton Norman সাহেবের এজলাসে ওয়াহাবী আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত সন্দেহে ধৃত বৃদ্ধ আমীর খাঁর বিচার। বিচারে দীর্ঘকাল বন্দী বিপুল অর্থ সম্পদের মালিক আমীর খাঁ তাঁর পক্ষ সমর্থন করবার জন্যে যে তিন জন কৌসুলিকে নিযুক্ত করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে বোম্বাই হাই-কোর্টের বিখ্যাত ব্যারিস্টার P. Chisholm Anstey (১৮১৮-৭৩ হলেন অন্যতম।[৫৪] Anstey সাহেব সওয়াল-জবাব প্রসঙ্গে ভারতে ইংরেজ অপ-শাসনের যে সমস্ত বীভৎস ও রোমাঞ্চকর চিত্র অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে দিনের পর দিন ফুটিয়ে তুলতে থাকেন, তাতে সারা ভারতে অভূতপূর্ব চাঞ্চল্য দেখা দেয়[৫৫], ফলশ্রুতিতে যা দেশীয়দের মনে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত ক্ষোভ ও বিরাগকে আরো তীব্র করে তোলে।

এই সময়ে ইংল্যাণ্ড-প্রত্যাগত কেশবচন্দ্র সেন নানা সৎকর্মের অনুষ্ঠান শুরু করেন।[৫৬] নতুন বিবাহবিধি নিয়ে এই সময়ে 'আদি' এবং 'ভারত-বর্ষীয়', এই দুই ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে প্রবল মতদ্বৈধতা শুরু হওয়ায় "গভর্নমেণ্ট 'Brahmo Marriage Bill' নামের পরিবর্তে 'Native Marriage Bill' নামে এক 'নূতন আইন লিপিবদ্ধ করিবার সঙ্কল্প' করে, কিন্তু 'হিন্দু সমাজের মুখপত্র 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' প্রভৃতির ও দেশের অপরাপর প্রদেশের পত্রিকাদির প্রতিবন্ধকতায় সে সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে হইল।"[৫৭]

স্বজাতীয় ব্যক্তিদের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন এবং স্বদেশীয় ব্যক্তিগণ দ্বারা স্বদেশের উন্নতিসাধন, এই দুটি প্রধান উদ্দেশ্য নিয়ে বার্ষিক 'হিন্দু (চৈত্র) মেলা'র যেমন ইতিমধ্যেই সূচনা হয়েছিল, তেমনি প্রায়-সদৃশ উদ্দেশ্য নিয়ে ১৮৭০ খ্রীস্টাব্দে 'জাতীয়সভা' স্থাপিত হলো। এই সময়েই ভূদেব মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'এডুকেশন গেজেট' পত্রিকায় কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৯০৩) রচিত বিখ্যাত দুটি কবিতা 'ভারত বিলাপ' ও 'ভারত সঙ্গীত' প্রকাশিত হয়।[৫৮] কবিতা দুটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই "দেশময় এক মহা হুলুস্থুল পড়িয়া যায়। ভূমিকম্পে…যেমন দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত অবধি নড়িয়া টলমল করিতে থাকে…হেমচন্দ্রের এই এক কবিতায় সেই সময় বাঙ্গালা দেশের সেই অবস্থা ঘটিয়াছিল।"[৫৯] কবিতা দুটি সরকারি মহলেও বিশেষ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল, যে-কারণে পত্রিকাটির সম্পাদক ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের (১৮২৭-৯৪) কাছেও 'গভর্ণমেণ্ট হইতে উভয় কবিতার জন্য কৈফিয়ত তলব'[৬০] করা হয়েছিল। এমনকি, 'ভারত সঙ্গীত কবিতাটি প্রকাশের জন্য গভর্ণমেণ্ট হেমচন্দ্রকে ৫০০ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছিলেন'[৬১] এরূপ কথাও শোনা যায়।

নানা প্রকার প্রতিবন্ধকতার কারণে কেশবচন্দ্র ১৮৭১ খ্রীস্টাব্দে নূতন বিবাহবিধি সংক্রান্ত বিলটিকে 'নামহীন' রেখেই আইনে পরিণত করার জন্য সচেষ্ট হলেন।[৬২] ফলে, দেশময় পরিব্যাপ্ত আন্দোলন আরো উত্তাল হয়ে উঠলো। এই বছরের প্রথম দিকেই কলিকাতা হাইকোর্টে আমীর খাঁর বিচারপর্ব শেষ হয় এবং তিনি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। কলুটোলায় তাঁর প্রাসাদতুল্য বাড়ীটি বিক্রয় করে দেওয়া হয়, এবং তাঁর লক্ষ-লক্ষ টাকা মূল্যের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়।[৬৩] মামলা চলাকালে আমীর খাঁর পক্ষাবলম্বী ব্যারিস্টার অ্যানস্টি সাহেব ভারতের তদানীন্তন বড়লাট লর্ড মেয়োর শাসনের বহু অন্যায়, অত্যাচার ও অবিচারের দৃষ্টান্ত তুলে ধরেন এবং প্রমাণ করেন যে, ইংরেজদের নিষ্ঠুর শাসন, শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে ওয়াহাবীরা যে আন্দোলন করেছিল, তা কোনো "সাম্প্রদায়িক ঘটনা নয়, এই বিদ্রোহ ছিল ভারতের বৈদেশিক শাসনের উচ্ছেদ ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য কোটি কোটি ভারতবাসীর বিদ্রোহ।"[৬৪]

ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে তীব্র বিদ্বেষ সঞ্চারের জন্যে ওয়াহাবীরা অত্যল্পকালের মধ্যেই অ্যানস্টি সাহেবের বক্তৃতা এবং মোকদ্দমার

সম্পূর্ণ বিবরণ '*The Great Wahabi*' নাম দিয়ে পুস্তিকাকারে ছাপিয়ে সারা ভারতে বিলি করলে তা সর্বত্র প্রবল চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে।[৬৫] তাঁদের সে উদ্দেশ্য যে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়নি, তার প্রমাণ পুস্তিকাটি সেদিন কলকাতার ছাত্রদের হাতে হাতে ফিরেছিল।[৬৬] দেশপ্রেম জাগানোর পূর্ব-শর্ত হিসেবে বিদেশি বিদ্বেষের প্রাথমিক পাঠ ছাত্ররা সেদিন এই পুস্তিকাটি থেকেই গ্রহণ করেছিল বলা যায়।[৬৭]

আমীর খাঁর কারাদণ্ডের কয়েক মাস পরেই ১৮৭১ খ্রীস্টাব্দের ২০ সেপটেম্বর প্রকাশ্য দিবালোকে কলকাতা টাউন হলের সামনে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি, (আমীর খাঁর বিচারক) নর্মান সাহেবকে আবদুল্লা নামক জনৈক ওয়াহাবী[৬৮] ছুরিকাঘাতে হত্যা করলে চাঞ্চল্য ও উত্তেজনা প্রবলভাবে বৃদ্ধি পায়। এই চাঞ্চল্য ও উত্তেজনা আরো বৃদ্ধি পেল— যখন প্রতিহিংসা পরায়ণ ইংরেজরা প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত আবদুল্লার মৃতদেহটিকে মুসলমান ধর্মের প্রথানুযায়ী কবরস্থ না করে আগুনে পুড়িয়ে ভস্মীভূত করলো [৬৯] ঘটনাটি মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে যে প্রবল উত্তেজনা ও তীব্র বিক্ষোভ সৃষ্টি করবে, তা ইংরেজরা জানতো বললে সঠিক বলা হয় না, বরং এটাই ছিল তাদের অভিপ্রেত।

প্রকৃতপক্ষে কামধেনুরূপী ভারতমাতাকে সুচিরকাল [Col. W.F.B. Laurie তাঁর 'Some Curiosities of Petition Literature, East and West.Remarks on 'Perish India and the quesions of the day'(1880) গ্রন্থে দাবি করেছিলেন 'As long as the Sun shines in the Heavens, the British flag shall wave over those possessions'। এই মনোভাব যে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ মাত্রেরই ছিল,[৭০] তা আমরা পরে আরো দেখবো।] দোহন করবার জন্যে নানাভাবে দেশের লোককে উদ্বেজিত, উত্তেজিত তথা বিদ্রোহী করে. সেই বিদ্রোহ দমনের নামে তাদের চিরকালীন দাস বানিয়ে রাখার সুপরিকল্পিত কৌশল (অনেকটা কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার মতো) ছিল ইংরেজদের মজ্জাগত। এই দানবীয় কৌশলটির খানিকটা রূপ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে স্পষ্টবক্তা ইংরেজ A.K. Connell, M. A. (Late scholar of New College, Oxford) যিনি উনিশ শতকের সত্তরের দশকের শেষদিকে বৎসর দুইয়ের মতো ভারতে অবস্থিতি দ্বারা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে ১৮৮০ সনে লণ্ডন থেকে '*Discontent and Danger in India*' নামক গ্রন্থ প্রকাশ করেন, সেই গ্রন্থের 'A timely snub' অধ্যায়ে, যেখানে তিনি বলেছেন—"But although Lord Cranbrook, the Secretary of State, has advised

caution, yet some other Secretary of State will perhaps again encourage this patent scheme for creating discontent in India.'' (p. 76)

১৮৭১ খ্রীস্টাব্দের অকটোবরের শেষদিকে যশোহর থেকে শিশিরকুমার ঘোষ (১৮৪০-১৯১১), তাঁর ভাই হেমন্তকুমার ঘোষ এবং অমৃতবাজার পত্রিকাসহ স্থায়ী ভাবে বসবাসের জন্যে কলকাতায় এসে উপস্থিত হন।[১১] দেশের প্রাণকেন্দ্র কলকাতার সঙ্গে বাংলা দেশের জেলাগুলির ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করে এবং সাধারণ মানুষকে দেশের রাজনৈতিক-হালচাল সম্পর্কে সচেতন করে তোলার ব্যাপারে তাঁরা প্রথম থেকেই সচেষ্ট হলেন।[১২]বাংলার 'মসনদে'[১৩]তখন প্রচণ্ড বাঙ্গালি বিদ্বেষী[১৪] স্যার জর্জ ক্যাম্পবেল (Sir George Campbell) লেফটেনাট-গভর্নর, প্রচলিত কথায় 'ছোটলাট' বাহাদুর বিরাজমান। অত্যন্ত রুক্ষ ও বদমেজাজের জন্যে তিনি শুধু বাঙ্গালি নয়, তাঁর জাত-ভাইদের কাছ থেকেও কিছুমাত্র শ্রদ্ধা ও সম্মান পাননি।[১৫] ভারতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অগ্রসর জাতি হিসেবে বাঙ্গালিদের ক্রমবর্ধমান ঐক্যশক্তি এবং ভারতের অন্যান্য প্রদেশের উপর তাদের রাজনৈতিক প্রভাবের[১৭] মূলোচ্ছেদ করতে হলে সর্বাগ্রে এদেশে উচ্চশিক্ষার পথ যে রুদ্ধ করতে হবে, এটা বিলাতে অবস্থিত সাম্রাজ্যবাদী কর্তৃপক্ষের মতো ক্যাম্পবেল সাহেবও হাড়ে হাড়ে বুঝেছিলেন। আসলে ভারতকে চিরকালীন দাস করে রাখাই ছিল সেকালের সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের প্রকৃত লক্ষ্য, এবং এটা তাঁদের অনেকেই দম্ভের সঙ্গে খোলাখুলি ভাবেই বলতেন।[১৮] ক্যাম্পবেল সাহেবও ছিলেন 'birds of the same feather' অর্থাৎ ঐ একই দলের অন্তর্গত।

এই প্রকার মনোভাবের দ্বারা চালিত ইংরেজ কর্তৃক দীর্ঘকাল ভারতের রক্ত শোষণের ফল হলো পর্যায়ক্রমে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। এই অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দের ১৫ জানুয়ারি পাঞ্জাবে রাম সিং-এর নেতৃত্বে 'কুকা বিদ্রোহ' দেখা দিল। প্রবল সামরিক শক্তিসম্পন্ন ইংরেজ সরকার অবশ্য দু'দিনের মধ্যেই সেই বিদ্রোহকে দমন করে, এবং ১৭ জানুয়ারি তারিখেই ২ জন নারী সহ ৬৮ জন ধৃত বিদ্রোহীর মধ্যে ৪৯ জনকে আম্বালার কমিশনার Douglas Forsyth-এর 'অসতর্কতা'-র ফলে (আত্মরক্ষার জন্যে পরে 'অসতর্কতা' বললেও আসলে তাঁরই যোগসাজসে) লুধিয়ানার ডেপুটি কমিশনার কাওয়ান সাহেব (L. Cowan) কামানের মুখে তাদের বেঁধে তোপের সঙ্গে উড়িয়ে দেয়

এবং পলায়নোদ্যত একজনকে সঙ্গে সঙ্গে তলোয়ার দিয়ে কেটে ফেলে। পরের দিন অর্থাৎ ১৮ জানুয়ারি নারী দু'জনকে ছেড়ে দিয়ে বাকি ১৬ জনকে ঐ একই পদ্ধতিতে, অর্থাৎ কামানের মুখে বেঁধে তোপের সঙ্গে উড়িয়ে দিয়ে হত্যা করা হয়।

এই নারকীয় হত্যাকাণ্ড শুনে সমস্ত ভারতবাসী যখন আতঙ্কে আর্তনাদ করতে শুরু করে, তখন ইংরেজ কর্মচারি এবং ইংরেজি সংবাদ-পত্রগুলি (James Routledge সম্পাদিত 'Friend of India' ব্যতীত) Cowan ও Forsyth সাহেবের কাজকে কোমর বেঁধে সমর্থন করতে থাকে।[৭৯] শুধু তাই নয়, এই পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডটি সেদিন কোনো কোনো উচ্চ-পদস্থ ইংরেজ কর্মচারির কাছে যে কতদূর 'কৌতুক-জনক ও দর্শনীয় দৃশ্য' বলে মনে হয়েছিল, সে কথাও তারা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করতে থাকে।[৮০] পাঞ্জাব সরকারও Cowan ও Forsyth-এর কাজকে সমর্থন করে।[৮১] এই নারকীয় অপকর্মকে সমর্থন করে পাঞ্জাবের লেফটেনাণ্ট গভর্নর ভারত সরকারের কাছে যে 'বার্তা' পাঠিয়েছিল, তার এক স্থানে লেখা হয়েছিল—"Blowing from a gun is an impressive and merciful manner of execution, well calculated to strike terror into the by-standers!"[৮২]

এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডে সারা দেশব্যাপী প্রবল আন্দোলনের মুখে শেষ পর্যন্ত বড়লাট লর্ড নর্থব্রুক বাধ্য হয়ে মাসিক ৩০০ টাকা পেনসন দিয়ে[৮৩] কাওয়ান সাহেবকে পদচ্যুত এবং ফোরসাইথ-কে অন্য প্রদেশে বদলি করেন (অল্পদিন পরেই অবশ্য বীরোচিত কাজের জন্যে Forsyth-কে 'Sir' উপাধি দ্বারা ভূষিত করে আরো গুরুত্বপূর্ণ (?) পদে নিয়োগ করা হয়[৮৪])। এই জঘন্যতম হত্যা-কাণ্ডের নায়কদ্বয়ের একজনকে এই প্রকার লোক-দেখানো লঘু দণ্ড দিয়ে এবং দ্বিতীয় জনকে বিশেষরূপে সম্মানিত করে উচ্চতম পদে নিয়োগ করায়, কেবলমাত্র ভারতবাসীই নয়, অনেক সহৃদয় ইংরেজও যে সেদিন মর্মান্তিক ভাবেই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন, তার কিছু কিছু প্রমাণ আছে।

ইংরেজ সাংবাদিক James Routledge ভারত-সম্পর্কিত তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা-জাত '*British Rule and Native opinion in India*' (London, 1878) গ্রন্থে লর্ড নর্থব্রুকের কাজকে ধিক্কার দিয়ে বলেছেন : 'a political error of the first magnitude' (পৃ. ১০১)। একদা বাংলা সরকারের মুখ্য সচিব ('Chief Secretary to the Government of Bengal') স্যার হেনরি কটন (Sir Henry Cotton) ১৯০২ খ্রীস্টাব্দে কর্মান্তে বিলাত প্রত্যাগমন করে ১৯১১ খ্রীস্টাব্দে '*Indian and Home Memories*' নামে

যে আত্মজীবনী প্রকাশ করেন, তার প্রায় ৪০ বৎসর পূর্বে অনুষ্ঠিত এই দানবীয় ঘটনাকে ভুলতে না পেরে সেখানে লিখেছেন—"For my part, I can recall nothing during my service in India more revolting and shocking than these execution, and there were many who thought, as I did and still think, that the final orders of the Government of India were lamentably inadequate". (পৃ. ১১৩)

১৮৭২ খ্রীস্টাব্দের ফেবরুয়ারি মাসে কলকাতা থেকে ঘোষ ভ্রাতাদের দ্বিভাষিক (বাংলা ও ইংরেজি) 'অমৃতবাজার পত্রিকা' সাপ্তাহিক রূপে আত্মপ্রকাশ করলো। 'বিষ ও অমৃত দুইই পরিবেশন'[৮৫] করার যে উদ্দেশ্য নিয়ে পত্রিকাটির প্রকাশ আরম্ভ হয়েছিল, দুঃখের বিষয় তা অত্যল্প কালের মধ্যেই 'স্বদেশপ্রেমিক সাধু রামতনু লাহিড়ীর ন্যায়' ব্যক্তিবর্গের নিকটও রাজদ্রোহ প্রচারকারী পত্রিকারূপে গৃহীত হলো।[৮৬] এমনকি বঙ্গেশ্বর 'স্যার রিচার্ড ও [টেম্পল] শিশিরকুমারকে প্রথমে রাজদ্রোহী বলিয়া মনে করিতেন'।[৮৭] বস্তুত বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্রের (১৮৩৩-৭৪) মতো লোকেরও "শিশিরকুমারের আক্রমণাত্মক লেখাগুলো পরে জনসাধারণকে প্রভাবিত করতে পারে, দেশে অসন্তোষ ও বিদ্রোহী মনোভাব ছড়িয়ে পড়তে পারে", এবম্বিধ আশঙ্কাকে অস্বীকার না করে শিশিরকুমার সেদিন বলেছিলেন,—"পত্রিকার উদ্দেশ্যই অবহেলিত জনসাধারণকে জাগিয়ে তোলা, তাদের স্বাদেশিকতা বোধে উদ্বুদ্ধ করা। এই মৃতপ্রায় জনতার ঘুম ভাঙাতে আমাদের ভাষাকে সোচ্চার ও তীক্ষ্ণ হতেই হবে।"[৮৮] অমৃতবাজার পত্রিকার এই গুরুত্বপূর্ণ কার্যধারার স্বীকৃতি জানিয়ে এক ঐতিহাসিক লিখেছেন,—"The Amrita Bazar Patrika came out with a concrete political slogan, i. e. political independence."[৮৯]

১৮৭০ খ্রীস্টাব্দে পুনায় 'সার্বজনিক সভা' স্থাপিত হলেও, ভারতে এই সময়ে সক্রিয় রাজনৈতিক সংস্থা হিসাবে একমাত্র 'British Indian Association'-এর (১৮৫১ খ্রীস্টাব্দে স্থাপিত) নামই করতে পারা যায়।[৯০] তবে এই সংস্থার সভ্যরা ছিলেন প্রধানত জমিদার, এবং সংস্থাটির মুখ্য উদ্দেশ্যই ছিল তার জমিদার সভ্যদের স্বার্থরক্ষা করা— সাধারণ মানুষের আশা-আকাংক্ষা এই সংস্থাটির মধ্য দিয়ে যথার্থভাবে প্রতিফলিত হতো না। সেজন্যে হেমন্ত-কুমার ঘোষ ও শিশিরকুমার ঘোষ এই সময়ে বাংলা দেশের জেলায় জেলায় পরিভ্রমণ করে দেশের মানুষদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা সঞ্চারের এবং

জেলা-সমিতি গঠনের জন্যে চেষ্টা শুরু করেন।[২১] ওদিকে বিলাতে অবস্থানরত আনন্দমোহন বসু (১৮৪৭-১৯০৬) ১৮৭২ মার্চ মাসে 'Scottish Church College Debating Society'-তে ভারতে ইংরেজ শাসনের ব্যর্থতা ও অপশাসনের নগ্নরূপ উদ্‌ঘাটন করে 'England has failed in her duties to India' নামক একটি বক্তৃতা করেন।[২২] লক্ষণীয় এই যে, ঠিক এই সময়েই (১০ই মার্চ ১৮৭২) পিসা-তে ইতালির মুক্তি সংগ্রামের অগ্রপথিক ম্যাটসিনির মৃত্যু হয়েছে, বিলাতের মাটিতে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আনন্দমোহন বসুর সংযোগ ঘটেছে, এবং আনন্দমোহন সুরেন্দ্রনাথকে ম্যাটসিনির জীবন ও রচনাবলী সম্পর্কে অবহিত করেছেন।[২৩]

১৮৬৯ খ্রীস্টাব্দে প্রবর্তিত আয়কর নিয়ে যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল, ১৮৭২ সনে তা প্রবলতর আকার ধারণ করে। দেশের প্রায় সমস্ত সংবাদপত্র একজোট হয়ে এই আন্দোলনকে আরো ব্যাপক ও জোরদার করে তোলে।[২৪] আয়কর-কে নিছক একটা রক্ত-শোষণকারী প্রক্রিয়া বলেই বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা মতপ্রকাশ করতে শুরু করে। British Indian Association-ও নানাভাবে এই করের বিরুদ্ধে অভিমত জ্ঞাপন করতে থাকে।[২৫] ইতিমধ্যে পথ-কর (road cess), চুঙ্গী-কর (octroi duty), গৃহ-কর, যানবাহন-কর, মাদকদ্রব্য-কর, জলকর, তামাক কর, এমনকি খেয়াপারাপারের নৌকা ইত্যাদির উপর কর বসিয়ে জনসাধারণের সুস্থ জীবনযাত্রাকে বিপর্যস্ত ও দুর্বিষহ করে তোলা হয়েছিল।[২৬] বছরে মাত্র একটাকা লাভ করে এমন লোকেরও সেদিন এইসব করের নাগপাশ থেকে রেহাই ছিল না।[২৭] আবার, আয়করের হাত থেকে শ্বেতাঙ্গদেরও নিস্তার ছিল না বলে, ভারতে বসবাসকারী ইংরেজরাও আয়করের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে শুরু করে। এই ব্যাপারে তারা তাদের ঘৃণার পাত্র কালা 'নেটিভ'দের সঙ্গে হাতে-হাত মিলিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে জোট বাঁধতেও সেদিন কসুর করে নি।[২৮]

ভারতের মতো দেশের পক্ষে আয়কর যে একান্তই অযৌক্তিক, এটাই তখন ইঙ্গ-ভারতীয় সংবাদপত্রগুলি সরকারকে বোঝাতে চাইছিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণাঙ্গদের সঙ্গে শ্বেতাঙ্গদের জোট বাঁধা ব্যাপারটা যে অদূর ভবিষ্যতে সাংঘাতিক রাজনৈতিক সংকট ঘনিয়ে তুলতে পারে, সে বিষয়েও সরকারকে সতর্ক করতে ভোলেনি।[২৯] ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্যে সাময়িক ভাবে শ্রেষ্ঠত্বাভিমান (superiority complex) শিকেয় তুলে রেখে, জাতি ও বর্ণ-বিদ্বেষ ভুলে গিয়ে কালার সঙ্গে ধলার এই যে মাখামাখি, তা

ভারতে ইংরেজ শাসনকালে এই প্রথম দেখা গেল (এবং তা শেষও বটে,কেননা কালা-ধলার এমন নির্বিচার ও নিরঙ্কুশ মিশ্রণ এমন ব্যাপকভাবে আর কখনো ঘটেনি)। সুতরাং এমন অদৃষ্টপূর্ব এবং অস্বাভাবিক ঘটনা সমস্ত দেশে যে অভাবিত-পূর্ব ব্যাপক চাঞ্চল্য ও উত্তেজনা সৃষ্টি করবে, তা সহজেই অনুমান করা যায়।

দেশের এই রকম পরিস্থিতিতে ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দের ৮ ফেবরুয়ারি আন্দামান দ্বীপ পরিদর্শনরত বড়লাট লর্ড মেয়োকে শের আলি নামক জনৈক মুসলমান কয়েদি ছুরিকাঘাতে হত্যা করলো। এই হত্যা ঘটনাটির প্রতিক্রিয়া সেদিন ইংরেজ মহলে কেমন হয়েছিল, তা প্রত্যক্ষদর্শী ইংরেজ সাংবাদিক James Routledge-এর '*English Rule and Native opinion in India*' (1878) গ্রন্থে [পৃ· ১৯১] এইভাবে ধরা আছে: "There was a marked change· The guards were now Europeans, and precautions hereto undreamt of were taken to prevent the possibility of a surprise, a curions instance of what a day may bringforth in India. The first impresion that Lord Northbrook made on Native India was, that he would be excessively reserved·" একজন উচ্চপদস্থ রাজপুরুষ হিসেবে প্রচণ্ড রকমের ভারতীয়, বিশেষত বাঙালি বিদ্বেষী বঙ্গেশ্বর স্যার জর্জ ক্যাম্পবেলের সেদিন কি মনে হয়েছিল, তা পরবর্তী কালে রচিত ও প্রকাশিত তাঁর স্মৃতিকথায় লেখা আছে: "That act [অর্থাৎ মেয়ো হত্যা] very materially changed the course of our policy in India. And to me in particular, Lord Mayo's death was a turning point in the administration which was carrying out in Bengali "[১০০]

লর্ড মেয়োর হত্যা ব্যাপারটি বঙ্গেশ্বর ক্যাম্পবেলের কাছে একটা অজুহাত মাত্র, আসলে বাংলার মসনদে বসা ইস্তক তিনি বাঙালি-বিদ্বেষী অতঃপর মেয়ো-হত্যাকে কেন্দ্র করে চণ্ড-মূর্তিতে আবির্ভূত হতে তাঁর আর কোনো বাধাই (? চক্ষুলজ্জাই) থাকলো না। স্বায়ত্তশাসনের ক্ষুদ্রতম প্রতীক-রূপে ১৮৭০ খ্রীস্টাব্দে সমগ্র বাংলা দেশে ৬৫টি মিউনিসিপ্যালিটি গড়ে উঠেছিল।[১০১] জনস্বাস্থ্য রক্ষা করা ছাড়াও এই সংস্থাগুলিকে কিছু পরিমাণে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের লীলাভূমিরূপে ব্যবহার করা হচ্ছে, তার আভাস

সাম্রাজ্যবাদী ক্যাম্পবেলের কর্ণগোচর হওয়া অসম্ভব ছিল না। সুতরাং এই মিউনিসিপ্যালিটিগুলির স্বাধীনতা খর্ব করে নিরঙ্কুশ সরকারি আধিপত্য বিস্তার করবার জন্যে ইতিপূর্বেই যে Bengal Municipality Bill আনা হয়েছিল, তার বিরুদ্ধে বাংলা দেশের সংবাদপত্রগুলি প্রথম থেকেই প্রতিবাদ করে আসছিল। ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দে এই আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করে।

আবার, ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দেই আরো কয়েকটি বিষয়ে ভারতীয়দের অসন্তোষ ও তজ্জাত আন্দোলন প্রায় তুঙ্গে ওঠে। ভারতে বস্ত্রবয়ন কলগুলিকে ইংরেজরা, বিশেষভাবে ম্যানচেস্টারের শ্বেতাঙ্গ মিল-মালিকরা আদৌ প্রসন্ন মনে স্বাগত জানাতে পারেনি। অর্থলোলুপ এই শ্বেতাঙ্গ মিল-মালিকদের প্রভাবে ও প্ররোচনায় সদ্য স্থাপিত ভারতীয় মিলগুলিকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করবার জন্যে কিছুদিন ধরেই চেষ্টা চলছিল। সত্তরের দশকের প্রথম দিকে এই কারণে যে শুল্কনীতি (Tariff Act) ঘোষণা করা হয়, তাতে বিদেশিদের বস্ত্র ব্যবসায় অবাধ বাণিজ্যের সুযোগ দিয়ে নবজাত ভারতীয় বস্ত্রশিল্পকে হত্যা করার সুস্পষ্ট চক্রান্ত দেখা গেল। তখন থেকেই সংবাদ-পত্রাদির মারফৎ এই নূতন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন শুরু, এবং ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দে তা প্রবল আকার ধারণ করে।

এতদিন পর্যন্ত উচ্চ পদাধিকারী ভারতীয়দের এজলাসে শ্বেতাঙ্গ-অপরাধীদের বিচারপর্ব চলছিল। কিন্তু ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দে যে নূতন ফৌজদারি বিচারনীতি গৃহীত হলো, তাতে মফস্বলে দেশীয় হাকিমদের হাত থেকে শ্বেতাঙ্গ অপরাধীদের বিচার-ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হলো, জুরি-ব্যবস্থাতেও কিছু রদবদল করে শ্বেতাঙ্গদের সুবিধা দেওয়ার চেষ্টা করা হলো, এবং ক্ষেত্র বিশেষে ইয়োরোপীয় ম্যাজিস্ট্রেটদের হাতে তাৎক্ষণিক রায় দানের ('Summary trial') বিচার ক্ষমতা দেওয়া হলো। এই প্রকার বৈষম্যমূলক ও অভিনব বিচার-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে উচ্চপদস্থ ইংরেজ রাজকর্মচারি, যেমন স্যার রিচার্ড টেম্পল, স্যার ব্যারো হারবার্ট, এলিস, এমনকি তদানীন্তন কমাণ্ডার-ইন-চিফ (Lord Napier of Magdala) পর্যন্ত প্রতিবাদ জ্ঞাপন করলেন।[১০২] ফলে, বিষয়টি শিক্ষিত ভারতীয়দের মধ্যে প্রবল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করলো, এবং বাংলা দেশে এর প্রাবল্য দেখা দিল সর্বাধিক।[১০৩]

১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দের মধ্যেই বাংলা দেশে বহু সংখ্যক বাংলা সাময়িকপত্র প্রকাশিত হয় যার অর্ধেকেরও বেশি কলকাতা থেকেই প্রকাশিত হোত।[১০৪]

দেশের প্রকৃত অবস্থা জানবার জন্যে তৎকালীন জনসাধারণ যে কি পরিমাণে সজাগ হয়ে উঠেছিল, তা সাময়িকপত্রাদির সংখ্যা বাহুল্য থেকেই বোঝা যায়। আয়কর, পথকর, Municipality Bill, Tariff Act, Criminal Procedure Act, 1872— এইসব বিষয়ে নানাবিধ ত্রুটি দেখিয়ে বাংলা দেশের সাময়িক পত্র ও সংবাদপত্রগুলি দিনের পর দিন সরকারের শাসনকার্যের যে তীব্র সমালোচনা শুরু করে[১০৪] তাতে বঙ্গেশ্বর ক্যাম্পবেল দিশেহারা ও ক্ষিপ্তপ্রায় হয়ে পড়েন। তিনি দেশীয় সংবাদপত্র সমূহের আশু কণ্ঠরোধ করার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে ৮ জুলাই ১৮৭২ তারিখে বড়লাট লর্ড নর্থব্রুক-কে এক পত্রে লিখলেন—"I think that we want something like the French law forbidding the exciting of hatred and contempt against the Government."[১০৬]

সামাজিক ক্ষেত্রে দেখা যায়, কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁর মতানুবর্তী প্রগতিশীল ব্রাহ্মেরা কিছুকাল যাবৎ যে 'নব বিবাহ বিধি' প্রচলন করবার চেষ্টা করে আসছিলেন, ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দের ২২ মার্চ সেটি 'Act III of 1872' নামে গৃহীত হলো। এই তিন-আইনের বিবাহ-বিধিতে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীস্টান, পার্শি, জৈন প্রভৃতি প্রচলিত কোনো ধর্মেরই অন্তর্ভুক্ত নয়, এরূপ একটি ঘোষণা করার বিধান ছিল। ফলে "বাহিরের লোকের মনে এই কথা দাঁড়াইল যে ব্রাহ্মেরা বলিতেছে 'আমরা হিন্দু নহি'।"[১০৭] 'আদি ব্রাহ্ম সমাজ', নবগোপাল মিত্রের 'জাতীয় সভা' এবং শোভাবাজারের রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর ও কালীকৃষ্ণ বাহাদুর প্রতিষ্ঠিত 'সনাতন ধর্মরক্ষিণী সভা' প্রায় একযোগে কেশবচন্দ্র ও তাঁর মতানুবর্তীদের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন শুরু করলো।

ঠিক এই সময়েই বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-৯৪) সম্পাদিত যুগান্তকারী 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার আবির্ভাব - পত্রিকাটির মধ্য দিয়ে দেশের লোক একই সঙ্গে দেশকে এবং নিজেদের সঠিকভাবে দেখার সুযোগ পেল। 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশের অব্যবহিত পূর্বে মনোমোহন বসুর (১৮৩১-১৯১২) সম্পাদনায় 'মধ্যস্থ', এবং বঙ্গদর্শনের অব্যবহিত পরে শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮৩৯-৯৪) সম্পাদিত (দ্বিতীয় পর্যায়) 'Mookerjee's Magazine' পত্রিকা দুটি আত্মপ্রকাশ করে। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে পত্রিকাগুলিতে দেশের ও দশের প্রকৃত অবস্থার চিত্র যেভাবে ফুটে উঠতে থাকে, এবং সে-সবের দ্বারা দেশবাসী যে হারে দ্রুত রাজনীতি সচেতন হয়ে উঠতে থাকে, তা সাম্রাজ্য-

বাদী ইংরেজদের বিশেষ দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে উঠতে থাকে। এই সময়ে ক্যাম্পবেল সাহেব দেশীয় সংবাদপত্রাদির কণ্ঠরোধের প্রয়োজনীয়তার দিকে যেমন বড়লাট লর্ড নর্থব্রুকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন, তেমনি তার মাস আড়াইয়ের মধ্যেই দুঁদে ইংরেজ সিভিলিয়ান (পরবর্তী কালে 'Father of the Indian National Congress' রূপে স্বীকৃত)—Allan Octavian Hume (অ্যালান অকটেভিয়ান হিউম) ১লা আগস্ট ১৮৭২ তারিখে বড়লাট নর্থব্রুককে সতর্ক করবার জন্যে লেখেন—"I am strongly impressed with theconviction that the fate of the Empire is trembling in the balance."[১০৮]

ভারতবর্ষে বিটিশ সাম্রাজ্যের বনিয়াদ শক্ত করবার জন্যে কট্টর সাম্রাজ্যবাদী বঙ্গেশ্বর ক্যাম্পবেল এই সময়ে একই সঙ্গে দুটি কাজ শুরু করেন। একদিকে ইংরেজদের নিরঙ্কুশ ভারত শোষণের বিরুদ্ধে শিক্ষিত জনসাধারণ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে চাইছে দেখে শিক্ষা ক্ষেত্রে 'filter down' নীতি, অর্থাৎ অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের অজুহাতে উচ্চ-শিক্ষার পথ রুদ্ধ করবার যেমন পরিকল্পনা করলেন (by Government Resolution of 30th September, 1872), অন্যদিকে তেমনি কাঁটা দিয়ে কাঁটা-তোলার নীতিতে অভিজাত ও জমিদার শ্রেণীর প্রভাব ও প্রতিপত্তি খর্ব করবার জন্যে গোপনে গোপনে জমিদারদের বিরুদ্ধে কৃষকদের উস্কানি দিতে লাগলেন।[১০৯] ক্যাম্পবেলের এই শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে অচিরে সমগ্র বাংলা দেশে তীব্র ক্ষোভ দেখা দেয়, এবং সংবাদপত্রাদিতে আন্দোলন শুরু হয়। "হেমন্তকুমার ঘোষ মফঃস্বলের বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করে গভর্ণমেণ্টের প্রস্তাবিত অন্যায় বিধানের বিরুদ্ধে খুব সভা আহ্বান করতে থাকেন।"[১১০] এই নবোদ্ভূত সংকোচনশীল ও ধ্বংসাত্মক শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে সেদিন শিক্ষাব্রতী ইংরেজ-নন্দন হেনরি উড্রো (Henry Woodrow, ১৮২৩-৭৬) পর্যন্ত তীব্র প্রতিবাদ না করে পারেন নি, এবং শেষ পর্যন্ত নিরুপায় অভিমানে তিনি দীর্ঘ দিনের ছুটি নিয়ে ১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে বিলাতে পাড়ি জমান।[১১১]

নব প্রবর্তিত 'তিন আইনের বিবাহ' রীতির বিরুদ্ধে দেশে তখন 'তুমুল আন্দোলন' শুরু হয়েছে।[১১২] তার ফলশ্রুতিতে ১৮৭২ সেপটেম্বর মাসের প্রথম দিকেই কলকাতা শহরের দেওয়ালগুলি বিজ্ঞাপনে বিজ্ঞাপনে ছেয়ে গেছে দেখা গেল[১১৩], যার মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে একটি বিশেষ বক্তৃতা সম্বন্ধে জনসাধারণকে ওয়াকিবহাল করা। কয়েক দিন পরেই, অর্থাৎ ১৫ সেপটেম্বর

১৮৭২ তারিখে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে 'জাতীয় সভা'য় রাজনারায়ণ বসুকে 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব' শীর্ষক তাঁর বিখ্যাত বক্তৃতাটি (লিখিত প্রবন্ধ পাঠ) করতে দেখা গেল। এই বক্তৃতার প্রতিবাদে কেশবচন্দ্র সেন ও প্রতাপচন্দ্র মজুমদার কয়েকটি বক্তৃতা করলেও[১১৪] "অচিরকালের মধ্যেই ঐ বক্তৃতার ভূয়সী প্রশংসা এদেশের সর্বত্র ও অপর দেশেও ব্যাপ্ত হইয়া গেল। 'সনাতন ধর্মরক্ষিণী সভার' সভ্যগণ এবং তাঁহাদের সভাপতি রাজা কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর এই বক্তৃতার দ্বারা উৎসাহিত হইয়া, হিন্দুধর্মের ও হিন্দু আচারাদির শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন পূর্বক সুপ্রসিদ্ধ মনোমোহন বসু প্রভৃতির দ্বারা বক্তৃতা দেওয়াইতে লাগিলেন।... ব্রাহ্মগণ আপনাদিগকে 'হিন্দু' বলিতে চাহে না, এই রব যেমন এদেশে উঠিয়া গেল, তেমনি এই সভার উদ্যোগে হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের প্রয়াস বাড়িতে লাগিল।[১১৫] দেশব্যাপী এইসব ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে প্রগতিশীল ও শিক্ষিত যুবকদের উপর থেকে কেশবচন্দ্রের প্রভাব কমতে শুরু করলো,—'কেশববাবুর দলস্থ ব্রাহ্মগণ অহিন্দু বলিয়া হিন্দু সমাজের অবজ্ঞার তলে পড়িলেন"[১১৬] এমনকি আদি ব্রাহ্ম সমাজভুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৯-১৯২৫) ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দের সেপটেম্বর মাসে কেশবচন্দ্রের নারী-শিক্ষা প্রবর্তনের উৎসাহকে ব্যঙ্গ করে 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' নামক একটি প্রহসন পর্যন্ত রচনা করে ফেললেন, যা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক ক্ষেত্রে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করলো।[১১৭]

এই প্রকার অবস্থায় জাতীয় ভাবোন্মাদনাকে পরিপুষ্ট করে তুলতেই ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকাভিনয়ের মধ্য দিয়ে সাধারণ রঙ্গমঞ্চের দ্বার উদ্ঘাটিত হলো। জনশিক্ষার এই সহজ মাধ্যমটিকে অবলম্বন করে প্রথম দিকে কিছু পৌরাণিক বা গীতিনাট্য-বহুল কৌতুক নাট্যাদি পরিবেশিত হলেও, অচিরে সামাজিক ও আধা-ঐতিহাসিক বা রোমান্টিক নাটকাভিনয়ের মধ্য দিয়ে দেশবাসীকে স্বাদেশিকতায় দীক্ষা দেওয়ার দিকে নজর দেওয়া হয়।

চাকুরিতে দ্রুত পদোন্নতি হচ্ছে না বলে, প্রধানত ইংরেজ সরকারি কর্মচারিরা ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দের শেষদিকে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।[১১৮] বাঙালি বিদ্বেষী বঙ্গেশ্বর ক্যাম্পবেল এই রকম সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিলেন [এবং এই বিক্ষোভের পেছনে তাঁর হাত থাকাও বিচিত্র নয়]। কথায় বলে, দুষ্টের ছলের অভাব হয় না; সুতরাং নানা ছুতানাতায় উচ্চপদস্থ ও যোগ্য বাঙালি

চাকুরিজীবীদের সঙ্গে নানা অন্যায় ও অশালীন ব্যবহার করে তিনি তাদের তাড়াবার জন্যে উঠে-পড়ে লাগলেন। ফলস্বরূপ স্বাধীনচিত্ততা ও স্পষ্ট-বাদিতার[১১৯]জন্যে সামান্য কারণে [? অজুহাতে] ১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়কে (১৮২৯-৮৭ ক্যাম্পবেল সাহেব সাময়িক ভাবে বরখাস্ত (suspend) করেন।[১২০] পুরোপুরি পদচ্যুত করারই ইচ্ছা ছিল তাঁর, তবে যে সামান্য ছুতায় এই সাসপেনসন', তার বেশি করলে আসল উদ্দেশ্য ধরা পড়ে যাবে মনে করেই ক্যাম্পবেল সাহেব আর অগ্রসর হন নি। তাছাড়া এটি তাঁর দুরভিসন্ধির প্রথম পদক্ষেপ বা 'test case' ছিল, এটাও মনে রাখা যেতে পারে।[১২১] ক্যাম্পবেল সাহেবের বাঙালি বিদ্বেষের দ্বিতীয় বলি হলেন— ইংরেজি ভাষার বিখ্যাত কবি শশীচন্দ্র দত্ত (১৮২৪-৯১)। "গভর্নমেণ্টের শাসন বিবরণী (Administration Report)' এবং 'পার্লিয়ামেণ্টের অবনতির জন্য·· অন্যান্য বিবরণী' রচনায় 'অসাধারণ কর্মকুশলতা সত্ত্বেও ইঁহার ন্যায় উচ্চশিক্ষিত কর্মচারীকে অতিক্রম করিয়া দুইজন ইউরোপীয় কর্মচারীর পদ বৃদ্ধি করিয়া দেওয়ায় (১৮৭৩ এপ্রিল) ইনি পদত্যাগ করেন"[১২২] শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের *'Mookerjee's Magazine'* পত্রিকার ১৮৭৩ জুন থেকে ১৮৭৪ জুন পর্যন্ত সংখ্যাগুলিতে প্রকাশিত 'Reminiscences of a Kerani's Life' রচনায় শশীচন্দ্র শিক্ষিত বাঙালির সামনে ইংরেজ শাসনযন্ত্রের স্বরূপটিকে খুলে দেখান।

ক্যাম্পবেল সাহেবের বাঙালি বিদ্বেষের আর একটি প্রমাণ পাওয়া যায় বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্রের জীবনকথা থেকে। ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দের শেষদিকে "মালদহের চাঁচোলের জমিদার রাজা ঈশ্বরচন্দ্র রায়ের মৃত্যুর পর মালদহের শ্বেতাঙ্গ ম্যাজিস্ট্রেট আলেকজাণ্ডার 'ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট'কে সঙ্গে লইয়া রাজবাটী আক্রমণ ও অন্তঃপুরে বলপূর্বক প্রবেশ করিয়া ভয়ানক অত্যাচার" করায় কলিকাতা হাইকোর্টে যে মামলা হয়, সেই মামলায় বিচারপতি "দ্বারকানাথ বাঙালী হইয়া তাঁহার (স্যার জর্জের) অধীনস্থ প্রধান দুইজন জেলার ইংরেজ কর্মচারীর প্রকাশ্য আদালতে দোষ ঘোষণা করিয়া তিরস্কার করায়, স্যার জর্জ [ক্যাম্পবেল] দ্বারকানাথের উপর হাড়ে হাড়ে চটিয়া যান, ও সেই হইতে তাঁহাদের বন্ধুতা একেবারে নষ্ট হইয়া যায়।" ['কেম্বেল যখন হাইকোর্টের জজ ছিলেন, তখন দ্বারকানাথের সহিত তাঁহার বড় বন্ধুতা ছিল, তাঁহার (দ্বারকানাথের) সবিশেষ খাতির করিতেন'।][১২৩] শুধু

দ্বারকানাথের উপর 'হাড়ে হাড়ে চটিয়া'-ই ক্যাম্পবেল সাহেব নিরস্ত হলেন না, ভবিষ্যতে যাতে হাইকোর্টে আর কোনো বাঙ্গালিকে জজ-এর পদে বসানো না হয়, তার জন্যে প্রভূত চেষ্টা শুরু করলেন। কিন্তু বড়লাট লর্ড নর্থব্রুক, যাঁর সঙ্গে ক্যাম্পবেলের গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত ঠোকাঠুকি সম্পর্ক ছিল।[১২৪] তিনি ক্যাম্পবেল সাহেবের এই প্রয়াসে দৃষ্টিপাত পর্যন্ত না করে দ্বারকানাথের মৃত্যুর (১৫ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৪) পরে পুনরায় একজন বাঙ্গালিকে ঐপদে নিযুক্ত করেন।[১২৫]

ক্যাম্পবেল সাহেবের বাঙ্গালি বিদ্বেষের চরম প্রমাণ প্রাতঃস্মরণীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের (১৮২৭-৯৪) প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার।[১২৬] ঘটনাটি ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে সংঘটিত হয়। ঘটনাটি এই যে, বিভিন্ন স্কুলের স্কুল কমিটির (School Cammittee) সভ্যরা যেহেতু বাঙ্গালি, অতএব তারা সকলেই অসৎ, ক্যাম্পবেল সাহেবের এই মিথ্যা ও বিকৃত সিদ্ধান্তকে ভূদেব মুখোপাধ্যায় সমর্থন না করে প্রতিবাদ করায়, ক্রুদ্ধ ক্যাম্পবেল ভূদেবকে বলেন যে, School Inspector পদে একমাত্র ইংরেজরাই যোগ্য, বাঙ্গালিরা আদৌ যোগ্য নয়। এর পরেই ক্যাম্পবেল ভূদেবের কাজের ত্রুটি দেখিয়ে লিখিত কৈফিয়ৎ তলব করেন। এই সময়ে ভূদেবের জীবনে কিছু দুর্দৈব চলছিল, যেমন —তার পত্নী সবে (৫ই জুলাই, ১৮৭২) পরলোক গমন করেছেন, তাঁর তৃতীয় কন্যার জ্যেষ্ঠ পুত্রটির মৃত্যু হয়েছে এবং তিনি নিজেও দীর্ঘ কয়েক মাস যাবৎ অসুস্থ। উপযুক্ত 'মেডিকেল সার্টিফিকেট' সহ প্রাপ্য ছুটির জন্যে ভূদেব যে দরখাস্ত পাঠালেন, তা তো মঞ্জুর করা হলোই না, উল্টে আক্রোশ বশত ক্যাম্পবেল ভূদেবকে সঙ্গে সঙ্গে বহরমপুরে বদলি ('transfer') করে সেখানে যোগদানের নির্দেশনামা জারি করলেন। যাই হোক, ভূদেব বহরমপুরে গিয়ে কাজে যোগদান করলেন এবং নানা অসুবিধা ভোগ করে শেষ পর্যন্ত ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দের অকটোবর মাসে ছয় মাসের ছুটি পেয়ে তিনি স্বাস্থ্যোদ্ধারে বহির্গত হলেন। রেঙ্গুনে গিয়ে রেঙ্গুনের তদানীন্তন 'চিফ কমিশনার (১৮৭৭-৭৯ সনের বাংলার ছোটলাট) স্যার অ্যাশলি ইডেন-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সমস্ত ঘটনা শুনে ইডেন সাহেব স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ক্যাম্পবেলের নামে ভূদেবের হাতে যে চিঠি পাঠান, সেই পত্রে ভূদেবের কর্মশক্তির ভূয়সী প্রশংসা করে একস্থানে খোলাখুলি ভাবে লেখেন যে, সমস্ত গুণ সত্ত্বেও বাঙ্গালি বলেই ভূদেব ক্যাম্পবেলের কুনজরে পড়ছেন।[১২৭]

দীর্ঘদিন ধরেই ভারতীয়দের, বিশেষ করে বাঙ্গালিদের গুরুত্বপূর্ণ সরকারি

পদ থেকে বিতাড়ন করার চেষ্টা চলে আসছিল, যে কারণে ১৮৭০ খ্রীস্টাব্দে একটা বিশেষ আইন প্রণয়নেরও দরকার হয়ে পড়ে[১২৮], তার মূল উদ্দেশ্যই ছিল ভারতে ইংরেজ শাসনের বনিয়াদকে শক্ত করা। তবে সেটাকে একটু আড়ালে রাখার জন্যে দেশীয়দের উচ্চ-পদের চাকুরি, প্রমোশন ইত্যাদি গাল-ভরা প্রলোভন দেখিয়ে একটা ভাঁওতার প্রলেপ চাপানো হয়েছিল, কেননা ঐ আইন মাফিক কোনো ব্যবস্থাই যে গ্রহণ করা হবে না, এটা কর্তৃপক্ষ জানতো।[১২৯] কিছুদিন পরে, ১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দে বড়লাট লর্ড লিটন তদানীন্তন 'Secretary of State'-কে (Lord Salisbury) যে গোপনপত্র ('Confidential despatch') পাঠান, তা আসলে বিদেশি শাসকগোষ্ঠীর বহুযত্ন পোষিত গোপন ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ মাত্র। তাতে লেখা হয়—"We all know that these claim and expectations never can or will be fulfilled. We have had to choose between prohibiting them or cheating them, and we have chosen the least straight forward course. Since I am writing confidentially, I do not hesitate to say that both the Goveanment of England and of India appear to me, up to the present moment, unable to answer satisfactorily the charge of having taken every means in their power of breaking to the heart the word of promise they had utterd to the ear".[১৩০]

বাঙালিদের সম্পর্কে ইংরেজ সরকারের এই রকম হৃদয়হীন আচরণ ভারতে আগত ইংরেজ সাংবাদিক James Routledge সাহেবেরও দৃষ্টি এড়ায় নি।[১৩১] বাঙালি বিদ্বেষের একবিধ সংবাদগুলি দেশীয় সংবাদপত্রগুলি বিশেষত অমৃতবাজার পত্রিকা দিনের পর দিন প্রকাশ করতে থাকায়, ভারতে ইংরেজ শাসনের 'অন্ধকার দিকটি' সম্পর্কে দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় বিশেষভাবে সচেতন হয়ে উঠতে থাকে।[১৩২] এই পরিপ্রেক্ষিতে শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের *Mookerjee's Magazine* পত্রিকায় ১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দের মার্চ সংখ্যায় ভোলানাথ চন্দ্র (১৮২২-১৯১০) ভারতের শিল্পের অবস্থা সম্বন্ধে 'A voice for the Commerce and Manufacturers of India' শীর্ষক প্রথম যে প্রবন্ধটি প্রকাশ করেন, তাতে প্রভূত উদাহরণ উদ্ধার করে এবং যুক্তি সহকারে ইংরেজদের শিল্প-নীতির নগ্নরূপটি খুলে ধরেন, এবং ইংরেজরা কেমন সুপরিকল্পিত ভাবে শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষেত্র থেকে ভারতীয়দের বিতাড়িত করে

তাদের চিরকালীন দরিদ্র কৃষকে পরিণত করছে, তাও খুলে দেখান; 'ভোলানাথের প্রস্তাবের প্রথম পরিচ্ছেদটি প্রকাশিত হইবামাত্র শিক্ষিত সমাজে বেশ একটা সাড়া পড়িয়া গেল'।[১৩৩] ভারতের কৃষ্ণাঙ্গ অধিবাসীরা শ্বেতাঙ্গদের বোঝা স্বরূপ ('white man's burden'), সুতরাং ভারতীয়দের সুসভ্য ও স্বাবলম্বী করে তোলার পবিত্র কঠিন কর্তব্য ইংরেজরা পালন করছে— এতদিন মিশনারি-সুলভ এই যে ধাপ্পা তারা দিয়ে আসছিল, পরিবর্তিত পটভূমিকায় তা যেন আর ধোপে টিকছে না! ভারত-শাসনের পশ্চাতে ইংরেজদের সদিচ্ছা সম্পর্কে শিক্ষিত মহলে একটা গভীর সন্দেহ, অবিশ্বাস ও হতাশার ভাব ক্রমেই ঘনীভূত হয়ে উঠতে থাকে।

ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মতো বাংলা দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও মাড়োয়ারি বণিক সম্প্রদায় মোটামুটি ভাবে উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে আধিপত্য বিস্তার করতে থাকে, এবং বাঙালিরা প্রধানত সরকারি চাকুরি, শিক্ষকতা, ওকালতি, ডাক্তারি, সাংবাদিকতা ইত্যাদিকে বৃত্তি হিসেবে গ্রহণ করতে থাকে।[১৩৭] ইংরেজের শাসন-শোষণের নগ্নরূপ ও তার ফলশ্রুতি চোখের সামনে দিনের পর দিন দেখতে দেখতে সংবেদনশীল শিক্ষিত বাঙালি যুবকেরা যে ইংরেজদের সম্পর্কে ক্রমেই নির্মোহ হয়ে উঠতে থাকবে, তারই ইঙ্গিত এতক্ষণ দেবার চেষ্টা করা হয়েছে।

এই সময়ে কলকাতার ছাত্র সমাজেই একটা বিশেষ উত্তেজনাকর ঘটনা ঘটে। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের উদ্ধত প্রকৃতির শ্বেতাঙ্গ ছাত্রেরা প্রায়ই দেশীয় ছাত্রদের উপর যথেচ্ছ অত্যাচার করতো ১৮৭০ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে এই কলেজের 'Apothecary class'-এর (ঔষধাদি প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষার ক্লাস) শ্বেতাঙ্গ ছাত্রেরা এতদূর বাড়াবাড়ি করেছিল যে, কলেজের শ্বেতাঙ্গ অধ্যাপক ড. শেভার্স (Dr. Chevers) বাধ্য হয়ে তাদের বিরুদ্ধে কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ করেছিলেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষ কোনো ব্যবস্থাই গ্রহণ না করায় ঐ বেপরোয়া ছাত্রেরা ড শেভার্স এবং অন্যান্য কয়েকজনকে হত্যার ভয় পর্যন্ত দেখায়।[১৩৫] ১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে এই অ্যাপথেকারি ক্লাস-এর শ্বেতাঙ্গ ছাত্রেরা দেশীয় ছাত্রদের প্রচণ্ড মারধোর করে। আক্রান্ত দেশীয় ছাত্রেরা তা প্রতিরোধ করার সঙ্গে সঙ্গে কিছু প্রতিশোধ নেবারও চেষ্টা করে, এবং শেষ পর্যন্ত কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ পেশ করে কিন্তু মেডিক্যাল কলেজের কলেজ কাউনসিল ইয়োরোপিয়ান সিভিল ছাত্রদের বিরুদ্ধে দেশীয় ছাত্রদের আনীত সমস্ত অভিযোগই নাকচ করে দেন ("The College Council of the Medical College have

dismissed all charegs against the European Civil students preferred by the Native students".[১৩৬] এমনকি কলেজ কর্তৃপক্ষ একটি দেশীয় ছাত্রকে কলেজ থেকে বিতাড়িত করবার ব্যবস্থা করে। ফলে, কলকাতার ছাত্রসমাজে তা প্রবল বিক্ষোভের সৃষ্টি করে, এবং সংবাদপত্রাদিতেও তা নিয়ে আন্দোলন উপস্থিত হয়। বাধ্য হয়ে বঙ্গেশ্বর ক্যাম্পবেল সাহেব ঘটনাটির বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে খোঁজ খবর নেন, এবং ৪ জন শ্বেতাঙ্গ ছাত্রকে বিতাড়িত ('expelled', ২৪ জন শ্বেতাঙ্গ ছাত্রকে এক বছরের জন্যে বহিষ্কার ('rusticated') ও দু'জন দেশীয় ছাত্রকেও বহিষ্কার ('rusticated') করেন।[১৩৭]

ছয়ের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে শিক্ষিত বাঙালি সম্পর্কে একপ্রকার সন্দেহ ও ভীতি উচ্চপদস্থ ইংরেজ শাসকদের ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন করতে শুরু করে। ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দে মহারাণীর ঘোষণাপত্রে ('Proclamation') জাতি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ভারতবাসী মাত্রকেই ইংরেজ রাজকর্মচারিদের সমমর্যাদা ও সমান সুযোগ দেবার অঙ্গীকার থাকলেও, কয়েক বৎসরের ব্যবধানেই 'Cut your coat according to your cloths' এই নীতিতে বিশ্বাসী সাম্রাজ্যবাদী শাসকজাতি সেই সম্মানিত ঘোষণাপত্র-কে ১৮ পদদলিত করে, আইনের নানা প্যাঁচ কষে দায়িত্বপূর্ণ ও গুরুত্বপূর্ণ পদ থেকে ভারতীয়, বিশেষভাবে বাঙালিদের বিতাড়ন করবার চেষ্টা শুরু করে (সামান্য ত্রুটির জন্যে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে I.C.S. পদ থেকে বিতাড়ন এরই ফলশ্রুতি)

ছয়ের দশকের শেষদিক থেকেই ইংরেজদের এই প্রয়াস দৃষ্টিগ্রাহ্য ভাবে ধরা পড়তে থাকে, এবং এই সময়ে "The Secretary of State made no secret of his intention to secure the exclusion of the educated classes, especially the Bengalis. In a competitive examination (he said in one of his despatches to India), the chances of a Bengali would probably be superior to the chances of a Pathan or a Sikh. It would nevertheless be a dangerous experiment to place a successful student from the colleges of Calcutta in command over any of the martial tribes of upper India."[১৩৯]

ফলে, ইংল্যাণ্ডের বড়কর্তাদের ইঙ্গিতে বাংলার বাইরে ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশে ইংরেজ আমলারা বাঙালিদের চাকুরির ক্ষেত্র ক্রমেই সংকুচিত করে তুলতে থাকে। বস্তুত ওকালতি ছাড়া সরকারি চাকুরি, শিক্ষকতা প্রভৃতি সর্ব

প্রকার চাকুরির ক্ষেত্রে শিক্ষিত বাঙ্গালিদের সেকালে কিভাবে কোনঠাসা করে ফেলা হচ্ছিল, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা[১৪০] থেকে তার একটা বিশ্বস্ত বিবরণ, বিখ্যাত সাংবাদিক শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁর সম্পাদিত '*Mookherjee's Magazine* পত্রিকায় ১৮৭৪ সনে প্রকাশিত 'Where shall the Baboo go ?' প্রবন্ধে দিয়েছেন। "...In August 1869, an advertisement appeared in the 'Moniteur', the official Publication of N. W. Provinces, inviting candidates for the post of Translator and Haed clerk to a District Judge's Court, on a pay of Rs. 120 per mensem which ends thus :—'Bengali Baboos and youths fresh from college need not apply.'...The British officers in the Punjab, Oudh, the N. W Provinces, the Central Provinces. Rajputana and Central India would not within the last ten years, unless sorely pressed for hands, receive a Bengali's application for any situation".[১৪১] ফলে সত্তরের দশকের প্রথম থেকেই মাদ্রাজ, বোম্বাই ইত্যাদি শহর অপেক্ষা কলকাতায় তুলনামূলক ভাবে শিক্ষিত বাঙালি বেকারের সংখ্যা অস্বাভাবিক-রূপে বৃদ্ধি পায়।[১৪২] এদিকে উপর্যুপরি দুর্ভিক্ষের[১৪৩] ফলে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য প্রচণ্ডভাবে বৃদ্ধি পায়।[১৪৪] ফলে, সব মিলিয়ে অবস্থাটি যা দাঁড়ালো তা সংক্ষেপে হলো এই : "As the economic condition of the people and especially of the middle classes, began to grow from bad to worse, political sentiment too began to veer round extremisim."[১৪৫]

নূতন বিবাহ বিষয়ক 'তিন আইন' গৃহীত হবার ফলে শুধু যে 'যুবক দলের উপর হইতে ব্রাহ্ম সমাজের শক্তি চলিয়া গেল' এবং 'হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের প্রয়াস বাড়িতে লাগিল' [১৪৬], তাই নয়, দেশের নানা ধরনের ঘটনা ও ক্রিয়াকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত হয়ে তার প্রতিক্রিয়া হলো আরো গভীর। ব্রাহ্মধর্মাদর্শ এতদিন পর্যন্ত শিক্ষিত ব্যক্তিদের নিকট প্রগতির প্রতীকরূপে এবং শিক্ষিতদের একপ্রকার মানস আশ্রয়রূপে বিবেচিত হয়ে আসছিল। কিন্তু সেই আদর্শের মধ্যেই অন্তর্বিরোধ ও অন্তঃসারশূন্যতা দেখে, দেশের শিক্ষিত যুবচিত্ত একটা নূতন মানসিক আশ্রয়ের সন্ধানে তৎপর হলো—উনিশ শতকীয় Bentham-এর Positivism-চর্চা বা Hume-এর Scepticism-চর্চাতেও

আর ঠিক মানসিক শান্তি বা আশ্বাস পাওয়া যাচ্ছিল না। ফলে, শিক্ষিত যুবচিত্ত কিছু পরিমাণে অজ্ঞেয়বাদী ('agnostic') হয়ে নূতন-শেখা রাজনীতি চর্চার দিকেই ধীরে ধীরে এগোবার চেষ্টা করলো (একথা পরে আলোচিত হয়েছে)।

কেশবচন্দ্রের স্ত্রী স্বাধীনতার আতিশয্যকে ব্যঙ্গ করে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দের সেপটেম্বর মাসে 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' নামে যে প্রহসনটি প্রকাশ করেছিলেন, সেই প্রহসনটি ২৬ এপ্রিল ১৮৭৩ সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনীত হলো। "এই প্রথম কলিকাতার সবচেয়ে অভিজাত পরিবারের [জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির] মেয়েরা পাবলিক থিয়েটারে অভিনয় দেখে এলেন। সাধারণ রঙ্গালয়ের পক্ষে এই ঘটনা কম উল্লেখযোগ্য নয়।"[১৪৭] স্বাদেশিকতা-উদ্বোধনে এই সাধারণ রঙ্গমঞ্চটি যে তার বিশিষ্ট ভূমিকা[১৪৮] ইতিমধ্যেই পালন করতে শুরু করেছে, তার প্রমাণ হলো এই যে, ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৩ এই রঙ্গমঞ্চে কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'ভারত-মাতা' নামক একটি একাঙ্ক নাটক (বঙ্কিমচন্দ্র একে 'মাস্ক বা রূপক' বলেছেন[১৪৯]) অভিনীত হয়। নাটকটির সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্তু হলো প্রপীড়িতা ভারতমাতা তার সুসন্তানদের [রামমোহন রায়, রামগোপাল ঘোষ, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি] জন্যে কাঁদতে কাঁদতে মূর্ছা যাচ্ছেন, এবং একজন লালমুখো ইংরেজ এসে রোরুদ্যমানা ভারতমাতার উপর অত্যাচার করছে। মঞ্চে দৃশ্যটি দর্শকমনে যে অনির্বচনীয় ভাবের তরঙ্গ তুলতো, তা নাটকটির দীর্ঘদিন ধরে মঞ্চস্থ হওয়া থেকে সহজেই বোঝা যায়।

সমকালীন একটি উচ্চশ্রেণীর মাসিক পত্রিকায় নাটকটির সমালোচনা প্রসঙ্গে লেখা হয়েছিল—"হতভাগ্য ভারতকলঙ্ক আৰ্য্যগণের ভস্মাচ্ছাদিত বীৰ্য্যবহ্নির উদ্দীপক এরূপ অপূর্ব কাব্য বঙ্গভাষায় আর রচিত হয় নাই। কিরণবাবু এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি প্রণয়ন করিয়া আমাদিগের মনে নিদ্রিত স্বাধীনতার ভাব যে কতদূর উদ্বোধিত করিয়াছেন বলিতে পারি না। ইহা বঙ্গবাসীর হৃদয়ের কি প্রিয়বস্তু হইয়াছে তাহা এই বলিলেই পৰ্য্যাপ্ত হইবে যে, ইহা এক বৎসরের মধ্যে প্রায় বিংশতিবার অভিনীত হইয়াছে। অভিনয় কালে এমন পাষণ্ড কাহাকেও দৃষ্ট হয় নাই, যাহার নয়ন যুগল হইতে অনবরত অশ্রুধারা পতিত হয় নাই।"[১৫০]

সমকালীন নাট্য সাহিত্যের উপর 'ভারতমাতা' নাটকটির প্রভাব সম্পর্কে একালের সমালোচকের মন্তব্য হলো—"This is the first in spreading nationalism in the public stage and afterwards this idea expressed

itself in many ways in different dramas."[১৫১] পরের বৎসর (১৮৭৪) কিরণচন্দ্রের 'ভারতে যবন' নামক আর একটি দেশাত্মবোধ উদ্বোধক নাটক প্রকাশিত ও মঞ্চস্থ হয়। অনতিবিলম্বে কিরণচন্দ্রর 'ভারতমাতা'-র আদর্শে হরলাল রায়ের 'হেমলতা নাটক' (১৮৭৩) ও 'বঙ্গের সুখাবসান' (১৮৭৪), হারাণচন্দ্র ঘোষের 'ভারত দুঃখিনী' (১৮৭৫), ইত্যাদি নাটক প্রকাশিত ও মঞ্চস্থ হয়। ১২৮৩ সালে প্রকাশিত কালীকৃষ্ণ চক্রবর্তীর, 'দাসত্ব শৃঙ্খল' কাব্যে মুসলমান রাজত্বের সমাপ্তি কাল পর্যন্ত ভারতের দুঃখ দুর্দশার বর্ণনা থাকলেও, কবি অতীতের পটভূমিকায় স্থাপন করে সমকালীন ভারতের শোচনীয় অবস্থাকেই প্রতিফলিত করতে চেয়েছেন, এবং কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভারত মাতা'র আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে কাব্যটি ১৮৭৩ সনের শেষভাগে রচনা করেছিলেন।[১৫২] এই রকম কাব্য-নাটকাদির প্রকাশ ও জনপ্রিয়তা ইংরেজ শাসনের অন্ধকার দিক'টি সম্পর্কে ঐকালের সচেতন জনচিত্তের উত্তরোত্তর আগ্রহ বৃদ্ধিরই সাক্ষ্য বহন করছে।

এইভাবে দেখা যায় যে, ইংরেজ শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে নানা দিকেই তখন অসন্তোষ ধূমায়িত হতে শুরু করেছে, কখনো বা সেই অসন্তোষ সামান্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে অদৃষ্টপূর্ব ভাবে আত্মপ্রকাশ করছে। এখানে এরূপ একটি ঘটনার উল্লেখ করছি। ১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে কলকাতার রাস্তায় ছোটলাট ক্যাম্পবেলের গাড়ির সঙ্গে একটি ভাড়াটিয়া ঘোড়ার গাড়ির সংঘর্ষ হলে পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ মিলার তখনই ঐ গাড়ির গাড়োয়ানকে সর্বোচ্চ ৫০ টাকা জরিমানা করেন। এর পরেই 'Registrar of the Hackney carriages' মিঃ চিক (Mr. Chick) গাড়োয়ানদের সতর্ক করে যে বিজ্ঞপ্তি (notice) জারি করেন, তার দ্বারা উৎসাহিত হয়ে কলকাতার পুলিশ ও চৌকিদাররা ঠিকা-গাড়ির গাড়োয়ানদের উপর জুলুম ও অত্যাচার চালাতে শুরু করে। তার প্রতিবাদে তারা গাড়ি চালানো বন্ধ কোরে ধর্মঘট করে এবং গড়ের মাঠে সমবেত হয়। ব্যাপারটি সরকারের গোচরীভূত করার আনুষঙ্গিক ব্যয় নির্বাহের জন্যে তারা নিজেদের মধ্যে চাঁদা তুলতে থাকে।[১৫৩] কলকাতার শ্বেতাঙ্গ পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটদের ও তাদের সাঙ্গপাঙ্গদের অত্যুৎসাহ তথা অত্যাচারই যে গাড়োয়ানদের এই সাধারণ ধর্মঘটের মূল কারণ, একথা সেকালের কোনো কোনো সংবাদ

পত্র খোলাখুলি ভাবেই সেদিন বলেছিল।[১৫৪] তবে সেদিন কলকাতার সচেতন জনসমাজ এই অভিনব দৃশ্য ও ব্যবস্থা দেখে যে বিশেষ চমকিত এবং সঙ্গে সঙ্গে সবিশেষ উৎসাহিত হয়ে উঠেছিল, সে বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই।

এই সময়ের সাময়িক ও সংবাদ পত্রগুলিতে সরকারি শাসন-ব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা প্রকাশিত হচ্ছিল, মফস্বলের সংবাদপত্রগুলিও এ ব্যাপারে পিছিয়ে ছিল না। ১৮৭৩ সনের ৪ঠা জুলাই 'হালিশহর পত্রিকা'র সম্পাদকীয় মন্তব্যে উচ্চ-শিক্ষা বন্ধ করার সরকারি শিক্ষানীতিকে তীব্রভাবে আক্রমণ করা হয়। রাজদ্রোহ প্রচার করছে, এই অভিযোগে বঙ্গেশ্বর ক্যাম্পবেল ঐ পত্রিকাটির বিরুদ্ধে মামলা করার ব্যবস্থা পর্যন্ত করেন। শেষে যখন দেখা গেল পত্রিকাটির সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী উভয়েই ২০ বছরের ছাত্র মাত্র, তখন তাদের সতর্ক করে ছেড়ে দেওয়া হয়।[১৫৫]

এই সময় থেকেই সংবাদপত্রাদির মাধ্যমে ভারতীয় জনমত কিভাবে গড়ে উঠছিল, তা জানতে পারা যায় প্রায় ১০ বৎসর পরে, ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দের ১০ জুলাই তারিখে তদানীন্তন বড়লাট লর্ড রিপন কর্তৃক ভারত সচিব লর্ড কিমবারলেকে (Lord Kimberley) লিখিত এক পত্র থেকে।[১৫৬] ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দের ২৮ জুলাইয়ের পত্রে বঙ্গেশ্বর ক্যাম্পবেল বড়লাট লর্ড নর্থব্রুককে সংবাদপত্রাদির কণ্ঠরোধ করার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে অবহিত করেছিলেন। তিনদিন পরেই ১লা আগস্ট ১৮৭২ তারিখের পত্রে হিউম সাহেব লর্ড নর্থব্রুককে যে সতর্কবাণী শুনিয়েছিলেন ('the fate of the Empire is trembling in balance)' তা মিথ্যা ছিল না। লর্ড নর্থব্রুক সত্য সত্যই ১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দে সারা ভারতব্যাপী একটি অস্থিরতা ('a widespread unrest') লক্ষ্য করলেন।[১৫৭]

১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দের অকটোবর মাস থেকে বাংলা ও বিহারে ব্যাপক দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। ইতিমধ্যে ইংরেজ রাজপুরুষদের 'এমনকি স্বয়ং বঙ্গেশ্বর ক্যাম্পবেলের গোপন উস্কানিতে'[১৫৮] পাবনা ও সিরাজগঞ্জে ব্যাপক কৃষক-বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল। ক্যাম্পবেল সাহেব এই সময়ে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের মোক্ষম অস্ত্র 'Divide and Rule' বা ভেদ-নীতিটাকে ভালো শাণিত করে তুলেছিলেন। তিনি মুখে মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতি প্রীতি বাক্য উচ্চারণ করলেও অন্তরে ভারতবাসীমাত্রকেই ঘৃণা করতেন।

সুতরাং হিন্দু জমিদার ও হিন্দু শিক্ষিত সম্প্রদায়কে উৎখাত করবার জন্যে মুসলমান কৃষক শ্রেণীকে গোপনে গোপনে ক্ষেপিয়ে তোলবার চেষ্টা করে আসছিলেন। ক্যাম্পবেলের এই প্রকার কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার নীতি সেদিন দেশের শিক্ষিত ও চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রকেই বিশেষ ভাবে বিচলিত করেছিল।[১৫৯] জমিদারদের সকলেই যে সৎ ও ধোয়া তুলসীপাতা ছিল, তা নয়, তবে ইংরেজরা যেভাবে দেশের দুটি প্রধান ধর্মসম্প্রদায়কে পরস্পরের প্রতি বিদ্বিষ্ট ও শত্রুভাবাপন্ন করে তোলার চেষ্টা করছিল, সেটাই ছিল তাঁদের বিচলিত হওয়ার কারণ।

দীনবন্ধু মিত্র তাঁর 'নীল দর্পণে' যেমন অত্যাচারী নীলকর সাহেবদের মুখোশ খুলে দিয়েছিলেন, তেমনি পাবনার কৃষক-বিদ্রোহের পটভূমিকায় জমিদার শ্রেণীর হৃদয়হীন অত্যাচার ও শোষণের রূপ উদ্‌ঘাটিত করে এই সময়ে মীর মোশাররফ হোসেনের (১৮৪৭-১৯২২) 'জমিদার দর্পণ' নাটকটি প্রকাশিত হয়। "নাটকে একটি মৃত্যুর কারণ ইংরেজ ডাক্তারের সাক্ষ্য-দানের দৃষ্টে নাট্যকার ব্যঙ্গের চাবুক চালিয়েছেন শাসক শ্রেণীর প্রতিনিধি জজ সাহেব, ডাক্তার আর অর্থলোভী উকিলের গায়ে। তাই শাসক ও জমিদার শ্রেণী এই নাটকটিকে সুনজরে দেখতে পারেন নি।...বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে ব্যাপক গণবিদ্রোহ উনিশ শতকে বাংলার নবজাগরণের সার্থক প্রতিফলন ..এই নাটকেই ঘটেছে।[১৬০] 'জমিদার দর্পণ' নাটকটি কৃষক-বিদ্রোহের অগ্নিতে ঘৃতাহুতির মতো কাজ করছে মনে করে বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শনের' ১২৮০ ভাদ্র সংখ্যায় নাটকটির সমালোচনা প্রসঙ্গে লেখেন— "আমরা পরামর্শ দিই যে, গ্রন্থকারের এ সময়ে এ গ্রন্থ বিক্রয় ও বিতরণ বন্ধ করা কর্তব্য।" "একটি জনশ্রুতি এই যে সাহিত্য-সম্রাটের আদেশ শিরোধার্য করে ৬ মাসের জন্য 'জমিদার দর্পণ' নাটকখানিকে বাজার থেকে তুলে নেন মীর মশাররফ এমনকি ঐ সময়ের জন্য তিনি গ্রন্থখানির বিতরণও নাকি বন্ধ রেখেছিলেন।"[১৬১]

১৮৭৪ খ্রীস্টাব্দের প্রথম দিকে যশোহরে Gerald Meares নামক একজন নীলকর জনৈক দেশীয় পিওনকে প্রচণ্ড মারধোর করায় বিচারে মেয়ার্স সাহেবের দু'মাস জেল হয়। এই দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে সমগ্র ইংরেজ সম্প্রদায় বিশেষ আন্দোলন শুরু করে। তারা চাঁদা তুলে এই দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপিল করে, এবং গভর্নমেণ্টের কাছে তার মুক্তির

জন্যে আবেদন জানায়।' ব্যাপারটা নিয়ে দেশে প্রবল আন্দোলন গড়ে ওঠে, দেশীয় সংবাদপত্রগুলি ক্রুদ্ধ হয়ে ইংরেজদের পাল্টা জবাব দিতে শুরু করে। ফলে, ইংরেজ ও দেশীয়দের মধ্যে বিদ্বেষভাব প্রবল ভাবে বৃদ্ধি পায় [এমন বিদ্বেষ নয় বৎসর পরে, ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দে Ilbert Bill প্রসঙ্গে আর একবার দেখা দিয়েছিল]। যাই হোক, মেয়ার্সের পক্ষে উপস্থাপিত আপিলের আবেদন হাইকোর্ট নাকচ করে দেয়, এবং গভর্নমেণ্টও মেয়ার্সের মুক্তির আবেদন অগ্রাহ্য করে। কিন্তু ইতিমধ্যেই দারুণ ক্ষতি হয়ে গেছে—"...in the meantime great harm had been done, all the flood gates of passion and prejudice had been let loose, and a corresponding feeling of resentment and anger had been excited among the members of the Indian community."[১৬২]

এই সময়ে, যখন গোদের ওপর বিষ ফোড়ার মতো, সমগ্র প্রদেশে পরিব্যাপ্ত ব্যাপক দুর্ভিক্ষ এবং মহামারীরূপে আবির্ভূত নানা রোগে দেশ উৎসন্নে যাচ্ছিল, যার জীবন্ত বর্ণনা ইংরেজ সাংবাদিক জেমস্ রা‌ট্‌লেজ এই ভাবে করেছেন—"About half the thousand people were skin and bone and in most cases aflicted with frightful diseases, made all the more horrible by the almost nude condition of the sufferers."[১৬৩] তখনও বঙ্গেশ্বর ক্যাম্পবেল সাহেবের নিষ্ক্রিয়তা[১৬৪], ভারতীয় বিদ্বেষ ও স্বজনপোষণ-নীতি সমান তালেই বজায় ছিল। প্রচুর শস্য ভাণ্ডারে থাকলেও তিনি প্রথমত শস্য আনা-নেওয়া ('transportation') কার্যটি সম্পূর্ণরূপে নীলকর সাহেবদের হাতে তুলে দিয়ে তাদের অসৎ উপায়ে প্রচুর লাভের সুযোগ করে দেন। [ইতিপূর্বেই জার্মানিতে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় কৃত্রিম নীল প্রস্তুত প্রণালী আবিষ্কৃত হওয়ায় বাংলা দেশের নীলকর সাহেবরা অনেক পরিমাণেই প্রায় বেকার হয়ে পড়েছিল, তদুপরি নীলকর সাহেবদের বাঙালী বিদ্বেষ ছিল সুপরিচিত। সুতরাং জেনেশুনেই ক্যাম্পবেল সাহেব 'ডাইনির হাতে পুত' সমর্পণ করেছিলেন।] ক্যাম্পবেল সাহেবের এই প্রকার অমানবিক ও বৈষম্যমূলক ব্যবহারে দেশময় প্রবল বিক্ষোভ দেখা দেয়। দেশীয় সংবাদপত্রগুলি ক্যাম্পবেল সাহেবের সমালোচনায় এতদূর উচ্চকণ্ঠ ও কঠোর হয়ে উঠেছিল যে, বহুদিন পরে আত্মজীবনী লিখতে বসে সেদিনের কথা ভুলতে না পেরে তিনি লিখেছেন—'I was almost too

well served by the press'।[১৬৬] ক্যাম্পবেল সাহেবের অযোগ্যতা ও নিষ্ক্রিয়তা নিয়ে শুধু যে বাংলা দেশের সংবাদপত্রগুলিই সোরগোল তুললো, তাই নয়, সেই আন্দোলনের ঢেউ ইংল্যাণ্ডে পর্যন্ত গিয়েও আছড়ে পড়লো। পার্লামেণ্টে বাংলা দেশের দুর্ভিক্ষ নিয়ে তর্কবিতর্ক কালে লর্ড স্যালিসবেরি (Lord Salisbury) এবং 'ভারত-সচিব' Duke of Argyll-কে ক্যাম্পবেল সাহেবের কার্যাবলী সমর্থন করতে অনেক কৈফিয়ৎ দিতে হয়।[১৬৭]

কথায় বলে 'যার জন্যে চুরি করি, সেই বলে চোর'—শ্বেতাঙ্গদের জন্যে এত প্রকার অবৈধ কাজকর্ম করা সত্ত্বেও ক্যাম্পবেল সাহেব তাদের নিরঙ্কুশ সমর্থন ও সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত তো হচ্ছিলেনই, পরন্তু উচ্চপদস্থ ইংরেজ মহল তাঁর কার্যাবলীতে অনেকদিন থেকেই এতদূর বিরক্ত ও ক্ষিপ্ত[১৬৮] হয়ে উঠেছিল যে, একসময়ে ক্যাম্পবেল সাহেবকে গভর্নররূপে মাদ্রাজে 'নির্বাসন' দেওয়ার কথা। [সেকালে মাদ্রাজে বদলি ছিল ইংরেজদের কাছে নির্বাসন তুল্য।] চিন্তা করতে তারা বাধ্য হয়েছিল। এ সংবাদ জানা যায় তাঁর সমকালীন এক জাতভাইয়ের রচনা থেকে— "It is believed that Sir George Campbell was cnce solemnly warned by a Deputation from both parties that if he continued his career of insufferable boredom in the House, he would be transported to Government House, Madras."[১৬৯] প্রকৃতপক্ষে অবস্থা তখন ক্রমে এমনই ঘোরালো হয়ে উঠছিল যে, 'হাউস অফ কমন্স' যদি ক্যাম্পবেল সাহেবকে মাদ্রাজে নির্বাসিত করে, তাহলে দেশের লোক যে কত স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচবে, এটিও প্রসংগত ঐ লেখক জানাতে ভোলেন নি।[১৭০]

কালা আদমিদের সঙ্গে জাতভাইদেরও বিরাগের আঁচ ক্যাম্পবেল সাহেব অনেকদিন ধরেই পেয়ে আসছিলেন। এর উপর দুর্ভিক্ষ নিবারণের কাজে তাঁকে টপকিয়ে স্যার রিচার্ড টেম্পলকে (Sir Richard Temple) নিয়োগ করা হলে এবং তাঁর অপদার্থতা এইভাবে প্রকাশিত হয়ে গেলে, তিনি প্রায় ভেঙে পড়েন। ফলে, ঘরে বাইরের এই রকম লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা আর সহ্য করতে না পেরে স্বাস্থ্যের অজুহাত দেখিয়ে অর্থাৎ 'আপনি বাঁচলে বাপের নাম'—কালা আদমিদের এই আপ্তবাক্য সার করে তড়িঘড়ি পদত্যাগ (৮ই এপ্রিল, ১৮৭৪) করে বিলাতে পাড়ি জমালেন ক্যাম্পবেল সাহেব।[১৭১] তবে কথায় বলে 'মরার আগে শেষকামড়', ক্যাম্পবেল সাহেবও বাংলা দেশ

ছাড়বার আগে এরকম একটা শেষ কামড় দিয়ে গেলেন। তাঁর দু'চোখের বিষ বাঙালী হিন্দুদের আঁতে ঘা দেবার উদ্দেশ্যে শ্রীরামপুরের মাহেশের রথযাত্রা উৎসবটি বন্ধ করার জন্যে সম্ভবতঃ কিছুদিন ধরেই তিনি চেষ্টা করে আসছিলেন। বাংলার মসনদ ত্যাগ করার অব্যবহিত পূর্বে এ বিষয়ে তিনি যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন,[১৭২] তা তাঁর উত্তরাধিকারী টেম্পল সাহেব কার্যে পরিণত করলেন মাত্র, অর্থাৎ ১৮৭৪ সনের রথযাত্রা বন্ধের আদেশ প্রচারিত হলো। দুষ্টের ছলের অভাব হয় না, অতএব জনসাধারণের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে—এই হলো রথযাত্রার প্রথমদিনে রথটানা বন্ধের অজুহাত, এবং পুনর্যাত্রার ('উল্টোরথ') দিনে সম্পূর্ণ এক ভিন্ন অজুহাত দেওয়া হলো অর্থাৎ —রথটি যথেষ্ট মেরামত করা হয়নি (এই অজুহাত দুটি ক্যাম্পবেল সাহেবেরই মস্তিষ্কজাত বলে মনে হয়)। অবশ্য সাংবাদিক কৃষ্টদাস পালের প্রচেষ্টায় শেষ মুহূর্তে লর্ড নর্থব্রুক রথযাত্রা বন্ধের আদেশ প্রত্যাহার করেছিলেন।[১৭৩] এই রকম ঘটনায় শিক্ষিত মানুষমাত্রই যে ক্রমে ইংরেজ-বিদ্বেষী হয়ে উঠবে, এ আর আশ্চর্য কি! এই সময়েই যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ (১৮৪৫-১৯০৪) সম্পাদিত 'আর্য্যদর্শন' নামক মাসিক পত্রিকা, (যে পত্রিকাটিকে কোনো ঐতিহাসিক 'এদেশে বিপ্লববাদ প্রচারের প্রথম পথপ্রদর্শক' বলে উল্লেখ করেছেন[১৭৪]) প্রকাশিত হয়—১৮৭৪ এপ্রিল।

প্রায় এই সময়েই এক উচ্চপদস্থ শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীর অপদার্থতার কীর্তি[১৭৫] সংবাদপত্রাদিতেই প্রকাশিত হয়ে পড়লে, তা শিক্ষিত মহলে বিশেষ আন্দোলনের সূচনা করে। এই ইংরাজ পুঙ্গবটি হলেন রংপুরের জেলাজজ মিঃ এ. লেভিন (Mr. A. Levin), ইনি মামলার রায় পর্যন্ত লিখতে জানতেন না, এই রায় লেখার কাজটি করে দিতেন তাঁর সেরেস্তাদার উমাচরণ সেন। রংপুরের হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের ১২ জন উকিল এরকম অস্বাভাবিক ও বেআইনি অবস্থার প্রতিকারের জন্যে সংঘবদ্ধ হয়ে দুটি হলফনামা ('affidavit') করেন : প্রথমটি লেভিন সাহেবের অপদার্থতার বিরুদ্ধে এবং দ্বিতীয়টি, কিভাবে উমাচরণ লেভিনের রায় লিখে দেন সেই বিষয়ে। এই এফিডেবিট দুটি ১৮৭৪ খ্রীস্টাব্দের ৩০ এপ্রিল অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে "ইংরেজ রাজপুরুষগণের মধ্যে একটা মহা উত্তেজনা পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক ও রংপুরের উকিলগণকে অভিযুক্ত করিবার জন্য তাঁহারা গভর্ণমেণ্টকে উত্তেজিত করিতে ত্রুটি করেন নাই।"[১৭৬]

লেভিনের পক্ষ-সমর্থনকারী শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায় এবং অপদার্থ লেভিনের বিরুদ্ধাচারী দেশীয়-সম্প্রদায় দেশময় বিশেষ আন্দোলনের সৃষ্টি করে। ফলে, গভর্নমেণ্ট এই আন্দোলনের প্রায়-সূত্রপাতেই বাঙ্গালী উমাচরণ সেনকে বরখাস্ত করে, কিন্তু শ্বেতাঙ্গ লেভিনকে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্যে সুযোগ দেয়। সরকারের এই প্রকার বিচার-বৈষম্য ও দুমুখো নীতিতে সেকালের দেশীয় লোক এতদূর উত্তেজিত ও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল যে, এই অবিচারের কথা তারা সহজে ভুলতে পারেনি। কিছুকাল পরে সামান্য ত্রুটির অজুহাতে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে যখন লাঞ্ছিত ক'রে[১৭৭] আই. সি. এস. পদ থেকে বিতাড়ন করা হয়, তখন লেভিনের অপরাধের গুরুত্বের সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথের লঘু অপরাধের তুলনা করে স্বৈরাচারী শাসকগোষ্ঠীর ভণ্ডামি ও লোক-দেখানো সততাকে তারা ধিক্কার না জানিয়ে পারেনি।[১৭৮] অতি সামান্য অপরাধে যেখানে সুরেন্দ্রনাথের 'সামান্য কয়েদীর মত বিচার হয়', সেখানে অতি-গর্হিত কারণে 'প্রকৃত অপরাধী লেভিনের লঘুদণ্ড বা বিচার-প্রহসন' সমকালীন বাঙ্গালী সমাজে যে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া অর্থাৎ ইংরেজ-বিদ্বেষ সৃষ্টি করবে, তা বলাই বাহুল্য।[১৭৯]

প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরেই কর্মকর্তা বা পরিচালকমণ্ডলীর মধ্যে নানা মতভেদ বা 'দলাদলি'[১৮০] সত্ত্বেও নানা ধরনের নাটক মঞ্চস্থ করার মধ্য দিয়ে ন্যাশনাল থিয়েটার জনজীবনের উপর অপরিসীম প্রভাব বিস্তার করে। ফলে, একে একে যেমন অনেকগুলি রঙ্গমঞ্চের আবির্ভাব হয়, তেমনি চাহিদানুপাতিক নাটক জোগানের ব্যাপারে কয়েকজন প্রতিভাশালী নাট্যকারেরও অভ্যুদয় ঘটে। "নাটকে ঐতিহাসিক বীরত্বগাথা ও গৌরবকাহিনী কীর্তন করিলে হয়তো দেশের প্রতি লোকের অনুরাগ ও স্বদেশপ্রীতি উদ্বোধিত হইতে পারে",[১৮১] এরূপ বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর 'পুরু-বিক্রম' নামে যে নাটকটি রচনা করেন, তা ১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দের ১২ আগস্ট 'বেঙ্গল থিয়েটারে' এবং ৩রা অকটোবর 'গ্রেট বেঙ্গল থিয়েটারে' অভিনীত হয়। নাটকের নিম্নোদ্ধৃত অংশটি সেকালের বাঙ্গালীদের খুব প্রিয় হয়েছিল,—

'এত স্পর্ধা যবনের স্বাধীনতা ভারতের
অনায়াসে করিবে হরণ?
তারা কি করেছে মনে সমস্ত ভারতভূমে
পুরুষ নাহিক একজন?'

অল্পসময়ের ব্যবধানে হরলাল রায়ের 'বঙ্গের সুখাবসান' নাটকটি অভিনীত হতে শুরু করে। দেশবাসীর অন্তরে দেশপ্রেমের সঞ্চারই ছিল নাটকটির মুখ্য উদ্দেশ্য। জনপ্রিয় হওয়ায় নাটকটি সেকালে বহুবার মঞ্চস্থ হয়েছিল। প্রায় এই সময়েই উপেন্দ্রনাথ দাস (১৮৪৮-৯৫) রচিত 'শরৎ-সরোজিনী' নাটকটিও লোকমনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। ইংরেজকে শক্তির দ্বারা ভারতবর্ষ থেকে বিতাড়িত করতে হবে, নাটকের এই মূল বক্তব্য নাট্যকার যথেষ্ট কৌশলের সঙ্গেই পরিবেশন করেছিলেন। নাটকে এইরূপ বৈপ্লবিক ব্যবস্থার বিধান থাকায় সতর্কতা হিসাবে নাট্যকার নিজের নামের বদলে 'দুর্গাদাস দাস' এই ছদ্মনামটি ব্যবহার করেছিলেন। এই জাতীয় বহু নাটক সেকালে খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল, যেমন নবীনচন্দ্র বিদ্যারত্নের 'ভারতের সুখশশী যবন কবলে', শ্রীকুঞ্জবিহারীর 'ভারত অধীন', বিপিনবিহারী ঘোষালের 'বঙ্গের পুনরুদ্ধার' রাজেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর 'ভারত বিজয়' প্রভৃতি। দেশবাসীর মনে দেশপ্রেমের তথা বিদেশী-শাসনবিরোধী মনোভাব গড়ে তুলতে সেদিন এই শ্রেণীর নাটকগুলি যথেষ্ট সহায়তা করেছিল সন্দেহ নেই।

প্রায় ৮ ফুট লম্বা বিখ্যাত চৈনিক ব্যায়ামবীর ('The Chinese Giant') চ্যাং ('Chang'), যাঁকে একটি বিদেশী পত্রিকায় বলা হয়—"a most remarkable specimen of humanity, a finely made man, a gentleman and a scholar, occupying himself in literary pursuits"; আবার অন্য পত্রিকায় 'like a Hindu God' বলে প্রশংসা করা হয়েছিল, তিনি কলকাতায় তাঁর দলবল নিয়ে ১৮০৩ খ্রীস্টাব্দের ২০ অকটোবর থেকে সাতদিন সকালে (৯টা থেকে ১২টা ও বিকালে ৫টা থেকে রাত্রি ১০টা) দু'বার করে ব্যায়াম কৌশল দেখিয়েছিলেন। ব্যায়াম প্রদর্শনীর সঙ্গে তাঁর মুদ্রিত আত্ম-জীবনী, জীবনী ও ভ্রমণবৃত্তান্ত বিক্রয়ার্থে রাখা হয়েছিল।[১৮২] সেকালে কলকাতার মানুষ এই বিশ্বখ্যাত ব্যায়ামবীরের ক্রীড়াকৌশল আনন্দ ও উৎসাহের সঙ্গে দেখেছিল, এরকম মনে করা যায়।

বঙ্কিমচন্দ্র এই ক্রীড়া প্রদর্শনী দেখেছিলেন কিনা, তার কোনো প্রমাণ পাইনি (সংবাদপত্রাদির মারফৎ বিষয়টি তিনি অবগত হয়ে থাকতে পারেন), তবে তিনি যে এই সময়ে মস্তিষ্ক চর্চার সঙ্গে শরীর-চর্চারও বিশেষ প্রয়োজন আছে বলে অনুভব করেছিলেন, তার প্রমাণ আছে। ১৮৭৯

খ্রীস্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে প্রকাশিত ডাঃ হরিশ্চন্দ্র শর্মার 'ব্যায়ামশিক্ষা' পুস্তকটির সমালোচনা প্রসঙ্গে ১২৮০ সালের চৈত্র সংখ্যা 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় বঙ্কিমচন্দ্র লিখছেন—"বাঙ্গালীর পক্ষে ব্যায়াম শিক্ষা বিশেষ প্রয়োজন। বাঙ্গালীর বিদ্যা-বুদ্ধির অভাব নাই, বল ও সাহস হইলেই আমরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতির মধ্যে গণ্য হইতে পারি। বল হইলেই সাহস হইবে। বলের পক্ষে ব্যায়ামশিক্ষা বিশেষ প্রয়োজন।"

মানসিক বলের সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক বলের প্রয়োজনীয়তা সেকালে বঙ্কিমচন্দ্রের মতো অনেকেই অনুভব করেছিলেন। প্রথমাবধি 'হিন্দু মেলা'তে নানাবিধ ব্যায়াম প্রদর্শনের ব্যবস্থা দ্বারা বাঙ্গালী যুবকদের শরীর চর্চায় উৎসাহ দেওয়া হয়েছিল। বাংলা ভাষায় কিছু কিছু শরীরচর্চার বইও প্রকাশিত হচ্ছিল।[১৮৩] ভূদেব মুখোপাধ্যায় স্কুল সমূহ পরিদর্শন কালে ছাত্রদের শক্তি-চর্চায় মনোযোগী হবার জন্যে উপদেশ দিতেন।[১৮৪] কলকাতায় শরীরচর্চার একটি আখড়া খুলেছিলেন নবগোপাল মিত্র। বাঙ্গালিদের মনে সাহস সঞ্চারের জন্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর বন্দুক ছোঁড়া ও শিকারের প্রবর্তন করে-ছিলেন।[১৮৫] ১২৮১ সালের ২৩ শে কার্তিক (১০ নভেম্বর ১৮৭৪) তারিখে 'সাধারণী' পত্রিকায় 'অস্ত্রশিক্ষা' নামে যে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়, সেখানে বাঙ্গালিদের 'যাহাতে পদে পদে বিদেশীদের পদলেহন করিতে না হয়' তজ্জন্য 'সকল কার্য ছাড়িয়া যাহাতে বঙ্গবাসীদিগের শারীরিক বল বিধান হয় তদ্বিষয়ে যত্নশীল' হবার জন্যে আহ্বান জানানো হয়েছিল। এইভাবে বঙ্গদেশীয় যুবকদের আত্মশক্তিতে বিশ্বাস আনয়ন পূর্বক কিছু পরিমাণে স্বাবলম্বী ও স্বাধীন মনোবৃত্তিসম্পন্ন করে গড়ে তোলার জন্যে, তাদের শরীর-চর্চায় উৎসাহ দেওয়া হতে থাকে।

সুরেন্দ্রনাথকে আই.সি.এস. পদ থেকে বিতাড়ন ঘটনায় এই সময়ে শুধু-মাত্র বাঙ্গালী নয়, সারা ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মন ইংরেজ শাসন সম্পর্কে তিক্ততায় ভরে উঠলো।[১৮৬] শাসনকার্যের গুরুত্বপূর্ণ পদ সমূহ থেকে বিশেষভাবে বাঙ্গালিদের বঞ্চিত বা বিতাড়িত করবার অপচেষ্টা কিভাবে ইংরেজ আমলারা করে আসছিল, তা আমরা ইতিপূর্বেই দেখেছি। অত্যন্ত তুচ্ছ কারণে কৃষ্ণাঙ্গ সুরেন্দ্রনাথের পদচ্যুতি ঘটলো, পক্ষান্তরে গুরুতর অপরাধ সত্বেও রংপুরের জেলাজজ জেভিস শ্বেতাঙ্গ বলে সরকারের কাছ থেকে কিরূপ ব্যবহার পেলেন—এই দুটি বিচার-ব্যবস্থার মধ্যে আকাশ-পাতাল

পার্থক্য দেখে ভারতের শিক্ষিত সমাজে তা নিদারুণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করলো — সারা ভারতের দেশীয় সংবাদপত্র জগতে বিশেষ আন্দোলন দেখা দিল। "সুরেন্দ্রনাথের প্রতি এই বর্বরোচিত ব্যবহার— রাজক্ষমতার নিরাপদ অন্তরাল থেকে স্বৈরাচারী শাসকদের অকুণ্ঠচিত্তে এইরূপ লাঞ্ছনা ও অপমান বর্ষণ ভারতবাসীকে রোষে ও ক্ষোভে উন্মত্ত করে তুললো। বাঙালীর তো কথাই নাই, শিক্ষিত ভারতবাসী মাত্রেই মনে করতে লাগলেন যে, এই অপমান একা সুরেন্দ্রনাথের নয়-এর আঘাত তাঁদের প্রত্যেককেই লেগেছে। দেশে একটা তুমুল আন্দোলন চলতে লাগলো।"[১৮৭]

ইতিমধ্যে, ১৮৭৪ খ্রীস্টাব্দের ৭ই ফেবরুয়ারি, কামরূপ, দরঙ্গ, নওগাঁ, শিবসাগর, লখিমপুর, গারো, খাসিয়া, জয়ন্তিয়া ও নাগা হিল্‌স নিয়ে 'আসাম' প্রদেশ গঠিত হয়েছিল। "'শাসনকার্যের' সুবিধার জন্যে ঐ বছর (১৮৭৪ খ্রী.) ১২ই সেপটেম্বর তারিখে আর একটি 'নোটিফিকেশন' মারফৎ সিলেট (শ্রীহট্ট) জেলাকে আসামের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। তখনই কিন্তু সিলেটে উঠেছিল প্রতিবাদের ঝড। সিলেটবাসীকে প্রবোধ দিতে স্বয়ং বড়লাট লর্ড নর্থব্রুককে সিলেটে আসতে হয়েছিল। সিলেটের মতো নগণ্য শহরে লর্ড নর্থব্রুকের আগে আর কোনো বড়লাট পদার্পণ করেন নি।"[১৮৮] বঙ্গমাতার প্রথম অঙ্গচ্ছেদের তিক্তস্বাদ বঙ্গসন্তানরা যে ভুলতে পারেনি, তার প্রমাণ হলো ১৯০৫ সনের বঙ্গ-দ্বিখণ্ডী করণের প্রস্তাবে সমস্ত বাঙ্গালি একজোট হয়ে প্রতিবাদে ফেটে পড়েছিল। একটি জেলার অধিবাসীদের মর্মবেদনা সেদিন (১৮৭৪ খ্রী.) সারা দেশবাসী অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করেছিল।

নানাবিধ কারণে (যা ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে), ১৮৭৪ খ্রীস্টাব্দের মাঝামাঝি সময় থেকেই দেশের অবস্থা খুব ঘোরালো হয়ে উঠতে থাকে। এই সময়ে সাংবাদিক কৃষ্টদাস পাল তাঁর সম্পাদিত '*The Hindoo Patriot*' পত্রিকায় ভারতে 'হোমরুল' ('Home Rule') প্রবর্তনের দাবি ঘোষণা করলেন।[১৮৯] দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি তখন কোন পর্যায়ে পৌচেছে তা জানা যায় এই ঘটনাটি থেকে যে, পৃথিবীব্যাপী ইংরেজ সাম্রাজ্যের উৎখাতের জন্যে ইংরেজ শাসিত, শোষিত ও নির্যাতিত আয়ারল্যাণ্ডের দেশপ্রেমিক নেতারা যে সুদীর্ঘ কালব্যাপী সংগ্রাম করে আসছিলেন, তারই একটা কর্মপদ্ধতি হিসাবে তাঁদের সৃষ্ট 'Constitutional Reform Association'-এর আন্দোলনে ভারতের রাজনৈতিক নেতাদের সহযোগিতা আহ্বানের প্রস্তাব ১৮৭৩

খ্রীস্টাব্দে উত্থাপন করেছিলেন বিখ্যাত আইরিশ নেতা O' Donnell. সাহেব [এ বিষয়ে 'সঞ্জীবনী সভা' অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে]।

কিছুকাল থেকে (প্রধানতঃ নূতন বিবাহ আইন চালু করার আন্দোলনের সময় থেকে) দেশের শিক্ষিত যুবকদের উপর থেকে কেশবচন্দ্রের প্রভাব হ্রাস পেতে থাকে। অন্ধ আনুগত্যের পরিবর্তে যুবকদের মধ্যে যুক্তিবাদ ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবোধ প্রাধান্য লাভ করতে আরম্ভ করে। স্ত্রী-স্বাধীনতা ও 'সমাজ'-এর কার্যে নিয়মতন্ত্র স্থাপনের পক্ষে শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৭-১৯১৯) প্রমুখের 'সমদর্শী' পত্রিকা তখন আন্দোলন শুরু করেছে, 'কেশবচন্দ্র যোগ ভক্তি বৈরাগ্য প্রভৃতি লইয়া একান্তে সরিয়া পড়িতেছেন'[১১০], শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪০-১৯২৫) প্রতিষ্ঠিত 'শ্রমজীবী সমিতি' (১৮৭০ খ্রীস্টাব্দ) মুখপত্ররূপে ১৮৭৪ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাস থেকে 'ভারত শ্রমজীবী' মাসিক পত্রিকাতে অবহেলিত হতভাগ্য শ্রমিকদের প্রকৃত অবস্থার চিত্র তুলে ধরে দেশবাসীকে তাদের সম্পর্কে সচেতন করার প্রয়াস শুরু হয়েছে।[১১১] এই সময়েই ১৮৭৪ খ্রীস্টাব্দের ৩রা নভেম্বর [১১২] ভারতের 'প্রথম র‍্যাংলার' আনন্দমোহন বসু বিলাত থেকে কলকাতায় এসে পৌঁছলেন, এবং বৎসর কালব্যাপী প্রবল দুর্ভিক্ষেরও অবসান হলো প্রায় এই সময়ে।

আনন্দমোহনের কলকাতায় ফেরার এক সপ্তাহের মধ্যেই সমস্ত ভারতবর্ষ চঞ্চল ও বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠবে, এমন একটি ঘটনা ঘটলো। ঘটনাটি হলো ১৮৭৪ খ্রীস্টাব্দের ৯ই নভেম্বর বরোদার গায়কোয়াড মলহর রাও নাকি হীরকচূর্ণের সঙ্গে বিষ মিশ্রিত করে বরোদার 'Resident' শ্বেতাঙ্গ Col. Robert Phayre সাহেবকে হত্যা করার চেষ্টা করেছেন। সংবাদটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই সারা ভারতবর্ষ তোলপাড় হতে থাকে। গায়কোয়াডের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ যে মিথ্যা ও সাজানো[১১৩], এবং এটি যে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের স্বাধীন বরোদা রাজ্য গ্রাস করবার একটা শয়তানি চক্রান্ত মাত্র, এটা ভারতের শিক্ষিত মানুষমাত্রেই তৎক্ষণাৎ বুঝে ফেলেছিল। শিশির-কুমার ঘোষ তাঁর অমৃতবাজার পত্রিকার ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দের ১৪ জানুয়ারি সংখ্যায় লিখলেন যে, ইংরেজদের 'অসহনীয় অপমান ও অত্যাচার'[১১৪] দ্বারা অতিষ্ঠ হয়েই সম্ভবত মলহর রাও এই পথ নিয়েছিলেন। ভারত সরকার Col. Phayre-কে 'রেসিডেন্ট' রূপে বরোদায় পাঠিয়ে প্রতিনিয়ত অপমান ও অত্যাচার দ্বারা মলহর রাওয়ের জীবনকে যেভাবে বিপর্যস্ত[১১৫]

করেছে, তাতে 'It was impossible for human nature to be silent in such a position.'

শিশিরকুমার একটি সদৃশ কাল্পনিক অবস্থার চিত্র এঁকে প্রশ্ন করলেন— "What the English had done if, for instance the Russian Emperor had deputed an officer like Col. Phayre to keep an eye on the doings of the English Government, to interfere with all their acts, to teach people insubordination to the law and spread calumnies to the Queen?" এই প্রশ্নের উত্তরও তিনি দিয়েছেন যে, তাদের সামনে খোলা দুটি পথের একটিকে ইংল্যাণ্ডবাসীরা অবশ্যই অবলম্বন করতো ("It would either, if it had any confidence in its power, expel the Russian officer from the country after subjecting him to all manner of insults, or alternatively, attempt to get rid of him by some such means as adopted by the Gaekward?) তিনি আরো বললেন—ভারতের করদ রাজ্যগুলিতেও ইংরেজরা এইপ্রকার অসহনীয় অত্যাচার ও অপমান দিনের পর দিন চলিয়ে যাচ্ছে, তথাপি এইপ্রকার বিষ প্রয়োগের[১৯৬] ঘটনার কথা যে বেশি শুনা যায় না, তার কারণ হলো ভারতীয়রা একান্ত অসহায়, বিশেষ দুর্বল এবং চূড়ান্ত সহনশীল।

অতঃপর গায়কোয়াড়ের কার্যকে সমর্থন করেই শিশিরকুমার লিখেছেন— "It is evident that he had no other than this atrocious way left to be freed from all oppressions of the Resident. If proper enquiry is conducted, the performances of Phayre and the results were made public, the common people England of would hang down their heads in shame". পরবর্তী ২৮ জানুয়ারি (১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দ) সংখ্যার পত্রিকায় শিশিরকুমার ইংরেজ সরকারকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললেন, যেহেতু গায়কোয়াড় স্বাধীন রাজা, সুতরাং তাঁকে ভারতে প্রচলিত ফৌজদারি আইন ('Indian Penal Code') মোতাবেক বিচার করা যাবে না। ইতিমধ্যে মলহর রাও সম্পর্কে ভারত সরকারের অবলম্বিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ইংল্যাণ্ডে বিশেষ আলোড়ন শুরু হয়েছে, সেখানকার পত্র-পত্রিকাগুলো একবাক্যে বিষ প্রয়োগে হত্যার চেষ্টা ঘটনাটিকে মিথ্যা বলে ঘোষণা করেছে।[১৯৭]

ইংল্যাণ্ডে ও ভারতে তুমুল আন্দোলন ও বিক্ষোভ[১৯৮] দেখে মলহর

রাও-এর বিচারার্থ বড়লাট লর্ড নর্থব্রুক শেষ পর্যন্ত তিনজন ভারতীয় (গোয়ালিয়ারের মহারাজা, জয়পুরের মহারাজা ও স্যার দিনকর রাও) এবং তিনজন ইংরেজকে (Sir Richard Couch, Sir Richard John Meade, Mr Phillip Sandys Melvil) নিয়ে একটি কমিশন গঠন করলেন। মলহর রাওয়ের ঘটনা নিয়ে তখন কলকাতা তোলপাড় হচ্ছিল। মলহর রাওকে সমর্থন করবার জন্যে কলকাতার শিক্ষিত সম্প্রদায় একটা রক্ষা সমিতি ('Defence committee') পর্যন্ত প্রতিষ্ঠা করেছিল।[১৯৯] মলহর রাওকে সমর্থন করবার জন্যে প্রচুর অর্থ ব্যয়[২০০] করে কলকাতা হাইকোর্টের মিঃ ব্রানসন ও মিঃ পারনেল (Mr. Branson ও Mr. Parnell) এবং বোম্বাই হাই-কোর্টের শান্তারাম নারায়ণ (Shantarm Narayan) ও বাসুদেব জগন্নাথ (Basudev Juggannath)এই চারজন বিশিষ্ট আইনজীবী ছাড়াও বিলাতের বিখ্যাত ব্যারিস্টার Mr. Serjeant Ballantine-কে নিযুক্ত করা হয়।

১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দের ২৩ ফেব্রুয়ারি থেকে সরকার গঠিত ছয় সদস্যের 'কমিশনে' গায়কোয়াডের বিচার প্রহসন[২০১] শুরু হয়। বিচার শেষে তিনজন ভারতীয় সদস্য গায়কোয়াড়কে নির্দোষ, পক্ষান্তরে তিনজন শ্বেতাঙ্গ সদস্য গায়কোয়াডকে দোষী বলে সাব্যস্ত করেন। এই 'ন যযৌ ন তস্থৌ' অবস্থায় ইংরেজ সরকার হতবুদ্ধি হলো না, কেননা বিচার শুরু হবার আগে থেকেই তারা ঠিক করে রেখেছিল যে, বিচারের ফল যাই হোক, মলহরকে আচ্ছা রকম শাস্তি দিতে হবে।[২০২] সুতরাং এই অবস্থায়, 'Give the dog a bad name and hang it'—তাদের এই প্রবাদ বাক্যকে শিরোধার্য করে মলহর রাও রাজ্য শাসনের অযোগ্য এই বদনাম দিয়ে ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দের ২২ এপ্রিল মলহরকে গদিচ্যুত করা হলো, এবং পাছে বরোদার রাজভক্ত[২০৩] প্রজারা ক্ষেপে উঠে বিদ্রোহী হয়, এজন্যে তড়ি-ঘড়ি লুকিয়ে[২০৪] প্রচুর ইংরেজ সেনার দ্বারা পরিবেষ্টিত করে[২০৫] মলহর রাওকে সপরিবারে মাদ্রাজে নির্বাসিত করা হলো, যেটি অনেক ইংরেজও ঠিক পুরোপুরি হজম করতে পারেনি।[২০৬] ছত্রপতি শিবাজীর, তথা বীরশ্রেষ্ঠ মারাঠা জাতির অন্তর্ভুক্ত এত বড় একটা দেশের[২০৭] স্বাধীন রাজাকে এই ভাবে অপমানিত, গদিচ্যুত, এমনকি দেশমাতার কোল থেকে ছিনিয়ে সুদূর নির্বান্ধব ও অপরিচিত স্থানে নির্বাসন দেওয়ায়, সমস্ত ভারতবর্ষ সেদিন ঘৃণায় ও ক্রোধে অধীর হয়ে উঠেছিল।[২০৮]

এই সময়ে সাংবাদিক শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁর সম্পাদিত '*Mookerjee's Magazine*' পত্রিকার তিনটি সংখ্যায় 'The Baroda Yellow Book' নামে যে দীর্ঘ রচনাটি প্রকাশ করেন (পরে স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়), তার ছত্রে ছত্রে ইংরেজ-শাসনের প্রতি প্রবল বিদ্বেষ ('The intense hatred of British rule which breathes in almost every line of the pamphlet') ফুটে উঠেছে।[২০৯] শম্ভুচন্দ্রের রচনাটি যেন অগ্নিতে ঘৃতাহুতির কাজ করলো। ইতিমধ্যে দেশময় পরিব্যাপ্ত দীর্ঘ-দিনের পুঞ্জীভূত ইংরেজ-বিদ্বেষ মলহর রাও-এর ব্যাপারে আরো জ্বলে উঠলো।[২১০] গায়কোয়াড়ের ব্যাপার নিয়ে 'অমৃতবাজার পত্রিকা' এই সময়ে এমন প্রচণ্ডভাবে ইংরেজ সরকারের সমালোচনা করতে শুরু করে যে, বড়লাট নর্থব্রুক পত্রিকাটির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনে অগ্রসর হন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভারতের অ্যাডভোকেট-জেনারেল স্যার চার্লস পল-এর (Sir Charles Paul) সুপরামর্শে অমৃতবাজারের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার চেষ্টা থেকে বিরত হন।[২১১]

মলহর রাওয়ের উপরে ইংরেজদের অত্যাচার সেকালে বাঙালিদের মনে যে কত গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল, তার বহু প্রমাণ আছে। এখানে তার দুটি প্রমাণ উপস্থিত করছি। প্রথম প্রমাণটি হলো, এই ঘটনার অত্যল্পকালের মধ্যে ইংরেজদের অত্যাচারের দিকটিকে ফুটিয়ে তোলবার জন্যে গায়কোয়াড়ের ঘটনা নিয়ে অমৃতলাল বসুর 'হীরকচূর্ণ', নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গুইকোয়ার,' উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্রের 'গুইকোয়ার' ইত্যাদি বহু নাটক রচিত ও প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় প্রমাণ হলো এই যে ঘটনাটির বছর খানেক পরে, ১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দের ৮ই এপ্রিল কলকাতা টাউন হলে তদানীন্তন বঙ্গেশ্বর স্যার রিচার্ড টেম্পল-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায়, (যে সভার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল অবসর গ্রহণের প্রাক্‌কালে বড়লাট নর্থব্রুককে কিভাবে সম্মানপত্র দ্বারা অভিনন্দন জানানো হবে সে সম্পর্কে আলোচনা করে ব্যবস্থা অবলম্বন করা) যেখানে বাংলা দেশের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন, সেই সভায় লর্ড নর্থব্রুক যেহেতু দেশের কোনো প্রকৃত মঙ্গল করেন নি, অতএব তাঁকে কোনো সম্মানপত্র দেওয়া যায় না, এই মর্মে একটি বিকল্প প্রস্তাব উত্থাপন করে সাংবাদিক শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং ৯জন বাঙালি[২১২] একযোগে সভা ছেড়ে বেরিয়ে

যান। অবশ্য এই এক বছর সময়কালের মধ্যে, এমনকি তার পরেও, মলহর রাওয়ের উপরে ইংরেজদের অত্যাচারের কথা বাঙালী লেখকদের রচনায় নানা সূত্রে বহুবার উল্লিখিত হয়েছে।

এর উপর ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দের প্রথম দিক থেকেই ঢাকা জেলার কৃষকদের মধ্যে প্রবল অসন্তোষ দেখা দিতে থাকে, এবং অচিরে তা সমগ্র বাংলা দেশে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়ার সমূহ সম্ভাবনা দেখা দেয়।[২১৩] আবার, প্রায় এই সময়েই বিহারে নীলকর ও রায়তদের মধ্যেও সম্পর্কের দারুণ অবনতি ঘটে, যা গভর্নমেণ্টেরও বিশেষ দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে ওঠে।[২১৪] কিছুকাল যাবৎ আসাম প্রভৃতি অঞ্চলের চা-কুলিদের অবস্থা নিয়ে দেশের শিক্ষিত সমাজে যে ক্ষোভ সঞ্চারিত হচ্ছিল, তা এই সময়ে আত্মপ্রকাশ করে। উনিশ শতকের প্রায় মাঝামাঝি সময় থেকে চা উৎপাদন ব্যবসা প্রভূত লাভজনক বলে পরিগণিত হওয়ায়, শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ের একটা অংশ ক্রমেই অধিকমাত্রায় আসাম, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ইত্যাদি অঞ্চলে চা-বাগান সৃষ্টি করতে থাকে। তারা আড়কাঠিদের সহায়তায় অমানবিক উপায়ে নারী পুরুষ সংগ্রহ করে অতি শস্তায় শ্রমিক হিসাবে নিয়োগ করতে থাকে।[২১৫] কিন্তু ঐ শ্রমিকদের উদয়াস্ত পরিশ্রমের সঙ্গে সঙ্গে প্রায় জন্তু-জানোয়ারের মতো ব্যবহার করা হতে থাকে। এই সংবাদ উনিশ শতকের সত্তরের দশক থেকে সংবাদপত্রাদি মারফৎ জনসমাজে প্রকাশিত হতে থাকে। সরকার ইতিমধ্যেই যে আইনগুলি প্রণয়ন করেছিল, তাতে চা বাগানের শ্বেতাঙ্গ মালিকদেরই নিরঙ্কুশ সুবিধা-সুযোগ দেওয়া হয়েছিল, এবং তার ফলে শ্রমিকদের উপর শ্বেতাঙ্গদের অত্যাচারের মাত্রা আরো বৃদ্ধি পেয়েছিল।[২১৬] চা-কুলিদের এই নিদারুণ দুর্দশার সংবাদ, সত্তরের দশকের মাঝামাঝি সময়ে কলকাতার ছাত্রসমাজকে যে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় ঐ সময়ে শ্রীহট্ট থেকে উচ্চশিক্ষার্থে কলকাতায় পড়তে আসা ছাত্র ও পরবর্তী কালের নেতা বিপিনচন্দ্র পালের আত্মস্মৃতিতে।[২১৭] এই ধরনের সংবাদসমূহ দেশীয় সংবাদ পত্রগুলিতে সে সময়ে দিনের পর দিন প্রকাশিত হচ্ছিল, যার মাধ্যমে শাসক জাতির প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ভারতবাসী ক্রমেই বিশেষভাবে সচেতন হওয়ার অবকাশ পাচ্ছিল।

ইত্যবসরে ঘোষ ভ্রাতৃদ্বয়, শিশিরকুমার ও হেমন্তকুমার, বাংলা দেশের জেলাগুলিতে ঘুরে ঘুরে বহু জেলাতেই 'District Association' গড়ে তুলেছেন,

এবং এই সকল সমিতির কার্য পরিচালনার জন্যে কলিকাতায় একটি কেন্দ্রীয়-সমিতি 'প্রতিষ্ঠা'[২১৮] করার বিষয়েও শিশিরকুমার অনেকদিন ধরেই চিন্তা করে আসছিলেন। আবার, বিলাত থেকে কলকাতা প্রত্যাবর্তনের পথে বোম্বাইয়ের যুব-সমাজের নানামুখী প্রয়াস দেখে[২১৯] আনন্দমোহন বসু কলকাতায় অনুরূপ একটি ছাত্র-সমিতি গঠনের প্রয়াস এই সময়ে শুরু করেছিলেন। প্রেসিডেনসি কলেজের প্রাক্তন ছাত্র[২২০] আনন্দমোহন প্রথমাবস্থায় কেবলমাত্র প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রদের নিয়েই ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দের ২৩ এপ্রিল[২২১] কলকাতাতে 'Students' Association' প্রতিষ্ঠা করলেন। এই ছাত্রসভার প্রথম সম্পাদক ('secretary') নির্বাচিত হলেন প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র নন্দকৃষ্ণ বসু।[২২২] প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই সভাটি যে ছাত্রদের কাছে বিশেষ আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল, তার একটি প্রমাণ আছে। প্রায় এই সময়েই বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী Henry Woodrow (১৮২৩-৭৬) অস্থায়ী অধ্যক্ষ রূপে প্রেসিডেনসি কলেজে যোগদান করেছিলেন। ছাত্রদের মঙ্গলার্থে প্রতিষ্ঠিত এই ছাত্রসভাটি তাঁর এতদূর প্রীতি-পক্ষপাত অর্জন করেছিল যে, নানাবিধ অফিসিয়াল ('official') কর্মের মধ্যে তিনি 'সভাপতি' রূপে সভাটির নানা কাজকর্মের সঙ্গে নিজেকে জড়িত না করে পারেন নি।[২২৩]

বাংলা দেশের অবস্থা এই সময়ে যে কিরূপ অগ্নিগর্ভ, তার প্রমাণ হিসেবে ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দের ৯ই মে তারিখের 'সাধারণী' পত্রিকায় 'প্রজাবিপ্লব' শীর্ষক রচনাটির উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রধানতঃ পাবনায় সম্প্রতি অনুষ্ঠিত কৃষক-বিদ্রোহকে উপলক্ষ করে লিখিত হলেও, সাধারণভাবে দেশের সচেতন জনমানসের ছাপ রচনাটিতে রয়ে গেছে—"পাবনার প্রজাপুঞ্জে প্রথমে যে পাবক প্রজ্বলিত করিয়াছিল, তাহা এখনও জ্বলিতেছে। কোথাও নিভিয়াছে, কোথাও জ্বলিতেছে।[২২৪] কোথাও এখনও আগুন ধরে নাই, ধূমোদ্গীরণ করিতেছে, ধূমে চারিদিক অন্ধকার করিয়া তুলিতেছে।...আমরা বিপ্লব প্রয়াসী, বিপ্লবই জগতের জীবন, সমাজের জীবন। শান্তিই মৃত্যু, শান্তিই নির্বাণ। এ নির্বাণ পদ চাই না, এ শান্তি চাই না। সুতরাং, আমরা বিপ্লব প্রয়াসী...।" এর ব্যঞ্জনা যত গভীরই হোক না কেন, সমসাময়িক কালের বাস্তব-পটভূমিকায় স্থাপন করলে দেখা যায় যে, শুধু বাংলা দেশেই নয়, ভারতবর্ষেও এত খোলাখুলি ভাবে বিপ্লবের আহ্বান তথা উদ্বোধন এই

প্রথম দেখা গেল। অবশ্য এর বছর পাঁচেক পূর্বেই, ১৮৬৯ খ্রীস্টাব্দের ৩রা জুন তারিখের সাপ্তাহিক বাংলা 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত 'কি কর্তব্য?' শীর্ষক পত্রে জনৈক পত্র লেখক 'বন্দুক ধর, যুদ্ধ কর, যুদ্ধ করিয়া ইংরেজ দিগকে তাড়াইয়া দাও' এই বলে আহ্বান জানিয়ে ছিলেন দেখতে পাই।[২২৫] এছাড়া, ১৮৭৪ খ্রীস্টাব্দে 'Hindoo Partiot' পত্রিকায় কৃষ্টদাস পাল ভারতে 'Home Rule' প্রবর্তনেরও দাবি জানিয়েছেন; প্রকাশাবধি 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় বঙ্কিমচন্দ্র সংগোপনে বিপ্লবের বীজই বপন করে আসছেন [সম্ভবত এই কারণে পত্রিকাটি কলকাতার সমাজে সর্বাধিক প্রিয় পত্রিকা হয়ে দাঁড়িয়েছে[২২৬]]। ঐ একই কাজ করে চলেছে যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের 'আর্য্যদর্শন' পত্রিকাও, এবং ইংরেজদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের ইঙ্গিতবহ হেমচন্দ্রের 'ভারতসঙ্গীত' কবিতার 'দেব আরাধনে ভারত উদ্ধার/ হবে না, হবে না— খোল্‌ তরবার; / এসব দৈত্য নহে তেমন'—অংশটি তখন কলকাতার ছাত্রদের মুখে মুখে ফিরতে শুরু করেছে—যা কট্টর সাম্রাজ্যবাদী বঙ্গেশ্বর ক্যাম্পবেল সাহেবের নিদারুণ অস্বস্তির কারণ হয় দাঁড়িয়েছে।[২২৮] এরূপ বিদ্রোহাত্মক কবিতা সমূহ তরুণমনে ধীরে ধীরে যে প্রবল ইংরেজ-বিদ্বেষ সৃষ্টি করছে, তা টের পেয়ে কিছুদিন পূর্বেই বঙ্গেশ্বর ক্যাম্পবেল সাহেব বঙ্গের তদানীন্তন শিক্ষা-অধিকর্তা ('Director of Public Instruction') মিঃ অ্যাটকিনসনকে (Mr. W. S. Atkinson) স্কুলে কবিতা পড়ানো বন্ধ করার নির্দেশ জারী করতে বলেছিলেন। নিরুপায় অ্যাটকিনসন সাহেবের অনুরোধ এড়াতে না পেরে কৃষ্টদাস পাল তাঁর 'Hindoo Patriot' পত্রিকায় 'Profane Ruler'-রূপী ক্যাম্পবেল সাহেবকে ব্যঙ্গের হুল ফুটিয়ে এই বদ মতলবের সাধ ঘুচিয়ে দিয়েছিলেন। ['The life of the Hon'ble Kristodas Pal Bahadur, C. I. E. Calcutta: 1886, by Ramgopal Sanyal, pp, 63-64.]

ইংরেজদের সুদীর্ঘ কালব্যাপী নানা অন্যায় ও অত্যাচারের ফলেই যে প্রধানতঃ এই সময়কার দেশীয় সংবাদপত্রগুলি নানা সংবাদ, মন্তব্য ও রচনাদি প্রকাশের দ্বারা দেশের লোকের মন শাসকজাতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করে তোলার চেষ্টা করছিল,[২২৯] এবং তা যে উচ্চপদস্থ শ্বেতাঙ্গ রাজ-পুরুষেরা টের পাচ্ছিলেন না, তা নয়। তবে, গরজ বড় বালাই, ভারতবর্ষ রূপী 'কামদুঘা'টিকে কষে দোহন করতে না পারলে তাদের অন্নে, তাদের

নবাবীতে, এবং তাদের বাড়বাড়ন্তে [পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান গ্রাস বা বিভিন্ন স্থানে কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্যে ক্রমাগত যুদ্ধ করা[২২৯ক] এবং সেই সব যুদ্ধের প্রচণ্ড ব্যয় ভারত থেকে উসুল করা) ভাটার টান দেখা দেবে। তাই এই মূল বিষয়টি সম্পর্কে তারা খুব সতর্ক থাকতো। কিন্তু কথায় বলে 'ধর্মের কল বাতাসে নড়ে'। তাই দেখা যায়, ১৮৭৮ সনের এপ্রিল মাসে দেশীয় সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করবার জন্যে Vernacular Press Act-টিকে [যা পরে 'Act XI of 1878' নামে পরিচিত হয়] Council-এ উত্থাপন করতে গিয়ে তদানীন্তন Law Member মহোদয় একটু ঘুরিয়ে নাক দেখাবার চেষ্টা করেছেন বটে, কিন্তু তিনি স্বজাতির অপকর্মগুলিকে ঢাকা দিতে পারেন নি।[২৩০]

এখন সাধারণ ভাবে ও সংক্ষেপে কলকাতার শিক্ষিত মানুষদের, বিশেষ ভাবে ছাত্রসমাজের এই সময়কার অবস্থা দেখে নেওয়া যেতে পারে। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন যে, তিন আইনের নূতন বিবাহবিধি প্রচলিত হবার সময় থেকে এবং ব্রাহ্ম সমাজের নানা অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণে "যুবকদলের উপর হইতে ব্রাহ্ম সমাজের শক্তি চলিয়া গেল যুবকদল যেন ব্রাহ্ম সমাজের দিকে পিঠ ফিরাইল এবং রাজনীতি ও জাতীয় উন্নতির দিকে মুখ ফিরাইল।"[২৩১] শুধু যে ব্রাহ্ম সমাজের শক্তি চলে গেল বলেই বাঙালী যুবকদল 'রাজনীতি ও জাতীয় উন্নতির দিকে' আকৃষ্ট হলো, তা নয়। প্রকৃতপক্ষে দীর্ঘকাল ধরে দেশে যে নানা ধরনের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া চলছিল (যা বক্ষ্যমান রচনায় দেখাবার চেষ্টা করা হয়েছে), তারই আঘাতে আঘাতে উদ্ভিন্ন-যৌবন ছাত্রদের সংবেদনশীল মন এক ধরনের হতাশা বা নৈরাশ্য বোধ,[২৩২] যাকে ইংরেজিতে 'frustration' বলা যেতে পারে, তারই সম্মুখীন হচ্ছিল। এবং সেই হতাশার কারণ যে সবটাই আধিভৌতিক ছিল তাও নয়, খানিকটা আধ্যাত্মিকও ছিল।

আধিভৌতিক বিষয়গুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, সেসময়ে ইংরেজরা শক্তির দম্ভে ও ঔদ্ধত্যে ভারতের সর্বত্র অত্যাচার ও অনাচারের স্রোত প্রবাহিত করে চলেছে,[২৩৩] নানা দিকেই কৃষক ও শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ তথা বিদ্রোহের ভাব দেখা দিচ্ছে, বারংবার দুর্ভিক্ষ দেখা দিচ্ছে, এবং নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে, বাঙালিদের উচ্চ শিক্ষার পথ রুদ্ধ করার চেষ্টা হচ্ছে, উচ্চ দায়িত্বপূর্ণ পদসমূহ থেকে সুপরিকল্পিত ভাবে

বাঙালী বিতাড়নের চেষ্টা চলছে, বাংলার বাইরের প্রদেশগুলিতেও বাঙালিদের চাকুরি দেওয়া বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদের চাকুরি দিতে পারা যাচ্ছে না এই অজুহাতে বাংলা সরকার কোনো কোনো প্রতি-যোগিতমূলক পরীক্ষা অনির্দিষ্টকালের জন্যে বন্ধ করে দিচ্ছে,[২৩৪] এইসব ঘটনা পরম্পরার সামগ্রিক ফলশ্রুতি সেকালের বুদ্ধিজীবী বঙ্গসন্তানদের মধ্যে যে কি নিদারুণ প্রতিক্রিয়া, তথা মানসিক বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছিল, তার প্রামাণ্যচিত্র প্রায় এই সময়ে রচিত যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের একটি রচনায় ফুটে উঠছে।[২৩৫] রচনাটিকে এই সময়কার বাঙালী জীবনের একটি দলিল বলা যায়। ইংরেজ শাসনে দেশে কিভাবে কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প ইত্যাদি অধঃপতিত এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে ও হচ্ছে, তার সবিশ্লেষণ বর্ণনার পরে লেখক লিখেছেন—"আমাদের একমাত্র আশা ছিল রাজকর্ম। কিন্তু লর্ড লীটনের বক্তৃতাও সেই চিরপালিত আশালতাকে সমূলে উন্মূলিত করিল। এক্ষণে আমরা করি কি, যাই বা কোথায়? আমরা প্রতি বৎসর বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে অসংখ্য ছাত্রকে প্রশংসাপত্র সহ বহির্গত হইতে দেখিতেছি। আমাদিগের প্রথমে ইহাতে বড়ই আনন্দবোধ হইত। কিন্তু এক্ষণে এই শোচনীয় দৃশ্যে আমাদিগের হৃদয় কাঁদিয়া উঠে। মনে কতই আশা, কতই উৎসাহ ছিল। তখন স্বদেশের 'এ করিব' 'ও করিব' বলিয়া…মনে কত প্রকার ইচ্ছা হইত, কিন্তু এক্ষণে —'উত্থায় হৃদি লীয়ন্তে দরিদ্রাণাং মনোরথাঃ"।

অব্যবহিত পূর্বে শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় রচিত মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী বাঙালী সমাজের নৈরাশ্য-প্রকাশক 'Where shall the Baboo go?' প্রবন্ধটির কথা এখানে মনে পড়া স্বাভাবিক। আবার ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'বান্ধব' পত্রিকার ১২৮২ সালের বৈশাখ (এপ্রিল-মে, ১৮৭৫) সংখ্যায় 'দেশের উন্নতি ও বিদ্যালোচনা' শীর্ষক দীর্ঘ (প্রায় ১০ পৃষ্ঠার) প্রবন্ধেও তৎকালীন শিক্ষিতসমাজের নৈরাশ্যের ছবিটি ধরা পড়েছে। অতীত ভারতের বিভিন্ন দিকের সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্যের পাশে সমকালীন শ্রীহীন, ঊষর ও নৈরাশ্য-পূর্ণ হতভাগ্য ভারতের তুলনামূলক আলোচনা—অবস্থা বৈগুণ্যে বিদেশীয় ইংরেজদের কাছে প্রকৃত শিক্ষিতদের অবহেলা ও অপমান ইত্যাদি বিষয়ের অবতারণার ফাঁকে ফাঁকে তৎকালীন বঙ্গদেশের প্রসঙ্গই বড় হয়ে উঠেছে। বর্তমানের বাঙ্গালীরা যে 'কেবল অবস্থার নিপীড়নে নিষ্পেষিত হইয়া ও দগ্ধ উদ্ভিজ্জের ন্যায় পত্রমুকুল-বিহীন অবস্থায়' পড়ে আছে, তা লেখক নানাবিধ

প্রমাণ সহযোগে দেখিয়েছেন। ইংরেজরা আরামপ্রদ উচ্চ বেতনের পদগুলি স্ব-জাতীয়দের জন্য সংরক্ষিত রেখে উচ্ছিষ্ট, অল্প বেতনের ও অধিক পরিশ্রম সাপেক্ষ পদগুলি এদেশীয়দের দেয় বটে, কিন্তু "সেই চাকরি পাওয়া প্রথমে যেমন উৎকট সাধনার কার্য, পাইলেও তাহা তেমনি মর্মান্তিক যন্ত্রণার কারণ" কি ভাবে হয়ে ওঠে, এটাও লেখক দেখিয়ে বলেছেন যে, উপরওয়ালা ইংরেজরা শিক্ষিত ও দেশীয় যুবকদের চাকরের মতো দেখে। সুতরাং আত্মসম্মান বিসর্জন না দিলে এক্ষণে চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। এহেন পরিস্থিতিতে 'সুশিক্ষিত লোকদিগের এইক্ষণে স্বভাবতঃই নিরাশার ভাব প্রবল হইয়া উঠে। তাঁহারা অভিমান ও লজ্জায় মনের সমুদয় তেজ ও স্ফূর্তিতে বঞ্চিত হইয়া পড়েন। বিদ্যার প্রতি তাঁহাদিগের যারপর নাই অনাদর ও অশ্রদ্ধা জন্মে।...বিদেশীয় বিদ্যায় ব্যুৎপন্ন বি.এ., এম.এ. উপাধিধারী কৃতবিদ্য যুবকদের অতৃপ্ত বাসনা-সম্ভূত চিরবিরস বদন দেখিয়া কাহার না হৃদয় বিদীর্ণ হয় ?"

প্রদীপের নীচের অন্ধকারের মতো সামাজিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক আন্দোলনাদিতে আলোড়িত কলকাতার জনজীবনের এই সময়কার অন্ধকার দিকটি সম্পর্কেও আমরা নানাসূত্র থেকে কিছু সংবাদ পেয়ে থাকি। রাজস্ব বৃদ্ধি করবার জন্যে ইংরেজ সরকার দেশীয়দের মদ্যপানাসক্তিকে যেভাবে উৎসাহ দিতে শুরু করে, তার ফলে 'বঙ্গীয় ভদ্র সমাজে সুরার উত্তরোত্তর পরিবর্ধিত প্রতিপত্তি ও বিষময় ফল অহরহঃ লক্ষ্য' করে মহাপ্রাণ প্যারীচরণ সরকার ১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দের ১৫ নভেম্বর 'The Bengal Temperance Society' স্থাপন করেন, যার সঙ্গে সেকালের সর্বধর্মের বিখ্যাত ব্যক্তিরাও সহযোগিতা করেছিলেন।[২৩৬] ১৮৭০ খ্রীস্টাব্দে ইংল্যাণ্ডের মাটিতে দাঁড়িয়ে কেশবচন্দ্র সেন ইংরেজদের রাজস্ব বৃদ্ধির এই জঘন্য পথকে তীব্রভাবে আক্রমণ করে ভারতে ইংরেজ শাসনের পতন পর্যন্ত কামনা করে এসেছেন (পূর্বে উদ্ধৃত হয়েছে), এবং কলকাতায় ফিরে 'ভারত সংস্কারকসভা' স্থাপন করে তার পাঁচটি কর্মধারার মধ্যে সুরাপান নিবারণের জন্যে সচেষ্ট হয়েছিলেন, কিন্তু এসব সত্ত্বেও ছাত্রদের মধ্যে মদ্যপানাসক্তি কমে নি, বরং গোপনে গোপনে তা বৃদ্ধিই পেয়েছিল।

আবার, ১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দ থেকে 'বেঙ্গল থিয়েটার' নাটককে স্বাভাবিক করে তোলবার জন্যে, নাটকের নারী-চরিত্রগুলি পুরুষের বদলে 'সমাজ

পরিত্যক্ত ধর্মভ্রষ্টা স্ত্রীলোক দিগের দ্বারা' অভিনয় করাতে শুরু করে।[১৩৭] এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে মনোমোহন বসু তাঁর 'মধ্যস্থ' পত্রিকার ১২৮০ সালের ১৪ই ভাদ্র সংখ্যায় লিখলেন—"এতদিন বারাঙ্গনাগণ প্রকাশ্যরূপে ভদ্রলোকের সঙ্গে ভদ্রসমাজে সমানাধিকার প্রাপ্ত হইল।" এই সমানাধিকার পাওয়ার ফল যে আদৌ শুভকর হলোনা, তা কয়েকদিন পরেই '*The Indian Mirror*' পত্রিকার ১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বরের সংখ্যায় প্রকাশিত জনৈক অজ্ঞাত-নামা ব্যক্তির পত্র থেকে জানা যায়।[১৩৮] প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮) বা কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'র (১৮৬১-৬২) মধ্যে কলকাতার ভদ্রপল্লীতে বেশ্যালয়ের অবস্থিতির কথা জানা যায় বটে, তবে আলোচ্য সময় থেকেই প্রকৃতপক্ষে জনসমাজে পতিতা নারীদের বাড়বাড়ন্ত শুরু হয়, ভদ্র-পল্লীর আশে-পাশে ব্যাঙের ছাতার মতো বেশ্যালয় গজিয়ে উঠতে শুরু করে।

১৭৯৪ শকের ১১ই চৈত্র (ইংরেজি ২৩ মার্চ ১৮৭৩), রবিবার, 'জাতীয় সভা'য় রাজনারায়ণ বসু যে বক্তৃতা করেন, যা ১৮৭৪ খ্রীস্টাব্দে 'সেকাল আর একাল' গ্রন্থ নামে প্রকাশিত হয়, সেখানে ঠিক এই সময়ের মানুষের মদ্যপানাসক্তি ও বেশ্যাসক্তির প্রমাণ পাওয়া যায়,—"এক্ষণকার লোক পানাসক্ত ও পূর্বাপেক্ষা অধিকতর বেশ্যাসক্ত।...যেমন পানদোষ বৃদ্ধি পাইতেছে, তেমনি বেশ্যাগমনও বৃদ্ধি হইতেছে। সেকালে লোকে প্রকাশ্যরূপে বেশ্যা রাখিত। বেশ্যা রাখা বাবুগিরির অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হইত, এক্ষণে তাহা প্রচ্ছন্নভাব ধারণ করিয়াছে, কিন্তু সেই প্রচ্ছন্নভাবে তাহা বিলক্ষণ বৃদ্ধি পাইতেছে। বেশ্যাগমন বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহার প্রমাণ বেশ্যা সংখ্যার বৃদ্ধি।...এমনকি, স্কুলের বালকদিগের মধ্যেও এই পাপ প্রবলাকার ধারণ করিয়াছে...।" (পৃ. ৭৭-৭৮) ঘরে বাইরে তখন বেশ্যাদের উপস্থিতি কি হারে বেড়েছে, তার আর একটা প্রমাণ হলো, প্রতি বৎসর ১লা জানুয়ারি বেলভেডিয়ারে 'Fancy Fair' নামে যে মেলা বসতো, তাতে নাচের আসরে নৃত্যশিল্পী হিসাবে বেশ্যাদের ছিল অবাধ আধিপত্য। এই ব্যবস্থার কড়া সমালোচনা করে ছোটলাট বাহাদুর এবং মেলার কর্তৃপক্ষের কাছে কোনো কোনো পত্রিকা মেলায় বেশ্যাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করণের জন্যে আবেদন জানিয়েছে।[১৩৯]

গোদের ওপর বিষফোড়ার মতো এই সময়ে কলকাতার পথে-ঘাটে নগ্ন-

চিত্র ও কুৎসিত যৌনবিকৃতিমূলক গ্রন্থাদি প্রকাশ্যভাবে বিক্রয়ার্থে মজুত হচ্ছিল। এগুলি যথা সময়ে বাঙালী পরিবারের অন্তঃপুরেও ক্রমবর্ধমান হারে অনুপ্রবেশ করতে থাকে। ১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দের ৭ই সেপটেম্বর তারিখের '*The Indian Mirror*' পত্রিকা 'The week' অংশে এ-বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে শিক্ষিত সম্প্রদায়কে প্রশ্ন করেছে— "Are we to believe that the educated Natives of Bengal are possessed of such vitiated tastes and are so indifferent to social and domestic morality as to connive at the spread of obsene literature among their male and female relatives? Will they allow the public to say that they are themselves fond of filthy books and do not wish to prevent their wives and children from reading and enjoying them?"

বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে শীঘ্র তার প্রতিবিধানে অগ্রসর হবার জন্যে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাছে পত্রিকাটি আবেদন জানায়। ফলে কলকাতার সব-ধর্মের সমাজ-সচেতন ব্যক্তিরা (যেমন কেশবচন্দ্র সেন, কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, সৈয়দ আমীর আলি, James Wilson, Rev. K.S. Macdonald প্রভৃতি) সেপটেম্বর মাসেই 'Society for the Suppression of Public Obsenity in India' নামে একটি সমিতি গঠন করেন। সমিতির সভাপতি এবং সম্পাদক রূপে মনোনীত হন যথাক্রমে রাজা কালীকৃষ্ণ দেব-বাহাদুর এবং রেভারেণ্ড এম. সি. ঘোষ। সমাজদেহের এই দুষ্ট ক্ষত নিরাময়ের পক্ষে কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্যে সমিতি প্রথমাবধি সচেষ্ট হয়।[২৪০]

সমাজদেহে ইতিমধ্যে অনুপ্রবিষ্ট বিষ তখন নানাভাবেই আত্মপ্রকাশ করছে— কুৎসিত গান ও অঙ্গভঙ্গি সহকারে 'সঙ্'-এর কলকাতার পথ-পরিক্রমায় যেমন তার একটা রূপ প্রকাশ পাচ্ছে, তেমনি একটু ভিন্ন প্রেক্ষিতে তারকেশ্বরের মোহন্ত মাধবগিরি ও অসহায়া গ্রাম্য কিশোরী এলোকেশীর ব্যভিচারের মধ্যে তার আর একটা রূপ ধরা পড়ছে। ১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দের মাঝামাঝি সংঘটিত এই ঘটনাটি সেকালের জনসমাজে বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এলোকেশীর হত্যাকারী স্বামী নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লোক-চক্ষে প্রায় 'hero' হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তাকে রক্ষার জন্যে রীতিমতো চাঁদা তোলা হয়েছিল এবং বেশ কয়েক বছর ঘটনাটি বাঙালী সমাজের মুখরোচক

-আলোচনার বিষয়বস্তু হয়েছিল। এই সময়কালের মধ্যে বহু নাটক, প্রহসন ইত্যাদি রচিত হয়েছে, 'মোহন্ত টপ্পা' নামে গানের বই বেরিয়েছে, কালীঘাটের পটুয়াদের অসংখ্য পট চিত্রিত হয়েছে, শহরের রাস্তায় ছেলে-ছোকরারা অনেক ছড়া কেটেছে।[২৪১]

প্রকৃত পক্ষে বাঙালী সমাজের একধরনের কুৎসিত অবদমিত যৌনাকাঙ্ক্ষা (যাকে নীরদচন্দ্র চৌধুরী তাঁর 'বাঙালী জীবনে রমণী' (২য় মুদ্রণ, ১৩৭৬) গ্রন্থে 'চোরা লোচ্চামী' বলেছেন পৃ. ৪৪), মোহন্ত এলোকেশী ঘটনাকে ঘিরে পরোক্ষভাবে তৃপ্ত হবার সুযোগ পেয়েছিল বলেই বহুদিন ধরে কাহিনীটি নিয়ে রচিত নাটক, প্রহসন, ছড়া ইত্যাদি এত জনপ্রিয় হয়ে থাকতে পেরেছিল (একালের বাস্তবতার নামে বহু উপন্যাস-ছোটগল্পে নরনারীর যৌন সম্পর্ককে যতদূর সম্ভব অনাবৃত ভাবে দেখিয়ে জনপ্রিয় করে তোলার পিছনে এই মনোবৃত্তিই কাজ করছে দেখা যায়)। ১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দে 'সেকাল আরএকাল' সম্বন্ধীয় বক্তৃতায় রাজনারায়ণ বসু বলেছেন—"এক্ষণে প্রতারণা অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে' (পৃ ৭৯), শুধু প্রতারণা নয়, জুয়াখেলা, চুরি-ডাকাতি-ছিনতাই প্রভৃতিও এই সময়ে খুব বৃদ্ধি পেয়েছিল, এমনকি শহরগুলি অঞ্চলেও তা ছড়িয়ে পড়ছিল[২৪২] এই সময়ে বাঙালীদের চিরন্তন কলহ-প্রবণতা কি পরিমাণে বেড়েছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৮৭২-৭৩ সনে Calcutta Small Cause Court-এ রুজু করা প্রায় ৩৫ হাজার মামলার সংখ্যা থেকে।[২৪৩] শিক্ষিত সমাজে আলোড়ন সৃষ্টিকারী 'ভারত আশ্রম' সংক্রান্ত মানহানি মামলা প্রায় বৎসর দেড়েক চলবার পরে ১৮৭৫ জুন মাসে আপোষে মিটমাট হলেও, তার ফল হয়েছিল সুদূরপ্রসারী এবং শেষ পর্যন্ত ১৮৭৮ সনে কুচবিহার বিবাহ সংক্রান্ত ঘটনায় কেশবচন্দ্র সেনের ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের দ্বিধাবিভক্তিতে তার সমাপ্তি।

১৮৭৩ সনে তৎকালীন বাঙালী সমাজের সার্বিক অবস্থা আলোচনা প্রসঙ্গে রাজনারায়ণ বসু বলেছেন, "চরিত্র বিষয়ে দেশস্থ লোকের অবনতির কারণ তাহাদিগের ধর্মবিষয়ে অবনতি......এক্ষণে এই দেশে কেবল ধর্মোদাসীনের দল,—কেবল ধর্মশূন্য লোকের দল......।"[২৪৪] -শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকে দেশে যে প্রবল যুক্তিবাদের চর্চা শুরু হয়েছিল, তা প্রগতিশীল ব্রাহ্ম ধর্মান্দোলনের বিশেষ আশ্রয়ে ও প্রশ্রয়ে এতদিন পুষ্ট -হবার অবকাশ পেয়েছিল। এখন ব্রাহ্মসমাজে নরপূজার আবির্ভাব, অন্ধ-

বিরোধ, রাজনীতি সম্পর্কে অনীহা ইত্যাদি কারণে সেই ব্রাহ্ম-ধর্মান্দোলনে ভাটার টান শুরু হয়েছে, এমনকি ব্রাহ্মধর্ম যুবকদের ধর্ম ও নীতিহীন করছে এমন অভিযোগ পর্য্যন্ত উঠতে সুরু হয়েছে।[২৪৫] তাছাড়া শুষ্ক নিরাকার পরমব্রহ্মের উপাসনার সঙ্গে বাংলার চিরাগত ভক্তিভাবের যোগমাত্র না থাকায় তা যে কতদূর অন্তঃসারশূন্য এবং তা যে কোন নির্দিষ্টলক্ষ্যে পৌছিয়ে দিতে পারবে না, এটা তিন-আইনের বিবাহ প্রবর্তন আন্দোলন থেকেই স্পষ্টভাবে ধরা পড়ছিল। এই সময়ে এদেশীয় যুবকদের উচ্চশিক্ষার পাঠ্য তালিকায় এমন কোন কোন বিষয়ে অন্তর্ভুক্ত ছিল, যা ছাত্রদেব মধ্যে বৈপ্লবিক চিন্তা ও নাস্তিকতার পথ প্রশস্ত করেছিল বলে কিছু পবের কোন কোন সংবাদপত্রকে মন্তব্য করতে দেখা যায়।[২৪৬] সামাজিক জীবনের নানা অরুচিকর ও অনভিপ্রেত ঘটনা, দৃশ্য, সঙ্গীত, ব্যক্তিজীবনেব নানাভীতি, বিভ্রান্তি, অনিশ্চয়তা— সব মিলিয়ে সত্তরের দশকের মাঝামাঝি সময়ে শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবকদের মধ্যে, শুধু রাজনারায়ণ বসু-প্রোক্ত ধর্মহীনতাই নয়, এক ধরণের সংশয়বাদ তথা অজ্ঞেয়বাদ প্রাধান্য লাভ করতে থাকে। বিষয়টি সম্পর্কে ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দে শ্রীহট্ট থেকে কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়তে আসা ছাত্র বিপিনচন্দ্র পাল তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন—"Scepticiom and materialism were the loudest notes in the intellectual life of young Bengal. Hume and Spencer and Comte were, more or less, the leaders of thought of the new English-educated classes of the province.''[২৪৭] শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম ভক্ত-শিষ্য দুর্গাচরণ নাগ (১৮৪৬-১৮৯৯), যিনি 'নাগমহাশয়' নামেই সমধিক পরিচিত, তাঁর জীবনচরিতে দেখা যায় কিভাবে আলোচ্য সময়কালে তাঁর 'কয়েকটি বন্ধু নাস্তিক মতের পুস্তকাদি পাঠ করিয়া, নানা-ভাবে নাস্তিক মত প্রচার করিতেন।''[১৪৮] বিপিনচন্দ্র পাল-প্রদত্ত তথ্য এবং 'সাধু নাগমহাশয়ে'র জীবনীতে প্রাপ্ত মন্তব্যের যাথার্থ্য ওই কালের এমন বহু যুবকের জীবন-কাহিনী থেকে পাওয়া যায়, যাঁরা পরবর্তী কালে কোন-না-কোন দিক দিয়ে বাঙ্গালী সমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন। এরূপ একজন বিশেষ খ্যাত্যাপন্ন ব্যক্তি হিসাবে প্রথমেই নাম করা যায় বিপিনচন্দ্রের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে কলকাতায় পড়তে আসা তাঁর সহপাঠী তারাকিশোর চৌধুরীর (১৮৫৯-১৯৩৫), যিনি পরবর্তী কালে 'ব্রজবিদেহী সন্তদাস বাবাজী'

রূপে সমধিক পরিচিত হয়েছিলেন। তারাকিশোর প্রথম যৌবনে নাস্তিক হয়ে পড়েছিলেন।[২৪৯] শ্রীরামকৃষ্ণের অপর বিখ্যাত শিষ্য রামচন্দ্র দত্ত (১৮৫১-১৮৯৮) স্বয়ং তাঁর গ্রন্থে স্বীকার করেছেন, 'আমরা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতাম না'।[২৫০] আর তালিকা বৃদ্ধির প্রয়োজন দেখি না, তবে প্রসঙ্গতঃ এই সময়কালের আরো দুচারজন বয়োজ্যেষ্ঠ বাঙ্গালীবুদ্ধিজীবীর নাম মনে পড়ে, সম্ভবতঃ যাঁরাও যুগের হাওয়া এড়াতে পারেননি।[২৫১]

যাই হোক, আমরা মোটামুটি বিস্তৃত পটভূমিকায় সে সময়কার সামাজিক, রাষ্ট্রিক, আর্থনীতিক, এককথায় যে সার্বিক আবহাওয়ার পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করেছি, তা থেকে সেকালের সংবেদনশীল যুবচিত্তের সাধারণ প্রবণতা বুঝতে যেমন অসুবিধা হয় না, তেমনি সে চিত্ত কোনদিকে যে ঝুঁকে পড়তে পারে, তার শুধু সম্ভাব্য নয়, অনিবার্য পথরেখারও ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বিশেষতঃ যখন 'Agnosticism'-এর সঙ্গে 'Anarchism'-এর সম্পর্ক খুব দূরবর্তী নয়[২৫২], তখন সেখানে প্রথম স্তর থেকে দ্বিতীয় স্তরে (যদিও সেরকম অবস্থা দেশে তখনো গড়ে ওঠেনি এবং যা গড়ে উঠতে আরো প্রায় ৩০ বৎসর সময় লেগেছিল) উত্তীর্ণ হবার উপযোগী আর নূতন কি কি প্রবর্তনা (impetus) সেদিন ছাত্রেরা বাইরে থেকে পেয়েছিল, অতঃপর তা দেখার চেষ্টা করা যেতে পারে।

ইংল্যাণ্ডে গিয়ে বহু চেষ্টা করেও I.C.S. পদচ্যুত সুরেন্দ্রনাথ শেষ-পর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসের তৃতীয় সপ্তাহে[২৫৩] কলকাতায় ফিরে আসেন। বিলাতের কর্তৃপক্ষ তাঁকে চাকুরিতে পুন-র্নিয়োগ তো করলোই না, পরন্তু তাঁকে ব্যারিস্টারি করবার সুযোগ থেকেও বঞ্চিত করলো। সুরেন্দ্রনাথকে একই সঙ্গে হাতে ও ভাতে মারবার 'এই বর্বরোচিত ব্যবহার রাজক্ষমতার নিরাপদ অন্তরালে থেকে স্বৈরাচারী শাসকদের অকুণ্ঠচিত্তে এইরূপ লাঞ্ছনা ও অপমান বর্ষণ ভারতবাসীকে রোষে ও ক্ষোভে উন্মত্ত করে তুললো। ব্রিটিশ শাসকবর্গের ন্যায়পরায়ণ-তার উপর বাঙ্গালার শিক্ষিত জনগণের বিশ্বাস টলতে লাগল তখন।'[২৫৪] জীবিকার্জনের কোন আশু পথ দেখতে না পেয়ে কলকাতায় ফেরার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সুরেন্দ্রনাথ রাজনীতিচর্চা শুরু করে দিলেন[২৫৫], এবং মেডিক্যাল কলেজের থিয়েটার হলে আয়োজিত মদ্যপান নিবারণী সভায় প্রথম বক্তৃতা দ্বারাই তিনি বক্তারূপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলেন।[২৫৬] অতঃপর

১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে তিনি পিতৃবন্ধু বিদ্যাসাগরের মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশনে দুই শত টাকা বেতনে ইংরেজির অধ্যাপক-রূপে যোগদান করলেন।[২৫৭] সুরেন্দ্রনাথের অসাধারণ বাগ্মিতা এবং ছাত্র-সমাজে তাঁর ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা দেখে আনন্দমোহন বসু তাঁর সদ্য-প্রতিষ্ঠিত 'Students' Association'-এর সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথকে যুক্ত করে নিলেন।[২৫৮] মাত্র মাস দুই-তিন পূর্বে দেহে-মনে বিধ্বস্ত, বিলাত-প্রত্যাগত সুরেন্দ্রনাথ নিদারুণ নৈরাশ্যের মধ্যেও দেশের মঙ্গলের জন্যে কিছু করার কথা ভেবেছিলেন। ('**To do some useful work for the country**',—'*A nation in making*' 1925, p. 34) এখন পৃথক দুটি ক্ষেত্রে এইভাবে ছাত্রদের নিকটতর সান্নিধ্যে আসার সুযোগ পেয়ে তিনি যে 'প্রথমাবধি' 'তরুণদের হৃদয়ে দেশ-সেবা ও দেশাত্মবোধের হোমাগ্নি প্রজ্বলিত'[২৫৯] করার প্রয়াসের মধ্যে সে চিন্তা বা ইচ্ছাকে রূপায়িত করতে মনপ্রাণ সমর্পণ করবেন, এ তো খুবই স্বাভাবিক। বিশেষতঃ যখন দেশ-সেবা অর্থাৎ রাজনীতি-চর্চা এবং শিক্ষকতাকে তিনি দুটি পৃথক ব্যাপার বলে মনে করতেন না।[২৬০] ইতিপূর্বে বিলাতে অবস্থান কালে বন্ধুবর আনন্দমোহন বসুর সাহচর্যে ইতালীর স্বাধীনতা সংগ্রামে ম্যাট্‌সিনির অবদান সম্পর্কে তিনি অবহিত হয়েছিলেন।[২৬১] আয়ারল্যাণ্ডের মুক্তি সংগ্রাম সম্পর্কেও তিনি এই সময়েই ওয়াকিবহাল হয়েছিলেন বলে মনে হয়।[২৬২] খণ্ড বিচ্ছিন্ন, পর-পদানত ইতালীকে সংঘবদ্ধ ও স্বাধীন করার স্বপ্ন নিয়ে ম্যাট্‌সিনি[২৬৩] দেশের তরুণসম্প্রদায়কে যেভাবে গড়ে তুলেছিলেন, তৎকালে বৃটিশ শাসনাধীন খণ্ড-বিচ্ছিন্ন ভারতবর্ষে দেশ-সেবার পন্থা হিসাবে ম্যাট্‌সিনি প্রদর্শিত কর্মধারাই যে আদর্শ হওয়া উচিত, এটা সুরেন্দ্রনাথ একান্তভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ নিজেকে ম্যাট্‌সিনির প্রায় মন্ত্র শিষ্য বলেই মনে করতেন।[২৬৪] তবে ম্যাট্‌সিনি বিপ্লবের পথে অগ্রসর হবার জন্য স্বদেশীয় যুবকদের যে অগ্নিগর্ভ উপদেশগুলি দিয়েছিলেন, সেগুলি ঐ সময়কার বাংলা দেশের সামাজিক, মানসিক, ধর্মীয় অর্থাৎ সামগ্রিক আবহাওয়ার উপযোগী ছিল না মনে করে[২৬৫] সুরেন্দ্রনাথ তাঁর ছাত্রদের সামনে ম্যাট্‌সিনির অতুলনীয় দেশাত্মবোধ, আত্মত্যাগ ও মানব-হিতৈষণার দিকগুলি দিনের পর দিন অপূর্ব নৈপুণ্যের সঙ্গে তুলে ধরতে লাগলেন। এবং এইভাবে তিনি '**soon populrised Mazzini among the youngmen of Bengal.**'।[২৬৬]

১২৮১ বৈশাখ (এপ্রিল ১৮৭৪) মাস থেকে প্রকাশিত 'আর্য্যদর্শন' মাসিক পত্রিকায় সম্পাদক যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ প্রথমাবধি দেশবাসীকে স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে তোলার চেষ্টা শুরু করেছিলেন। (সুরেন্দ্রনাথের কলকাতা প্রত্যাবর্তনের পূর্বে প্রকাশিত সংখ্যাগুলিতে স্থান-প্রাপ্ত রচনাগুলি তার প্রমাণ)। সম্ভবতঃ সুরেন্দ্রনাথের অনুরোধে[২৬৭] যোগেন্দ্রনাথ এই পত্রিকায় ১২৮২ সালের ভাদ্র (১৮৭৫ আগস্ট) সংখ্যা থেকে 'জোসেফ ম্যাট্‌সিনি ও নব্য ইতালী' (পরবর্তী সংখ্যাগুলিতে 'যোসেফ' শব্দটি বর্জিত হয়েছে) প্রায় ধারাবাহিক ভাবে (কেননা কোন কোন সংখ্যায় রচনাটি প্রকাশিত হয়নি) প্রকাশিত হতে শুরু করে। নব্য ইতালীর স্বাধীনতা-সংগ্রামের পুরোধা পুরুষ ম্যাট্‌সিনির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অন্যতম শিষ্য গ্যারিবল্ডীর[২৬৮] অতুলনীয় শৌর্যবীর্য, অপরিসীম দেশপ্রেম ও অলৌকিক আত্মত্যাগের আশ্চর্য কাহিনীও ক্রমে কলকাতার ছাত্রদের কাছে বিশেষ আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে।

জেলায় জেলায় 'District Association' গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে শিশিরকুমার ঘোষ কলকাতায় এ সকলের সংযোগরক্ষাকারী একটি কেন্দ্রীয় সমিতি স্থাপন করার বিষয়ে অনেক দিন ধরেই চিন্তা ও চেষ্টা শুরু করেছিলেন।[২৬৯] এ দিকে 'Students' Association'-এর সাফল্যে উৎসাহিত আনন্দমোহন বসুও তখন পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কলকাতায় অনুরূপ একটি সমিতি গঠন বিষয় জল্পনা-কল্পনা করছিলেন। অচিরে শিশিরকুমার ঘোষ, ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষ প্রভৃতি আনন্দমোহনের এই পরিকল্পনায় যোগ দেন। আনন্দমোহন প্রভৃতির প্রথমে ধারণা ছিল অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী 'British Indian Association' দ্বারাই এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। কিন্তু এই সংস্থাটি শেষাবধি যে এবিষয়ে অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করলো না, তার প্রধান কারণ হলো তার অভিজাত্য বোধ— সাধারণ মানুষকে সভ্যরূপে গ্রহণ করে সংস্থাটি তার আভিজাত্য ক্ষুণ্ণ করতে রাজি হলো না। এই অবস্থায় শিশিরকুমার 'British Indian Association-কে যেন খানিকটা 'চ্যালেঞ্জ' জানিয়েই ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দের ২৫ শে সেপটেম্বর কলকাতায় 'The Indian League' নামে একটি কেন্দ্রীয় সমিতির পত্তন করলেন।[২৭০] যে রকম ভড়িঘড়িতে, এবং খানিকটা টেক্কা মারবার মতলবে[২৭১] শিশিরকুমার 'The Indian League'-এর উদ্বোধন করলেন[২৭২], তাতে আনন্দমোহন মনঃক্ষুণ্ণ হলেও সদ্য-প্রতিষ্ঠিত সমিতিটির

সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করতে কসুর করেন নি।

৩৮ জন সভ্য নিয়ে গঠিত 'Indian League'-এর কার্যকরী সমিতির সভাপতি হলেন সাংবাদিক শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং সম্পাদক হলেন হাইকোর্টের উকিল কালীমোহন দাস। দু'জন সহকারি সম্পাদক হলেন যোগেশচন্দ্র দত্ত এবং শিশিবকুমার ঘোষ। সমিতির সদস্যদের মধ্যে ছিলেন আনন্দমোহন বসু, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্নদাপ্রসাদ রায়, ভৈরবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ সেন, মনোমোহন বসু, নবগোপাল মিত্র, রেভারেণ্ড কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। দেশে কিভাবে ও কি হারে যে রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি পাচ্ছে, সে সম্পর্কে উল্লেখ করতে গিয়ে, ৩০ শে সেপটেম্বরের অমৃতবাজারে শিশিরকুমার লিখলেন,—ধর্ম ছিল এতকাল ভারতীয়দের ঐক্য-সূত্র, কিন্তু বর্তমানে ধর্মের বন্ধন ছাড়া সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের যে এক ঐক্য-সূত্রে ভারতের বিভিন্ন ধর্মের এবং বিভিন্ন প্রদেশের মানুষ পরস্পরের সঙ্গে গ্রথিত হতে শুরু করেছে, তাহল জাতীয় তথা রাজনৈতিক ঐক্য-সূত্র।[২৭৩] এই ঐক্য-সূত্রটিকে মজবুত করে গড়ে তোলাই ছিল লীগের মূল উদ্দেশ্য। সমকালীন 'The Englishman' পত্রিকা স্বীকার করেছিল যে, The Indian League-এর প্রতিষ্ঠা হলো 'the first marked sign of the awakening of the people on this side of India to political life'[২৭৪] বস্তুতঃ 'লীগ প্রতিষ্ঠা অবধি বাংলা দেশে রাজনৈতিক ও অন্যবিধ প্রচেষ্টারও বিশেষ সাড়া পড়িয়া যায়'[২৭৫] লীগ-এর এক বৎসর আয়ুষ্কাল পূর্ণ হবার মুখে, তার সাংবাৎসরিক সাফল্যের খতিয়ান করতে গিয়ে ১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দের ২১ সেপটেম্বর তারিখের অমৃত বাজার পত্রিকা খুব গর্ব ও উৎসাহের সঙ্গে একথার উল্লেখ করেছিল।[২৭৬]

হিন্দুধর্ম-পুনরুত্থান আন্দোলন, যা উনিশ শতকের আশির দশকে সমস্ত দেশকে অভূতপূর্ব উন্মাদনায় উত্তাল করে তুলেছিল, আলোচ্য সময়টিকে তার প্রাতঃ-সন্ধ্যাকাল বলা যেতে পারে। সত্তরের দশকের প্রথম দিকেই এই আন্দোলনের দু'জন প্রধান প্রবক্তা, শশধর তর্কচূড়ামণি (১৮৫১-১৯২৮) এবং কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন (১৮৪৯-১৯০২, পরবর্তী কালে "স্বামী কৃষ্ণানন্দ" নামে সমধিক পরিচিত) কলকাতা থেকে দূরবর্তী মুঙ্গেরে পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন এবং তাঁদের বক্তব্যকে বৃহত্তর জনসমাজে উপস্থিত করার উপ-যোগী ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে 'সুনীতি সঞ্চারিণী সভা', 'বাল্যাশ্রম' ইত্যাদি

প্রতিষ্ঠার মধ্যে প্রাথমিক কাজও শুরু করেছেন।[২৭৭] 'আর্যধর্ম' প্রচারক স্বামী দয়ানন্দ (১৮২৪-৮৩) ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দের শেষদিকে মাস তিনেকের জন্যে কলকাতায় স্বীয় মতবাদ প্রচারার্থে এসেছিলেন।[২৭৮] এসব পরবর্তী কালের ঐ প্রবল আন্দোলনের প্রস্তুতিমাত্র—কলকাতার শিক্ষিত জন-মানসে তখনো এসব আদৌ কোনো ছায়াপাত করতে পারেনি। কিন্তু নানা কারণে অতিক্রত পরিবর্তমান কলকাতার শিক্ষিত-মানসে ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে এই ধূমায়মান আন্দোলনের প্রথম ঢেউ এসে লাগলো। ঘটনাটি আপাতদৃষ্টিতে ক্ষুদ্র হলেও অনতিপরের ইতিহাসের প্রেক্ষিতে খুবই ফলিতার্থময়। ইংরেজদের সুদীর্ঘকাল-ব্যাপী অনাচার, অত্যাচার, শোষণ বাঙ্গালীকে ইংরেজদের সদিচ্ছা সম্পর্কে অনেকটা নির্মোহ করে তুললেও, সাধারণ ভাবে শ্বেতাঙ্গদের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে এক ধরনের ভয়মিশ্রিত হীনমন্য-ভাব (inferiority complex) তখনো কাটিয়ে উঠতে পারেনি। এরই অনেকটা প্রতিষেধক-রূপে জাতির অন্তরে একটা শ্রেষ্ঠত্বাভিমান (superiority complex) জাগিয়ে তুলতে হিন্দুধর্ম পুনরু-জ্জীবন আন্দোলনের প্রবক্তারা আশির দশকে অনেক যুক্তিতর্ক, উদাহরণ, বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ইত্যাদির অবতারণা করেছিলেন, (যার অনেকটা অংশই ছিল অযৌক্তিক, অন্তঃসার-শূন্য ও অবৈজ্ঞানিক, যে কারণে বঙ্কিমচন্দ্র অতিক্রত এই আন্দোলন থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করেছিলেন এবং যা রবীন্দ্রনাথের কতকগুলি রচনায় ব্যঙ্গ ও উপহাসের উৎস হয়েছিল, যা সেকালের সাধারণ মানুষকে ভাবাবেগে আপ্লুত করে দেশময় এমন একটা প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল যে তার রেশ শতাব্দীর শেষ দশকেও সম্পূর্ণরূপে মিলিয়ে যায়নি।[২৭৯]

কলকাতার শিক্ষিত সমাজে এই আন্দোলনেরই মুখপাত হলো ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে। প্রগতিশীল ব্রাহ্ম-ধর্মান্দোলনের অগ্রগতি মন্দীভূত হবার মুখে হিন্দুধর্ম-পুনরুজ্জীবন আন্দোলনের বৈতালিক রূপে কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন কলকাতার অ্যালবার্ট হলে 'ভারতের মূর্ছাভঙ্গ' নামক তাৎপর্যপূর্ণ একটি বক্তৃতা করলেন। কলকাতায় কৃষ্ণপ্রসন্নের এটি প্রথম বক্তৃতা এবং এই বক্তৃতায় ইংল্যাণ্ড বা ইউরোপ অপেক্ষা ভারতবর্ষ যে নানাদিক দিয়েই শ্রেষ্ঠ, তা তিনি প্রভূত উদাহরণ দিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করলেন। এই বক্তৃতাটির সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে প্রদত্ত কৃষ্ণপ্রসন্নের আরো ৪টি বক্তৃতা ['ভারতে-

ধর্মপ্রচার', 'ভারতে আর্যভাব', 'ভারতে উৎসব' ও 'অন্ধের যষ্টি'] একত্রিত হয়ে ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে (১৮১৬ শকাব্দ) 'পরিব্রাজকের বক্তৃতা' নামক সংকলন গ্রন্থটি 'আনন্দমণ্ডলী কর্তৃক প্রকাশিত' হয়। গ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধ 'ভারতের মূর্ছাভঙ্গে'র পাদটীকায় লিখিত আছে, 'কলিকাতা আলবার্ট হলে' শকাব্দা ১৭৯৭ পৌষ মাসে, পরিব্রাজক মহাশয় এই সু-সারময়ী বক্তৃতাটী করিয়াছিলেন। কলিকাতা রাজধানীতে এই তাঁহার প্রথম বক্তৃতা। এই বক্তৃতা শুনিবার জন্য 'আলবার্ট হল' অতিশয় লোকাকীর্ণ হইয়াছিল। গৃহে স্থান না পাওয়ায় অনেকে পথে দাঁড়াইয়া ও অশ্ব-শকটের উপর বসিয়া বক্তৃতা শুনিয়া কর্ণ পবিত্র করিয়াছিলেন। বিলম্বে আসায় অনেক ভদ্রলোককে স্থানাভাবে ফিরিয়াও যাইতে হইয়াছিল। শ্রোতৃবর্গের মধ্যে অধিকাংশই শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত লোক ছিলেন।' বর্ণনাটি থেকে আমরা অনুমান করতে পারি যে, বিপুল জনসমাগমে সভা-'গৃহে স্থান না পাওয়ায়' কলকাতা-নগরীর অত্যুৎসাহী ছাত্রের দলও সেদিন 'পথে দাঁড়াইয়া ও অশ্ব-শকটের উপর বসিয়া' কৃষ্ণ প্রসন্নের বক্তৃতা শুনে শুধু 'কর্ণ পবিত্র'ই করে নি, একধরনের অনাস্বাদিত-পূর্ব শ্রেষ্ঠত্বাভিমানের আবেগেও তারা ভেসেছিল।

এই সময়ে আর একটি বিশেষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেও কলকাতার ছাত্রসমাজের সাধারণ মানসিকতার খানিকটা আভাস পাওয়া যায়। বরোদারাজ মলহর রাও-এর উপর ইংরেজদের অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে House of Commons-এর কিছু সদাশয় ইংরেজ সদস্য নানা প্রশ্ন ও যুক্তির দ্বারা Disraeli গঠিত মন্ত্রিসভাকে দিনের পর দিন উত্যক্ত করে আসছিলেন। ঘটনাটি ভারতীয়দের মনেও একটা বিশেষ ক্ষত সৃষ্টি করেছিল। স্বজাতীয়দের এই সমালোচনা বন্ধ করবার ২৮০ এবং ভারতীয়দের মানসিক ক্ষতের উপর একটু প্রলেপ দেবার জন্যে রাজনীতি ধুরন্ধর প্রধানমন্ত্রী Disraeli সাহেব Prince of Wales ('যুবরাজ')-কে ভারত-সাম্রাজ্য পরিদর্শনে পাঠাবার পরিকল্পনা করলেন। যুবরাজের ভারত পরিদর্শনে আসার সংবাদ ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাস থেকেই কলকাতায় এসে পৌঁছিতে থাকে, এবং ভারতে তাঁর গন্তব্যস্থানগুলি, যেমন মাদ্রাজ, বোম্বাই প্রভৃতি শহরে বিপুল তোড়জোড় শুরু হয়ে যায়। ডিসেম্বরের শেষদিকে তাঁর কলকাতায় পদার্পণের সংবাদ ঘোষিত হলেও কলকাতার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে এ-ব্যাপারে তেমন কোন উৎসাহ দেখতে না পেয়ে ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দের ১৪

জুলাই তারিখে রাজভক্ত 'The Indian Mirror' পত্রিকা ক্ষোভের সঙ্গে মন্তব্য করে যে এরূপ উৎসাহহীন শহরে যুবরাজের না আসাই ভালো—' The Prince of Wales had better abondoned the idea of visiting Calcutta – the people of this city are so dull and apparently disloyal'. কলকাতার ছাত্রদের মধ্যে রাজভক্তির অভাব লক্ষ্য করে পত্রিকাটি আরো লেখে যে বোম্বাইয়ের ছাত্রদের মধ্যে যুবরাজ যেমন পারিতোষিক বিতরণ করবেন, তেমনি কলকাতাতেও ওই উদ্দেশ্যে রাজভক্তহীন ছাত্রদের নিকট-সান্নিধ্যে যুবরাজকে আনা হলে, '...the political effect would be something tremendous'.

অবশ্য 'মিরার' পত্রিকার আঁকা এই ছবিটিকে সেকালের কলকাতার জনমানসের পূর্ণাঙ্গ চিত্র বলে মনে করার কারণ নেই, কেননা যুবরাজকে রাজকীয় অভ্যর্থনা জানানোর জন্যে এখানে উদ্যোগ আয়োজনও নেহাৎ কম হয় নি—'British Indian Association' প্রভৃতি সংস্থা একাজে অগ্রসর হয়, দেশীয় রাজা-মহারাজা এবং গণ্যমান্য শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তিরা সমিতি গঠন করেন এবং সমস্ত কলকাতা সহর আলোক মালায় সাজাবার ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক উৎসবের ব্যয় নির্বাহার্থে ব্যাপকভাবে চাঁদা তোলার ব্যবস্থা হয়। ফলে এ ব্যাপারে উৎসাহহীন ব্যক্তিদের কাছ থেকে জোর-জবরদস্তি করে চাঁদা তোলা শুরু হলে অনেকেই যে সেদিন বেজায় রুষ্ট হয়েছিলেন, এসংবাদও ঐ সময়কার কোন কোন পত্র-পত্রিকা থেকে পাওয়া যায়।[২৮১] তা সত্ত্বেও যুবরাজের দশদিন ব্যাপী (২৩শে ডিসেম্বর, ১৮৭৬ থেকে ৩রা জানুয়ারী, ১৮৭৭) কলকাতা-অবস্থিতিকালে সহরে যথেষ্ট আড়ম্বর ও উৎসাহ দেখা দিয়েছিল, রঙ্গলাল-হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্র প্রভৃতি অনেক কবি আপাত রাজভক্তি প্রকাশক অনেক কবিতা[২৮২] রচনা করেছিলেন, উকিল জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়ের অন্তঃপুরে যুবরাজের পায়ের ধূলি পড়েছিল, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যুবরাজকে প্রথম 'সাম্মানিক' ডক্টর অব ল' উপাধি দানে কৃতার্থ হয়েছিল, ইত্যাদি। তত্রাচ এত সব সত্ত্বেও প্রদীপের নীচের অন্ধকারের মতো কলকাতার ছাত্রসমাজের একাংশ, যা সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতায়, ম্যাট্‌সিনি-গ্যারিবল্ডীর জীবন কথায় উদ্দীপ্ত হয়েছিল, তারা যে সেদিন রাজভক্তিতে গদগদ হয়ে ওঠেনি, তারও প্রমাণ 'মিরার' পত্রিকার ঐ পাতাতেই রয়ে গেছে। এই প্রকার অসন্তুষ্ট ও তথাকথিত রাজভক্তিহীন

'স্বাধীনতাকামী যুবসমাজ প্রেরণা লাভ করিয়া বিপ্লবী ম্যাৎসিনীর 'কার্বোনারি'-র অনুকরণে দেশের স্থানে স্থানে গুপ্তসভার সৃষ্টি করিয়াছিলেন'[২৮৩], ঐতিহাসিকের এই প্রকার যথার্থ্য মন্তব্য সত্ত্বেও একমাত্র 'সঞ্জীবনী সভা'র উল্লেখ ব্যতীত মন্তব্যটিকে সমর্থন করবার মতো প্রকৃষ্ট কোন প্রমাণ ঐতিহাসিকরা এতাবৎ কাল আমাদের দিতে পারেন নি। অতঃপর আমরা ঐ কালের কলকাতার সাধারণ ছাত্রদের দ্বারা গঠিত এরূপ একটি 'গুপ্ত সমিতি'র প্রসঙ্গ উত্থাপন করছি।

তার আগে, সেকালের কলকাতার ছাত্রসমাজের একটা বৃহৎ অংশ ম্যাট্‌সিনি গ্যারিবল্ডীর প্রভাবে কি পরিমাণ মেতে উঠেছিল, তার বিশিষ্ট প্রমাণ হিসাবে প্রায় ঐকালের কলকাতা কলেজের ছাত্র (পরবর্তীকালের স্বনামধন্য পুরুষ স্যার) দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারীর (১৮৬২-১৯৩৫) আত্মজীবনীমূলক 'স্মৃতিরেখা' (আশ্বিন, ১৩৪০) গ্রন্থের অংশবিশেষ উদ্ধার করছি। কলকাতায় তাঁর ছাত্রজীবনের বর্ণনা প্রসঙ্গে স্যার দেবপ্রসাদ 'স্মৃতিরেখা'-য় লিখেছেন, 'ইটালীয়ান স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতা ম্যাট্‌সিনি ও গ্যারিবল্ডীর জীবনবৃত্তান্ত ও মর্মকথা তরুণদিগের হাতে হাতে ফিরিত। নেপোলিয়ান বোনাপার্ট যেরূপ হোমারের মহাকাব্য বালিশের তলায় রাখিয়া ঘুমাইতেন, সেইরূপ অনেক অনেক বঙ্গের ভাবী 'আশাস্থলে'রা ম্যাট্‌সিনী ও গ্যারিবল্ডীর জীবনী বালিশের তলায় রাখিয়া ঘুমাইতেন এবং অন্তরঙ্গ বন্ধুদের বিবাহ উপলক্ষ্যে উপঢৌকন দিতেন..... কোথাও কোথাও গুপ্তসমিতি গঠিত হয়েছিল এবং বুক চিরিয়া রক্ত দিয়া সে সমিতিতে শপথ গ্রহণ করিতে হইত।' (পৃ. ১৬৩) স্যার দেবপ্রসাদ ১৮৭৬ সনে প্রেসিডেন্সী কলেজের F. A. শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন।

এরপর আমরা ভারতে ম্যাট্‌সিনি-গ্যারিবল্ডীর-ভাবধারার 'ভগীরথ' সুরেন্দ্রনাথ তাঁর প্রত্যক্ষ জীবিকার্জন ক্ষেত্রে (মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউশনে অধ্যাপনায়) ছাত্রদের কিভাবে এই অভিনব ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ করতেন, তা দেখার চেষ্টা করবো। মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউসনের একদা ছাত্র বিখ্যাত বিপ্লবী ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় (১৮৬১-১৯০৭) ছাত্রাবস্থার নাম ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'আমার ভারত-উদ্ধার' (১৩৩১)। [রচনাটি 'স্বরাজ' পত্রিকার ২৬ মে ও ২রা জুন. (১৯০৭) সংখ্যাদ্বয়ে প্রথম প্রকাশিত হয়।] আত্মস্মৃতিমূলক রচনায় লিখেছেন, 'আমি বিদ্যাসাগরের কলেজে এফ্, এ ক্লাশে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ি। পড়া খুব ভাল হয়। সুরেন বাঁড়ুজ্জে,

প্রসন্নলাহিড়ী, নবীন পণ্ডিত মহাশয় আমাদের পড়ান। সুরেন বাঁড়ুজ্জে তাঁহার লেকচারে প্রায়ই জিজ্ঞাসা করিতেন, তোমাদের মধ্যে কে ম্যাট্‌সিনি-গ্যারিবল্ডি হবে। আমরা উৎসাহে হাত তালি দিয়া বলিতাম— সকলে সকলে (all all)' (পৃ. ১৫-১৬)। ব্রহ্মবান্ধব ১৮৭৭ খ্রীস্টাব্দে মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউসনের F. A. শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন।

স্যার দেবপ্রসাদ এবং ব্রহ্মবান্ধব, দুজনেই তাঁদের ১৮৭৭ সালের ছাত্র-জীবনের কথা বলেছেন, কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ 'প্রথমাবধি' অর্থাৎ মেট্রোপলিটান ইন্‌ষ্টিটিউসনে অধ্যাপনা শুরু (আগষ্ট, ১৮৭৫) করার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর জীবনের লক্ষ্য-কে [ম্যাট্‌সিনির আদর্শে এদেশের ছাত্রসমাজকে উদ্বুদ্ধ করা] রূপায়িত করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন বলেই ইতিপূর্বে আমরা যে মন্তব্য করেছি, অতঃপর তার প্রমাণ দাখিল করার মধ্য দিয়ে কলকাতার সাধারণ ছাত্রদের প্রথম (এবং এখন পর্যন্ত অ-দ্বিতীয়) 'গুপ্ত-সমিতি'টির ইতিহাসও উদ্ধার করছি। এতাবৎকাল প্রাপ্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে এই সমিতিটিকে শুধুমাত্র কলকাতারই নয়, সমগ্রভারতেই প্রথম গুপ্ত সমিতি বলেও সম্ভবতঃ দাবী করা যেতে পারে।

উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৫৬-৯৬) নামে একজন লেখক ছিলেন— বাংলা সাহিত্যের কোনো ইতিহাস-গ্রন্থেই অবশ্য এখনো পর্যন্ত তাঁর নাম স্থান পায়নি। স্থান না পাওয়ার কারণ তাঁর রচনার গুণগত অপকর্ষতা, না রচনার পরিমাণগত অল্পতা, সে-বিতর্কে উপস্থিত আমাদের প্রবেশ করার প্রয়োজন নেই। অবশ্য পরিমাণের দিক দিয়ে গোপালচন্দ্রের প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা মাত্র চারটি। আবার এই চারটি গ্রন্থের মধ্যে তিনি তাঁর জীবিতকালে তিনটি মাত্র গ্রন্থই প্রকাশ করতে পেরে-ছিলেন। (ছাত্রাবস্থায় ১৮৭৮-৭৯ খ্রীস্টাব্দে 'প্রলাপ' নামে তাঁর একটি ক্ষুদ্র কাব্য প্রকাশিত হয়েছিল। দুঃখের বিষয়, বহু অনুসন্ধানেও আমরা এই কাব্যটি দেখতে পাইনি)। সেদিক থেকে তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ 'যতীন্দ্রচরিত, অর্থাৎ কাশীনিবাসী পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য শ্রীমৎস্বামী ভাস্করানন্দ সরস্বতীর সংক্ষিপ্ত জীবনী' ১২৯২ সালে (১৮৮৫ খ্রীঃ) প্রকাশিত হয়। দশটি 'অধ্যায়ে' বিভক্ত ৩০ পৃষ্ঠার এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাটি 'কলিকাতা, এইচ. সি. গাঙ্গুলী এণ্ড কোং, (১২নং ম্যাঙ্গোলেন) দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত' হয়। 'এই ক্ষুদ্র -পুস্তক'টি লেখক তাঁর 'মাননীয় অগ্রজ মহাশয়ের করকমলে ভক্তির সহিত

উৎসর্গীকৃত' করেছেন। গোপালচন্দ্রের তৃতীয় পুস্তকটি দ্বিতীয় পুস্তিকার প্রায় আক্ষরিক ইংরেজি অনুবাদ। নাম, 'Yatindra Charitam, or A short life of Swami Bhaskarananda Saraswati of Beneras.' এগারটি অধ্যায়ে বিভক্ত ২৭ পৃষ্ঠার এই পুস্তিকাটি 'Prnited by—M. L. Patra, Kohinoor Press, 196 Bowbazar Street, Calcutta', দ্বারা মুদ্রিত এবং ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটিতে প্রকাশকের নাম নেই, তবে এটিকেও তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠাগ্রজকে উৎসর্গ করেছেন : 'This book is respectfully dedicated to my elder brother, Babu Rakhaldas Chatterjee.' গোপালচন্দ্রের চতুর্থ গ্রন্থটির উল্লেখ করার পূর্বে তাঁর সাহিত্য-সাধনার নিদর্শন স্বরূপ তাঁর অসমাপ্ত এবং অপ্রকাশিত আর দুটি রচনার বিষয় উল্লেখ করতে হয়—প্রথম, সুরেশ্বরাচার্যকৃত 'স্বরাজ্য সিদ্ধি' নামক অদ্বৈতবাদ-সম্বন্ধীয় গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ। দ্বিতীয়, ভাস্করানন্দ সরস্বতী-কৃত ভাষ্য অবলম্বনে উপনিষদ সমূহের বাংলা অনুবাদ। নিতান্ত অকালে এবং অকস্মাৎ কাল-কবলিত হওয়ায় রচনা দুটি সমাপ্ত বা প্রকাশিত হয়নি।

গোপালচন্দ্রের চতুর্থ প্রকাশিত সৃষ্টিটি হলো 'কবিতামালা' নামক ২০টি খণ্ড কবিতার একটি সংকলন গ্রন্থ। 'কালেজে পাঠ্যাবস্থায় লিখিত' গোপাল-চন্দ্রের কবিতাগুলির মধ্য থেকে ১৩টি 'মধুরভাবময়ী কবিতা' ও ৭টি 'জাতীয় ভাবোদ্দীপক কবিতা'[২৮৪] গোপালচন্দ্রের অনুরাগী সতীর্থ 'দেবেন্দ্রবিজয় বসু কর্তৃক সংগৃহীত' হয়ে গোপালচন্দ্রের মৃত্যুর (২৫ শে আষাঢ়, বুধবার, ১৩০৩ সাল, ইং ৮ই জুলাই ১৮৯৬) সাড়ে তিন মাসের মধ্যে, ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দের ২০ অকটোবর[২৮৫] 'কলিকাতা ১/১ শঙ্কর ঘোষ লেন, নব্য ভারত প্রেসে শ্রীউমেশ চন্দ্র নাগ দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত' হয়। মূল্য ১৲ টাকা। স্বরচিত আট-ছত্রের একটি কবিতা দ্বারা দেবেন্দ্রবিজয় কাব্যটি উৎসর্গ করেছেন তাঁর অকাল-প্রয়াত সুহৃদ ও সহপাঠী গোপালচন্দ্রকেই। দেবেন্দ্রবিজয় বসু (১৮৫৮-১৯১৯) অবশ্য বাংলা সাহিত্যে যে একেবারে অপরিচিত, তা নন।[২৮৬] 'কবিতামালা' গ্রন্থের উপোদ্‌ঘাতে সুদীর্ঘ (প্রায় ১৯ পৃষ্ঠাব্যাপী) 'সংগ্রাহকের নিবেদন' অংশে দেবেন্দ্রবিজয়, গোপালচন্দ্রের জীবনকথা ও কবি-প্রতিভা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন। তদানীন্তন বাংলা সাহিত্যের পটভূমিকায় গোপালচন্দ্রের কবি-প্রতিভার সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন করতে

গিয়ে দেবেন্দ্রবিজয় প্রসঙ্গতঃ ঐ সময়ের কলকাতার ছাত্রসমাজের মানসিকতারও একটা বিশদ আলোকচিত্র তুলে ধরেছেন। ঐ সূত্রে দেবেন্দ্র-বিজয়-প্রদত্ত সামাজিক ইতিহাসের ইঙ্গিতবাহী হ্রস্ব মন্তব্যগুলির মধ্যে অবশ্য সামান্য তথ্যগত ত্রুটি[২৮৭] থেকে গেছে, তবে সেগুলি ঠিক আমাদের তাৎক্ষণিক আলোচনার অন্তর্ভুক্ত নয়, বা আমাদের অন্বেষ্টব্য তথ্য আহরণ বিষয়ে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না বলে, আমরা অনায়াসে সেগুলিকে উপেক্ষা করতে পারি। গ্রন্থটি প্রকাশের কারণ সম্পর্কে দেবেন্দ্রবিজয় লিখেছেন,—"গোপালের স্মৃতিচিহ্ন রাখিবার উদ্দেশ্যেই আমি তাহার কবিতাগুলি সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিলাম।"

প্রথমে আমরা 'সংগ্রাহকের নিবেদন' অংশ থেকে দেবেন্দ্রবিজয়-প্রদত্ত গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবন-কথা সংক্ষেপে উদ্ধার করছি। ১২৬২ সালের ৩রা চৈত্র, ববিবার (১৫ই মার্চ ১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দ) উত্তরপাড়ায় গোপালচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম কালীকুমার চট্টোপাধ্যায়, 'তিনি একজন ধার্মিকের আদর্শস্থানীয়'। [দেবেন্দ্রবিজয় জানিয়েছেন যে এই নিবেদন অংশ রচনার সময়ে ৮৫ বৎসর বয়স্ক কালীকুমার কাশীধামে বাস করছেন।] 'শৈশবেই গোপালের মাতৃবিয়োগ হয়।' গোপালচন্দ্র ধর্মভীরু পিতা-মাতাব 'সবকনিষ্ঠ সন্তান'। গোপালচন্দ্রের সর্বাগ্রজ রাখালচন্দ্র (এঁকেই গোপালচন্দ্র তাঁর রচিত 'যতীন্দ্র চরিত' ও 'Yatindra Charitam' উৎসর্গ করেছেন) 'পূর্বে ইকজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন, সম্প্রতি পেন্‌সন লইয়াছেন।' 'উত্তরপাড়ার এই ধার্মিক পরিবার'-এর আবহাওয়ায় 'গোপাল বাল্যকাল হইতেই কবিতা রচনা কবিত।...সে স্বভাব কবি ছিল।' এণ্ট্রান্স পরীক্ষোত্তীর্ণ গোপালচন্দ্র, দেবেন্দ্র বিজয় এবং কালিদাস ভট্টাচার্য[২৮৮] ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দে মেট্রোপলিটান ইন্‌ষ্টিটিউসনের এফ্. এ. শ্রেণীতে ভর্তি হন। '১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দে সুরেন্দ্রবাবু (সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়) প্রথমে মেট্রোপলিটান কালেজে শিক্ষক হইলেন। সেই সময় হইতেই তাঁহার ওজস্বিনী বক্তৃতায় তখনকার ছাত্রগণ মাতিয়া উঠিয়াছিল।... ঐ সময়ে আমি ও গোপাল উভয়েই সেই কালেজে পড়িতাম। আমরাও তখন সুরেন্দ্রবাবুর শিক্ষার ফলে জাতীয় ভাবে আকৃষ্ট হইতে ছিলাম।' এই সময়ে বাঙালিদের জাতীয়-জীবনে এক প্রবল ভাববন্যা উপস্থিত হয়েছিল—"কমলাকান্ত 'আমার দুর্গোৎসব' উপলক্ষ করিয়া, মা জন্মভূমির উদ্দেশে মা-মা রবে উচ্চে কাঁদিয়া

বাঙ্গালা ভাসাইয়া দিতেছিল।" এই সময়ে অনেক কবি অসংখ্য 'জাতীয় ভাবোদ্দীপক কবিতা' রচনা করতে থাকেন, "হেমবাবুর সর্বজন আদৃত 'ভারত সঙ্গীত' বোধ হয় এই শ্রেণীর কবিতার মধ্যে প্রথম।[২৮৯] এই সময়ে বাঙ্গালায় মহা পরিবর্তন প্রথম বহিতে আরম্ভ হয়। সে বাঙ্গালার এক মহা মাহেন্দ্রক্ষণ!" এই মাহেন্দ্রক্ষণে 'সুরেন্দ্রবাবুর শিক্ষার গুণে' জাতীয়ভাবে গোপালচন্দ্র, দেবেন্দ্রবিজয় ছাড়াও 'অনেকেই তখন এই ভাবে মাতিয়াছিল।' "তখন কত জাতীয় সঙ্গীত, কত উদ্দীপক কবিতা সৃষ্টি হইয়াছিল। সেগুলিও সে সময়ের ছাত্রদের মাতাইত। ইহা ব্যতীত, তখন ছাত্রেরা পড়িত ম্যাট্‌সিনি-গ্যারিবল্ডী প্রভৃতি।" ফলে "অনেকেই ম্যাট্‌সিনিকে জীবনের আদর্শ করিবে বলিয়া স্থির করিয়াছিল। তখন অনেকে বিশ্বাস করিত যে 'ইয়ং ইতালী'[২৯০] প্রভৃতি গুপ্ত-সভার ন্যায় সভা না করিলে আর দেশ উদ্ধারের উপায় নাই। তখন দুই একটা এইরূপ সভারও সৃষ্টি হইয়াছিল। আমাদের 'হিন্দুস্থান ইউনিয়ন' নামে কতকটা ঐরূপ এক সভা ছিল।...গোপালও এই সভার একজন প্রধান সভ্য ছিল।" দেশের এবম্বিধ আবহাওয়ায় গোপালচন্দ্র তাঁর দেশাত্মবোধ-উদ্বোধক কবিতাগুলি রচনা করেন, 'সমস্ত কবিতা গুলিই গোপালের কালেজে পাঠ্যাবস্থায় ২১ হইতে ২৩ বৎসর বয়সের মধ্যে লিখিত।' 'বোধ হয় ইংরাজি ১৮৭৭ সনের মে কি জুন মাসে কোন এক সভা হইতে আসিয়া গোপালচন্দ্র এক দিনে এক উদ্যমে 'ভারত বিলাপ' নামক একটি দীর্ঘ কবিতা রচনা' করেন, যার 'পাণ্ডুলিপি' পড়ে কবি নবীনচন্দ্র সেন (১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে 'পলাশীর যুদ্ধ' কাব্য প্রকাশিত হওয়ায় তিনি তখন কবি রূপে বিশেষ বিখ্যাত হয়েছেন) শুধু যে 'মুক্তকণ্ঠে ইহার কবিতার প্রশংসা' করেন, তাই নয়, পাণ্ডুলিপিটির অনেক স্থলে 'fine poetry', 'excellent poetry' ইত্যাদি মন্তব্যও লিখেছিলেন। 'প্রায় সতের বৎসর পূর্বে' ['সংগ্রাহকের নিবেদন' রচনার তারিখ হলো ৬ই শ্রাবণ, ১৩০৩ সাল, ইংরাজি ২০ শে জুলাই, সোমবার, ১৮৯৬। সুতরাং তার সতের বৎসর পূর্বে অর্থাৎ], ১৮৭৮-৭৯ খ্রীস্টাব্দে 'আমাদের কোন বন্ধু শ্রী আশুতোষ ঘোষাল' এই 'দীর্ঘ কবিতা'টিকে 'কাটিয়া ছাঁটিয়া' 'প্রলাপ নাম দিয়া' 'নিজ ব্যয়ে', 'হিন্দু লাইব্রেরী' কালকাতা থেকে প্রকাশ করেন। 'এখন আর সে 'প্রলাপ' বাজারে দেখিতে পাওয়া যায় না।' (বহু অনুসন্ধানেও আমরাও

দেখতে পাইনি।) রাজকৃষ্ণ রায়ের 'বীণা' পত্রিকায়[২৯১] গোপালচন্দ্রের 'বীণা' ও 'স্বদেশ' নামক দুইটি কবিতা প্রকাশিত হয়। এই সময়ে লর্ড রিপণ স্বায়ত্ত শাসনমূলক প্রতিষ্ঠান মিউনিসিপ্যালিটিগুলিতে জনসাধারণের মনোনীত প্রতিনিধিদের প্রবেশের জন্য যে সাধারণ নির্বাচন প্রথার প্রবর্তন করেন, উত্তরপাড়ার প্রভাবশালী মুখোপাধ্যায়—পরিবার উত্তরপাড়া মিউনিসিপ্যালিটিতে সেই নির্বাচন ব্যবস্থা চালু করার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেন। উত্তরপাড়ার জনগণের সঙ্গে গোপালচন্দ্র এই নির্বাচন প্রথা চালু করার জন্যে 'প্রাণপণ' সংগ্রাম শুরু করেন, এবং শেষ পর্যন্ত তাতে জয়যুক্ত হন।

গোপালচন্দ্র 'আইন পরীক্ষা'য় উত্তীর্ণ হয়ে ১৮৮৩ সালে মৈমনসিংহে যান। এখানে তাঁর জ্যেষ্ঠাগ্রজ রাখালচন্দ্র ইনজিনিয়ার ছিলেন। এই সময়ে 'মৈমনসিংহে 'একবার মহা অগ্নিকাণ্ড হইয়াছিল। তাহাতে প্রায় অর্ধেক সহর পুড়িয়া যায়।…যখন আগুন চারি দিকে ধু ধু করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, তখন গোপাল প্রাণপণে সেই অগ্নিপ্রকোপ নিবারণের চেষ্টা করিতেছিল, আর্তের উপকার করিতে ছিল।… শহরের এক স্থানে একটি প্রকোষ্ঠে প্রায় হাজার মণ বারুদ' ছিল। 'সে বারুদে আগুন লাগিলে আর সহর থাকিবে না', আগুন ইতিমধ্যেই সেই ঘরের কাছে এসে পৌঁচেছে, 'জজ, ম্যাজিস্ট্রেট' প্রভৃতি নিরুপায় হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন—ঘর থেকে বারুদ আনতে গেলে মৃত্যু অবধারিত বুঝে কেউ আর সাহস করছে না। তখন গোপাল কয়েকটি কুলি নিয়ে 'সেই অগ্নির দুর্গ ভেদ' করে ঘরে প্রবেশ করলেন। "তখন অগ্নির উত্তাপে বারুদ বিলক্ষণ গরম হইয়াছিল। প্রতি মুহূর্তে তাহাতে আগুন লাগিবার সম্ভাবনা ছিল। তথাপি গোপাল সাহসে ভর করিয়া একে একে সেই সব বারুদের বস্তা কুলি দিয়া নিরাপদ স্থানে' এনে সহরকে রক্ষা করেছিলেন। ময়মনসিংহে তিনি নব্য হিন্দু ধর্মের দুই প্রবক্তা শশধর তর্কচূড়ামণি ও কৃষ্ণপ্রসন্ন সেনের বক্তৃতাদির দ্বারাও প্রভাবান্বিত হন। 'পাঠ্যাবস্থায়' গোপালচন্দ্র 'হিন্দুধর্মে বিশেষ আস্থাবান' ছিলেন না, তবে 'বরাবরই গোপালের ঈশ্বরে বিশ্বাস ছিল'। মৈমনসিংহে তিনি জনৈক 'ইংরাজি শিক্ষিত হিন্দুযোগী' পুরুষের সান্নিধ্যে আসেন। ঐ যোগীপুরুষের উপদেশে তিনি বিশেষ ভাবে ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন। এই সময়ে 'গোপালের জীবনে একটি মহাপরিবর্তন ঘটিয়াছিল…গোপাল ধর্মের পরম অমৃত লাভ করিয়া

জীবনের সকল সাধের—সকল আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি করিয়াছিল।' 'যখন কবির হৃদয়ে নানারূপ ভাব-তরঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাত হয়, অন্তর উদ্বেলিত হয়, তখনই হৃদয়ের বাঁধ ভাঙ্গিয়া দিয়া কবিতার নদী ছুটিতে থাকে।' এখন 'গোপাল যখন ধর্মের স্নিগ্ধ উজ্জ্বল কিরণে আপনাকে ধৌত করিয়া হৃদয়কে পবিত্র করিয়াছিল, তখন তাহার হৃদয়ের আবেগ থামিয়াছিল, তাহার হৃদয়ে কবিতার উৎস শুখাইয়া গিয়াছিল।' সুতরাং 'গোপাল পর জীবনে আর কোন কবিতা লিখে নাই।' '১২৯৫ সনে গোপাল শ্রীমদ্ ভাস্করানন্দ স্বামীর [১৮৩৩-৯৯] নিকট দীক্ষিত হয়।' অনতিকাল পরেই সরকারী চাকুরি গ্রহণ করে গোপালচন্দ্র 'মুন্সেফ' রূপে চট্টগ্রামে গমন করেন। চট্টগ্রামে অবস্থিতি কালে চট্টগ্রামবাসীদের উন্নতির জন্য তিনি নানাবিধ সংকর্মের সূত্রপাত করেন। এতদিন পর্যন্ত সেখানের প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান 'সীতাকুণ্ডে'র পুণ্যার্থীদের কাছ থেকে সীতাকুণ্ডের মোহান্ত বেআইনী ভাবে যে কর আদায় করে আসছিল, তা বন্ধ করাব জন্যে গোপালচন্দ্র আন্দোলন শুরু করেন। ফলে মহা গোলযোগ শুরু হয়, ব্যাপারটি মামলার আকারে আদালত পর্যন্ত গড়ায়, দেশের সংবাদপত্রগুলিও সে আন্দোলনে যোগ দেয়। শেষাবধি গোপালচন্দ্রের প্রচেষ্টা সফল হয় এবং কর রহিত হয়। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে গোপালচন্দ্রের পত্নীর মৃত্যু হয়। 'গোপাল নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও গুরু ও পিতার আদেশে · দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করিয়াছিল'। এই সময়ে তিনি সুরেশ্বরাচার্যের 'স্বরাজ্যসিদ্ধি' নামক গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ এবং ভাস্করানন্দ স্বামীর ভাষ্য অবলম্বনে উপনিষদ সমূহের বাংলা অনুবাদ কার্য শুরু করেছিলেন, ঈশ ও কঠ উপনিষদ দুটির অনুবাদ সমাপ্ত হয়েছিল। কিন্তু সামান্য 'জ্বর বিকারে' সম্পূর্ণ সজ্ঞানে চট্টগ্রামের মহাতীর্থ 'চন্দ্রনাথে' তিনি ২৫ শে আষাঢ় বুধবার ১৩০৩ (৮ই জুলাই, ১৮৯৬) সালে মাত্র ৪০ বৎসর ৩ মাস বয়সে পরলোক গমন করেন।

গোপালচন্দ্রের কবি-প্রতিভা আলোচনা প্রসঙ্গে দেবেন্দ্রবিজয় তৎকালীন বঙ্গ-সাহিত্যের অবস্থার কথাও সংক্ষিপ্তাকারে বলেছেন। তাঁদের সাধারণ (common) বন্ধু 'উদার হৃদয়' 'লেখক' কালিদাস ভট্টাচার্য গোপালচন্দ্রের কবিতাগুলি কবিতা রচনার তারিখ সমেত খাতায় টুকে রাখতেন। 'কালিও আজ তিনমাস হইল আমাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছে।' গোপালচন্দ্রের মৃত্যুর পর কালিদাসের কপি-করা গোপালচন্দ্রের কবিতার খাতাগুলি সংগ্রহ করে এনে

দেবেন্দ্রবিজয় সেগুলি থেকে ২০টি কবিতা বেছে 'কবিতাবলী'র অন্তর্ভুক্ত করেন। এই কুড়িটি কবিতাকে তিনি দুটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন—(১) 'মধুর ভাবময়ী কবিতা'— এই শ্রেণীতে আছে ১৩টি কবিতা, এবং (২) 'জাতীয় ভাবোদ্দীপক কবিতা'— বাকি সাতটি কবিতা এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। যে সময়ে দেবেন্দ্রবিজয় 'সংগ্রাহকের নিবেদন' লিখেছেন, অর্থাৎ ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাস, তখন বাংলা সাহিত্যে মধুসূদনের বস্তুভাব প্রধান (objective) কাব্যরচনার কাল শেষ হয়ে বিহারীলালের আত্মভাব-মুখ্য (subjective) খণ্ড কবিতা প্রায় একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করেছে, বিহারীলালের উত্তর সাধক ইংরেজকবি 'শেলীর শিষ্য' রবীন্দ্রনাথ 'শেলীর মতন অরূপতত্ত্ব ভাবানন্দী কবিতা' লিখছেন, 'আপন হৃদয়ের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার অনুভূতিগুলি কবিতাকারে প্রকাশ' করছেন, 'কোনরূপ নিয়ম, সংযম-প্রণালী কি বিধিবিধান একেবারে অগ্রাহ্য করিয়া কেবল মনের ও কলমের গো মতেই' চলেছেন, 'আকার পরিত্যাগ করিয়া নিরাকারে, নির্দিষ্ট ছাড়িয়া অনির্দিষ্টে, বিশেষকে বর্জন করিয়া সামান্যে রবীন্দ্রনাথের কবিতা স্রোতোমুখে উচ্ছ্বসিত' হচ্ছে [২৯২] এবং রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ ও অনুকরণ করে একটা রবীন্দ্র-ভক্ত কবি-সমাজও গড়ে উঠ্ছে। ফলে 'বাংলা-সাহিত্যে পৌরুষের বদলে কোমল-ও পেলব-ভাবের চর্চাই প্রাধান্য লাভ করেছে, ফুল, জ্যোৎস্না, মলয়-বাতাস, প্রেম, বিরহ, হাহুতাশ-দীর্ঘশ্বাসে বাংলা-সাহিত্যের আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে উঠলেও···জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রকাশক জাতীয় সাহিত্য রচিত হচ্ছে না বলে এই সময়ে চিন্তাশীল ব্যক্তিদের উদ্বিগ্ন হয়ে আক্ষেপ করতে শোনা' যাচ্ছে।[২৯৩] এই প্রকার আক্ষেপের মৃদু গুঞ্জন দেবেন্দ্রবিজয়ের 'সংগ্রাহকের নিবেদন' অংশেও যে একেবারে শোনা যায় না, তা নয়। তিনি লিখছেন, 'আমাদের দেশে প্রথম শ্রেণীর কবিতা ['মধুর ভাবময়ী কবিতা']-র অভাব নাই, কবিতাবলী [২৯৪] অবকাশ রঞ্জিনী [২৯৫] অবসর সরোজিনী [২৯৬] প্রভৃতি অনেকগুলি কবিতা পুস্তক কেবল এই শ্রেণীর কবিতায় পূর্ণ। আজ পর্যন্ত যত কবিতা পুস্তক প্রচারিত হইয়াছে, তাহাদের অধিকাংশ কবিতাই এই শ্রেণীর অন্তর্গত। দ্বিতীয় শ্রেণীর কবিতা ['জাতীয় ভাবোদ্দীপক কবিতা'] বড় বেশী পাওয়া যায় না। আর পূর্বে এই শ্রেণীর কবিতা যত পাওয়া যাইত, এখন আর তত পাওয়া যায় না।' এর পরে তিনি বাংলা দেশে প্রবল জাতীয় জাগরণের

সূত্রপাতে কবিরা যে ভাবে দেশাত্মবোধ-সঞ্চারক কবিতাদি রচনা করেছেন, সে প্রসঙ্গে এসেছেন—'আজি প্রায় কুড়ি বৎসরের অধিক হইল, বাঙ্গালায় প্রথমে কবি হৃদয়ে এই জাতীয় ভাব বিকাশ হইতে আরম্ভ হয়।' দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি হেমচন্দ্রের 'ভারতসঙ্গীত' বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের দপ্তর'ান্তর্গত 'আমাদের দুর্গোৎসব'[২৯৭] রচনার উল্লেখ করে লিখেছেন যে এই সময়ে 'কয়েকজন কবি কয়েকটি জাতীয় সঙ্গীত ও কবিতা লিখিয়াছিলেন। তখন এইরূপ কতকগুলি সঙ্গীত একত্রিত হইয়া 'জাতীয় সঙ্গীত'[২৯৮] নামে প্রকাশিত হইয়াছিল।...তাহার পরে আনন্দমঠে[২৯৯] এই জাতীয় ভাবের পূর্ণবিকাশ হইয়াছিল। 'বন্দেমাতরম্ গান জাতীয়সঙ্গীত বলিয়া সর্বত্র আদৃত হইতেছিল।'

দেবেন্দ্রবিজয় কলকাতায় তাঁর বা তাঁদের ছাত্রাবস্থায় গড়ে-ওঠা 'হিন্দুস্থান ইউনিয়ন' নামক 'গুপ্ত সভা'টির যে নাতি হ্রস্ব বিবরণ সংকলন করে গেছেন, অতঃপর আমরা কিছু প্রাসঙ্গিক টীকা সমেত তা উপস্থিত করছি। (বক্তব্যের পৌর্বাপর্য বজায় রাখার জন্যে আমাদের পুনরুক্তি করতে হয়েছে।)

দেবেন্দ্রবিজয় লিখেছেন—"আজ কুড়ি বৎসরের অধিক অধিক হইল ·· বাঙ্গালায় মহা পরিবর্তন স্রোত প্রথম বহিতে আরম্ভ হয়। সে বাঙ্গালার এক মহা মহেন্দ্রক্ষণ!...বাঙ্গালা ক্রমে জাতীয় ভাবে আকৃষ্ট হইয়া কার্যক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইতেছিল। এই ক্ষেত্রে সুরেন্দ্রনাথের অবদান অসীম । ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দে সুরেন্দ্রবাবু প্রথমে মেট্রোপলিটান কালেজের শিক্ষক হইলেন। সেই সময় হইতে তাঁহার ওজস্বিনী বক্তৃতায় তখনকার ছাত্রগণ মাতিয়া উঠিয়াছিল। · ঐ সময়ে আমিও গোপাল উভয়েও সেই কালেজে পড়িতাম। আমারও তখন সুরেন্দ্রবাবুর শিক্ষার ফলে জাতীয় ভাবে আকৃষ্ট হইতেছিলাম। অনেকেই তখন এইভাবে মাতিয়াছিল। তখন কত জাতীয় সঙ্গীত, কত উদ্দীপক কবিতার সৃষ্টি হইয়াছিল। সেগুলিও সে সময়ের ছাত্রদের মাতাইত। ইহা ব্যতীত, তখন ছাত্রেরা পড়িত—ম্যাটসিনি-গ্যারিবল্ডি প্রভৃতি[৩০০]। অনেকেই ম্যাটসিনিকে জীবনের আদর্শ করিবে বলিয়া স্থির করিয়াছিল। তখন অনেকে বিশ্বাস করিত যে, 'ইয়ং ইতালী' প্রভৃতি গুপ্ত সভার ন্যায় সভা না করিলে আর দেশ উদ্ধারের উপায় নাই। তখন দুই একটা এইরূপ সভারও সৃষ্টি হইয়াছিল।...'হিন্দুস্থান ইউনিয়ন' নামে কতকটা ঐরূপ এক সভা ছিল।"

সুরেন্দ্রনাথ তাঁর আত্মজীবনী '*A Nation in Making*' (২য় মুদ্রণ, ১৯২৫) গ্রন্থের ৩৫ পৃষ্ঠায় লিখেছেন যে, 'Students' Association-'এ যোগদান করবার পর তিনি কলকাতায় বিভিন্ন কলেজে Students' Association-এর শাখা-সমিতি খোলার জন্যে উৎসাহ দিতে থাকেন,—'I became its most active member, and urged the establishment of branch Associations in the different Colleges as feeder institutions'. এই 'Students' Association' তথা-কথিত 'গুপ্ত সমিতি' নয়, এবং আলোচ্য 'হিন্দুস্থান ইউনিয়ন' সংস্থাটিও যে সুরেন্দ্রনাথ-প্রোক্ত 'Students' Association'-এর 'feeder-institution' মাত্র ছিল না, বা সেভাবে গড়ে উঠেনি, তার তিনটে প্রমাণ আছে। প্রথম প্রমাণ হলো, দেবেন্দ্রবিজয় তাঁর রচনায় একবারও 'Students Association'-এর নাম উল্লেখ করেন নি। দ্বিতীয় প্রমাণ হলো, 'হিন্দুস্থান ইউনিয়ন' যে একটি প্রকৃত গুপ্ত সমিতি, সেকথা দেবেন্দ্রবিজয় স্পষ্টভাষায় উল্লেখ করেছেন, 'উহার অধিবেশনে সাধারণের প্রবেশাধিকার ছিল না', এবং তৃতীয় প্রমাণ হলো, এটি যে 'Students' Association'-নিরপেক্ষ একটি স্বতন্ত্র সমিতি রূপে গড়ে ওঠেছিল, তা সভাটির পরিণতি বিষয়ে দেবেন্দ্রবিজয় যা বলেছেন, তা থেকে বোঝা যায়। দেবেন্দ্রবিজয় লিখেছেন যে সুরেন্দ্রনাথ 'ভারতসভা' ['Indian Association', ২৬ জুলাই, ১৮৭৬] স্থাপন করলে 'ক্রমে হিন্দুস্থান ইউনিয়নের সভ্যগণ মিলিত হইয়া ভারত সভাকে প্রকৃত কর্তব্য পথে চালাইবার জন্য ঐ সভার সভ্য হইতে লাগিল। এমন একদিন গিয়াছে যখন ঐ সভ্যগণের সাগ্রহ উদ্যমে ভারতসভা ব্যতিব্যস্ত হইয়া আপনাকে সুসংস্কৃত করিয়া, সুপথে যাইতে বাধ্য হইয়াছিল। বলিতে কি, ঐ সংঘর্ষণের ফলেই ভারত সভার শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল।[৩০১]...ক্রমে হিন্দুস্থান ইউনিয়ন ভারত সভার অস্তিত্বে আপনার অস্তিত্ব মিশাইয়া দিয়াছিল।'

নানা কারণেই তখন পর্যন্ত ভারতীয় মুসলমানরা ইংরেজদের সম্পর্কে একটা বিদ্বেষভাব পোষণ করে চলছিল, তাদের মধ্যে ওয়াহাবী, ফরায়েজী, তারিক-ই-মহম্মদীয়া প্রভৃতি আন্দোলনের রেশ সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হয়ে যায়নি।[৩০২] ফলে মুষ্টিমেয় কয়েকজন ছাড়া বৃহত্তর মুসলমান সম্প্রদায় পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষাকে গ্রহণ করবার জন্যে তখনও ঠিক আগ্রহী হয়ে ওঠেনি। এদিকে উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে আস্তে আস্তে মুসলমান সম্প্রদায়-

নিরপেক্ষ ভারতীয় মহাজাতির যে ভাবকল্পনা (Concept) শিক্ষিত-মানসে গড়ে উঠছিল, তাতে ভারতীয় ও হিন্দু শব্দ দুটি প্রায় সমার্থক এবং ভারত অর্থে 'হিন্দুস্থান' শব্দটি বিশেষ প্রাধান্য লাভ করতে থাকে। ইতিমধ্যে 'চৈত্রমেলা' নামের বদলে 'হিন্দুমেলা' নামকরণে, কৃষ্ণপ্রসন্ন সেনের 'ভারতের মূর্চ্ছাভঙ্গ' ও রাজনারায়ণ বসুর 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব' প্রতিপাদক বক্তৃতায় একধরণের সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবোধের ক্রমবর্ধমান প্রভাবই সূচিত হয়েছিল। কিছু পরে 'National' শব্দটির ঔচিত্য প্রতিষ্ঠার জন্যে 'National Paper' এ নবগোপাল মিত্র যখন লেখেন,– 'We do not understand why our correspondent takes exception to the Hindus who certainly form a nation by themselves, and as such a society established by them can very properly be called a National Society.···Hindu nationality is not confined to Bengal It embraces all of Hindu name and Hindu faith throughout the length and breadth of Hindustan.'[৩০৩] তখন এর মধ্যে সেকালের শিক্ষিত জন-মানসের প্রতিবিম্বই দেখা যায়। সেদিক থেকে কলকাতার ছাত্রদের প্রথম গুপ্ত সমিতির 'হিন্দুস্থান ইউনিয়ন' নামকরণে সেকালের জন-মানসের সেই সঙ্কীর্ণ হিন্দু জাতীয়তাবোধের পরিচয়ই রয়েছে।

আবার, ম্যাটসিনি-গ্যারিবল্ডীর নেতৃত্বে ইতালীর মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস ছাড়াও ইংরেজদের শাসন-শোষণ থেকে মুক্তি পাবার জন্যে আয়ার-ল্যাণ্ডের কয়েক শতাব্দী ব্যাপী স্বাধীনতা সংগ্রামের সংবাদ নানা সূত্র থেকে তৎকালীন ছাত্রদের কর্ণগোচর হয়েছিল। স্যার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী তাঁর 'স্মৃতিরেখা' (১৩৪০) গ্রন্থের ১৬৪ পৃষ্ঠায় জানিয়েছেন যে, ঐকালের ছাত্রদের মধ্যে 'আয়ার্লণ্ডের রাষ্ট্রীয়-অভ্যুত্থান সম্বন্ধে এবং জার্মানী ও অষ্ট্রিয়ার রাজনৈতিক আন্দোলন সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ আগ্রহের সহিত অধীত হইত।'[৩০৪] ইতালীর মতো আয়ারল্যাণ্ডের দেশপ্রেমিক নায়করা খণ্ড-বিচ্ছিন্ন আয়ার-ল্যাণ্ডকে ঐক্য-বন্ধনে আবদ্ধ করে স্বাধীনতা-সংগ্রামকে তীব্র করে তুলতে শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে 'The United Irishmen' নামে সমিতিটি স্থাপন করেছিলেন। কিছুদিন পরেই সুরেন্দ্রনাথ, আনন্দ মোহন প্রভৃতির বক্তৃতায়, 'বঙ্গদর্শন', 'আর্য্যদর্শন' প্রভৃতি পত্রিকার পাতায় খণ্ড-বিচ্ছিন্ন ভারতবর্ষকেও একতাবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা উল্লিখিত হয়ে আসছিল। এ সকলের

দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েই সেকালের ছাত্রেরা তাদের গুপ্ত-সমিতিটির নামের সঙ্গে 'ইউনিয়ন' শব্দটি যুক্ত করেছিল।

'হিন্দুস্থান ইউনিয়নে'র কার্যালয় কোথায় ছিল, সে সংবাদ আমরা 'সংগ্রাহকের নিবেদন' অংশ থেকে পাইনি এবং এবিষয়ে সাধ্যমত অনুসন্ধান করেও ব্যর্থ হয়েছি। সমিতিটির সঠিক সভ্য সংখ্যার উল্লেখ না থাকলেও এর সভ্য সংখ্যা যে নেহাৎ কমছিল না, তা দেবেন্দ্রবিজয়ের রচনাতেই পাওয়া যায়: 'বাঙ্গালার প্রধান নগরে এই সভার অনেক সভ্য ছিলেন'। প্রসঙ্গতঃ তিনি গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং কালিদাস ভট্টাচার্য্য ছাড়া[৩০৫] এখানে আর একজন সভ্যের নাম করেছেন, 'এক্ষণীকার এটর্নী খ্যাতনামা শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাস[৩০৬] প্রভৃতি কয়েকজন এই সভার প্রধান সভ্য ছিলেন।' বিপিনচন্দ্র পাল লিখেছেন যে এই সময়ে 'Surendranath was himself, I think, the President of quite a number of these secret societies'।[৩০৭] সংবাদটি থেকে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস সুরেন্দ্রনাথ তাঁর কলেজের অর্থাৎ Metropolitan Institution-এর ছাত্র-সংশিষ্ট 'হিন্দুস্থান ইউনিয়ন' নামক গুপ্ত সমিতিটিরও 'সভাপতি' ছিলেন।[৩০৮]

দেবেন্দ্রবিজয়ের রচনা থেকে আমরা সমিতিটির উদ্দেশ্য (object) ও ক্রিয়াকর্ম (activity) সম্বন্ধেও কিছু সংবাদ পাই, 'সভায় বক্তৃতা হইত, সাধারণ লোকে কিরূপে উন্নত হইবে—কেমন করিয়া শিক্ষিত হইবে— সভায় এই সকল বিষয়েরই অধিক চর্চা হইত। ……এই সভার এক অভিপ্রায় ছিল যে ভারতের, অন্ততঃ বাঙ্গালার সর্বত্র ঐরূপ শাখা-সভার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। কাজে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই'। সংবাদটির শেষ সংক্ষিপ্ত বাক্যে রচয়িতার যে হতাশা-ব্যঞ্জক সুর ধ্বনিত হয়েছে, তা থেকে বোঝা যায় যে 'ঐরূপ শাখা সভার প্রতিষ্ঠা' কল্পে তিনি বা সমিতির সভ্যরা কিছু চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছিলেন। তবে সমিতিটির গঠন-মূলক অন্যতম উদ্দেশ্য, 'সাধারণ লোক'কে 'শিক্ষিত' করে তোলার চেষ্টা যে অন্যভাবেও করা হয়েছিল, সে সংবাদ তিনি আমাদের জানিয়েছেন, 'জাতীয় শিক্ষা বিস্তার উদ্দেশ্যে ঐ সভা হইতে 'প্রচারক' নামে এক পত্রিকা বাহির হইতে আরম্ভ হয়। এই ক্ষুদ্র লেখকই তাহাতে ভারতের বিবরণ লিখিয়াছিল।' একটি নবজাত-সমিতি তার মুখপত্র হিসাবে কয়েকমাস (? 'বাহির হইতে আরম্ভ হয়' শব্দগুলি লক্ষনীয়) একটি পত্রিকা (এটি যে মুদ্রিত হোত সে বিষয়ে সন্দেহ নেই,

কেননা বৃহত্তর জনসমাজের জন্য এটি প্রকাশিত হয়েছিল) প্রকাশ করছে, সংবাদ হিসাবে এটিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-সঙ্কলিত 'বাংলা সাময়িক পত্র' গ্রন্থে এর উল্লেখ নেই, এবং বহু সন্ধান করেও এই পত্রিকার কোন সংখ্যা আমরা দেখতে পাইনি।)

দেবেন্দ্রবিজয় এই সমিতিটির পরিণতির কথা জানাতেও ভোলেন নি। ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি যে 'ভারতসভা' প্রতিষ্ঠিত (২৬ জুলাই, ১৮৭৬) হ'লে হিন্দুস্থান ইউনিয়নের সভ্যেরা দলবদ্ধ ভাবে ('মিলিত হইয়া') 'ভারত সভা'য় যোগদান করে এবং ভারতসভাকে 'প্রকৃত কর্তব্য পথে চালাইবার জন্য' তাদের 'সম্মিলিত উদ্যমে ভারত সভা ব্যতিব্যস্ত' হয়ে পড়ে। এ থেকে আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয়না যে 'ভারতসভা' স্থাপনের পর অন্ততঃ বেশ কয়েকমাস 'হিন্দুস্থান ইউনিয়ন' নামক সমিতিটির অস্তিত্ব ছিল। আমাদের এরূপ সিদ্ধান্তের কারণ ব্যাখ্যা করছি। যোগেশচন্দ্র বাগল তাঁর 'History of the Indian Association' (? 1953) গ্রন্থে জানিয়েছেন যে, প্রতিষ্ঠার পর এক বছর 'ভারতসভা'-কে নানাদিক থেকে ('different quarters') আগত প্রবলবাধার ('formidable opposition) সম্মুখীন হতে হয়েছিল দৃষ্টান্ত হিসাবে তিনি 'British Indian Association' এর নাম করেছেন (পৃঃ ১০)। দেবেন্দ্রবিজয়ের বক্তব্য থেকে আমরা বুঝতে পারি যে ঐ নানাদিক থেকে আগত বাধাগুলির মধ্যে 'হিন্দুস্থান ইউনিয়নে'র সদস্যদের সম্মিলিত প্রতিরোধও ছিল। তবে এক বছর ধরেই, অর্থাৎ ১৮৭৭ খ্রীস্টাব্দের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত তারা যে এই ব্যাপারে সক্রিয় ছিল, এমন মনে হয় না। এরূপ মনে না হওয়ার কারণ হোল দেবেন্দ্রবিজয় সম্ভবতঃ ১৮৭৬ সালের মাঝামাঝি কোন সময়ে প্রেসিডেন্সী কলেজে এসে ভর্তি হয়েছিলেন। '(Presidency College Register, 1927', p 92) এবং সম্ভবতঃ তাঁর মতো সমিতির অন্যান্য ছাত্র-সভ্যরাও আশু F. A. ও অন্যান্য পরীক্ষায় অবতীর্ণ হবার জন্য ১৮৭৬ সালের শেষদিকে পরীক্ষা প্রস্তুতিতে মনোনিবেশ করেছিলেন। ফলে সম্ভবতঃ সমিতি-টির কাজকর্মেও কিছু শৈথিল্য দেখা দিয়েছিল। প্রায় কুড়ি বৎসর পূর্বেকার ঘটনাবলী বিবৃত করতে গিয়ে সম্ভবতঃ সেদিনের মহৎ উদ্দেশ্যের ব্যর্থতা ('কাজে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই') দেবেন্দ্রবিজয়ের রচনায় একটা প্রচ্ছন্ন বেদনার ছাপ ফেলেছে। সুতরাং আমাদের সিদ্ধান্ত এই যে 'ভারত সভা' স্থাপনের পর বেশ কয়েকমাস (? ছয় সাত মাস) 'হিন্দুস্থান ইউনিয়নে'র সভ্যেরা তাদের সমিতির

ছাপ বজায় রেখেই 'ভারতসভা'র যে সব ক্রিয়া-কর্ম তাদের অনভিপ্রেত বা তাদের আদর্শের অনুকূল নয় বলে মনে করতো, সেগুলির বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে প্রতিবাদ জানিয়ে এসেছিল, এবং এ ব্যাপারে তারা যে অনেকটা সফলও হয়েছিল, তার প্রমাণ রয়েছে দেবেন্দ্রবিজয়ের বক্তব্যে, 'বলিতে কি, ঐ সংঘর্ষণের ফলে ভারত সভার শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল।' এবং শেষ পর্যন্ত এই ভাবে 'ক্রমে হিন্দুস্থান ইউনিয়ন ভারত সভার অস্তিত্বে আপনার অস্তিত্ব মিশাইয়া দিয়াছিল ' এই সময়টাকে আমরা ১৮৭৭ সালের জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী মাস বলে মনে করতে পারি। সুতরাং এই বিশ্লেষণ থেকে আমাদের সিদ্ধান্ত এই যে, 'হিন্দুস্থান ইউনিয়ন' নামে কলকাতার ছাত্রদের এই 'গুপ্ত-সমিতি'টি ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দের শেষ দিক থেকে ১৮৭৭ খ্রীস্টাব্দের প্রথম দিক পর্যন্ত জীবিত ছিল।

এই হোল উনিশ শতকের সত্তরের দশকে কলকাতার ছাত্রসমাজের দ্বারা গঠিত একটি 'গুপ্ত সমিতি'। দেবেন্দ্রবিজয় তাঁর রচনায় 'সমিতি' শব্দের বদলে সর্বত্র 'সভা' শব্দটির ব্যবহার করেছেন। একালে 'সভা' শব্দটির দ্বারা এক-দিনের অনুষ্ঠান আমরা বুঝে থাকি, কিন্তু সেকালে Society Association, Organisation অর্থে 'সভা' শব্দটিরই অধিক প্রচলন ছিল 'ব্রহ্মসভা', 'ধর্মসভা', 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা', 'শুভসাধিনী সভা', 'হিতৈষী সভা', 'বাল্যবিবাহ নিবারণী সভা' প্রভৃতি অসংখ্য সংস্থার নাম সে কথাই বলে।

তদানীন্তন বাংলা সরকার প্রকাশিত 'Report on the Administration of Bengal, 1876-77' (1878)-এর অন্তর্গত 'Return of Scientific and Literary Societies of Bengal', pp CCII-CCVII অংশটিতে সমগ্র বাংলা-দেশে ঐ সময়কালে মোট ৫৯টি সংস্থার অস্তিত্বের কথা বলা হয়েছে, (এই তালিকায় The Indian Association ও The Indian League অন্তর্ভুক্ত নয়।) যার মধ্যে ১২টি ছিল খাস কলকাতায়। এই তালিকার বাইরেও কলকাতায় অনেক সমিতি ছিল[৩০৯] যেগুলির অস্তিত্বের কথা সরকারের পক্ষে জানা সম্ভব ছিল না (যেহেতু সেগুলিতে 'সাধারণের প্রবেশাধিকার ছিল না'), সেগুলির সংখ্যা সরকারী হিসাবে ধরা পড়েনি। এই ধরণের সংস্থাগুলি সম্পর্কে আধুনিক গবেষক বলেছেন, 'There were more middle class projects for political association than the Indian League and the Indian Association.'[৩১০] Indian League বা Indian Association

জাতীয় প্রভাবশালী সংস্থাগুলি ছাড়া আরো যে সব অল্পজীবী সংস্থা গড়ে উঠ্‌তো, যাতে 'not much preparations and funds were necessary to open one association', সেই সমিতিগুলি সম্পর্কে 'often newspapers ceased to report about them after announcing their formation or giving news about a few meetings.[১১১] We have to presume their deaths from such sudden silences'[১১২] সঙ্গত কারণেই সেকালের গুপ্ত সমিতিগুলি সম্বন্ধে একথা খাটে না, এবং সুখের বিষয় হোল 'হিন্দুস্থান ইউনিয়ন' নামক সংস্থাটি ঠিক এমনি অবজ্ঞাত ভাবে যে মরেনি তা আমরা দেবেন্দ্রবিজয়ের রচনা থেকে জানতে পারছি। নদীর বেগবান জলধারা যেমন অসীম বারিধি বক্ষে মিলিত হ'য়ে সার্থক হয়, তেমনি এই সমিতিটিও গৌরবের সঙ্গে বৃহত্তর সংস্থা 'Indian Association'-এর 'অস্তিত্বে আপনার অস্তিত্ব মিশাইয়া দিয়াছিল', এবং এসবের ফলেই সম্ভবতঃ অতিশীঘ্র প্রবল শক্তি সঞ্চয় করে Indian Association সমগ্র ভারতের রাজনীতি-ক্ষেত্রে একটা বিশিষ্ট স্থান দখল করতে পেরেছিল।

এর বছর দশেক পরে, ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দের ২৩শে জুন, আত্মতৃপ্ত ও অহঙ্কারী বড়লাট লর্ড ডাফরিন তদানীন্তন ভারত-সচিব লর্ড নর্থব্রুককে যে পত্র লেখেন, তার শেষ দিকে বলেছেন, 'In conclusion, however, I think I can safely say that however annoying may be the violence, childishness and perversity of the Benglee press and of young Babu politicians, their influence at present is neither extensive nor dangerous. The mass meetings and all the paraphernalia of the Indian Caucus, though they make a noise and may appear effective and formidable in the telegrams which the Associations transmit to England, do not really amount to much for the present,' কিন্তু তারপরেই পত্রটি শেষ করেছেন যে অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত দিয়ে, তা অবশ্য কুড়ি বৎসরের মধ্যেই ফলে গিয়েছে, 'but it does not follow that some years hence what is now in the germ, may not grow into a very formidable product।'[১১৩]

পাদটীকা

(১) 'I knew of one such society, though I was not myself a member of it.⋯ · Every member of this society had to sign the pledge of membership with his own blood drawn at the point of a sword from his breast'-'Memories of My Life and Times' (1932) Bipin Chandra Pal. p 248.

স্যার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারীর (১৮৬১-১৯৩৫) আত্মজীবনীমূলক 'স্মৃতিরেখা' (আশ্বিন, ১৩৪০) গ্রন্থেও পাওয়া যায়, 'কোথাও কোথাও গুপ্তসমিতিও গঠিত হইয়াছিল এবং বুক চিরিয়া রক্ত দিয়া সে সমিতিতে শপথ গ্রহণ করিতে হইত।' (পৃঃ ১৬৪)।

(২) 'Surendranath was himself, I think, the President of quite a number of these secret societies · '.—'Memories of My Life and Times' (1932) B.C.Pal, p 247.

ইংরেজ সরকারের দৃষ্টি এড়াবার জন্যেই অবশ্য সুরেন্দ্রনাথ এই সময়ে, ১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দের ২রা এপ্রিল, 'উত্তরপাড়া হিতকরী সভা'য় 'Joseph Mazzini' শীর্ষক বক্তৃতায় ঘোষণা করেছিলেন যে সারা ভারতে কোথাও কোন গুপ্ত সমিতি নেই। দ্রঃ 'Speeches of Babu Surendranath Banerjea, 1876—1880' (Calcutta, 1880). Edited by Ramchandra Palit, p 79.

(৩) Bengal Library Catalogue, Third Quarter ending 30th September, 1912, p 4.

(৪) 'জ্যোতিদাদার উদ্যোগে আমাদের একটি সভা হইয়াছিল, বৃদ্ধ রাজনারায়ণ বাবু ছিলেন তাহার সভাপতি। ইহা স্বাদেশিকের সভা।' 'জীবনস্মৃতি' (পুনর্মুদ্রণ, চৈত্র ১৩৪৪), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। (পৃঃ ১৪৭—১৪৮)।

(৫) 'এই সময়ে জ্যোতিবাবুর উদ্যোগে আর একটি সভা স্থাপিত হইয়াছিল। এই সভার নাম ছিল 'সঞ্জীবনীসভা'। ছেলেবেলাকার সেই Masonic সভার ইহা একটি দ্বিতীয় সংস্করণ!' 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি' (ফাল্গুন, ১৩২৬), বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়। (পৃঃ ১৬৩)।

(৬) এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার জন্য গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

(৭) 'বোমার যুগের কাহিনী—দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ'। বারীন্দ্রকুমার ঘোষ। 'বিজলী', ২য় বর্ষ, ৩৯ সংখ্যা (২৬শে শ্রাবণ, ১৩২৯ ; ১১ই আগষ্ট, ১৯২২) পৃঃ ৫।

(৮) 'আত্মপরিচয়' (পুনর্মুদ্রণ, চৈত্র, ১৩৫২), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। (পৃঃ ৮৭)।

(৯) 'সঞ্জীবনী সভা'র আয়ুষ্কাল আমরা মোটামুটি ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের শেষদিক থেকে ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের মে-জুন মাস পর্যন্ত বলে গ্রহণ করেছি। এ সম্পর্কে দ্বিতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

(১০) 'From the point of view of British politics, the seventies in India were an unusual ten years. Economically it was a difficult decade'. 'Rise of an Indian Public' (2, October, 1977), Uma Dasgupta, p 9.

(১১) ভারত, আয়ারল্যাণ্ড, রাশিয়া, আমেরিকা প্রভৃতি দেশ সম্পর্কে বিখ্যাত বাগ্মী ও পার্লামেন্টের সদস্য John Bright (১৮১১—১৮৮৯) সাহেবের প্রদত্ত কতকগুলি বক্তৃতা, লিখিত পত্র ইত্যাদি ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে James E Thorold Rogers দ্বারা সম্পাদিত হয়ে 'Speeches on Questions of Public Policy' গ্রন্থ নামে প্রকাশিত হয়। (গ্রন্থটির ৮ম সংস্করণ হয় ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে)। এই গ্রন্থের 'Preface' অংশে সম্পাদক Rogers সাহেব স্পষ্টাক্ষরে জানিয়েছেন, 'The joint action of the Board of Control and the Directors [of the 'East India Company'] led to the Indian Mutiny'.

(১২) (ক) 'The Wahabi Movement in India' (1977) Qeyamuddin Ahmed. pp 93-95.

(খ) 'গণ অসন্তোষ ও উনিশ শতকের বাঙালী সমাজ' (মার্চ, ১৯৮৪) স্বপন বসু। (পৃঃ ২৯-৩৬)

(১৩) 'The Hindoo Patriot', 3rd December, 1857.

(১৪) 'Civil Rebellion in Indian Mutinies' (1957) S. B. Chowdhury. (pp 274 – 276.) সিপাহী বিদ্রোহ দমিত হবার পরেও প্রতিহিংসাপরায়ণ ইংরেজরা যখন নিরীহ ভারতীয়দের নিষ্ঠুরভাবে হত্যার মারণযজ্ঞে মেতে উঠেছে, তখন ইংরেজদের মানবতাবোধের

কাছে আবেদন জানিয়ে ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দের ২৪শে জুন John Bright সাহেব House of Commons-এ তাঁর সুদীর্ঘ বক্তৃতার এক অংশে বলেন, 'If you are to punish eyery non-military Natives of India, who has given a piece of bread or a cup of water to the revolted trooper, how many Natives will escape your punishment and vengeance? I would have a general amnesty, which should putforth as the first great act done directly by the Queen of England in the exercise of sovereign power over the territories of India.···I am terrified for the future of India, when I look at the indiscriminate slaughter which is now going on there.' 'Speeches on Questions of Public Policy' (London : 8th edition, 1898)—Right Honourable John Brigtht, M. P. pp 30, 39.

(১৫) 'The Indian middle classes' (1978) B. B. Misra, p 263.

(১৬) 'The Hindoo Patriot', 6 th May, 1858.

(১৭) দেশে শিক্ষা-বিস্তারের প্রচেষ্টাকে সিপাহী-বিদ্রোহের কারণ বলে মনে করে যারা বিশ্ববিদ্যালয়কে তুলে দেবার কথা বলেছিলো, তাদের অশুভ-অভিমতের বিরুদ্ধে সদ্য-সৃষ্ট 'Lieutenant-Governor of Bengal' পদে নবনিযুক্ত Sir Frederick Halliday যা লিখেছিলেন ('Minute of 1858'), তার ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম। কুসংস্কার এবং অজ্ঞতাই ('delusive mist of prejudice and misinformation') যে এরূপ ধারণা গড়ে ওঠার কারণ, একথা জানানোর পর Halliday সাহেব তীব্র ব্যঙ্গ সহকারে লেখেন, '·· though it is not uncommon in these days to attribute the recent mutinies to our educational operations, and even to propose to to draw back from them for fear of similar consequences in future, the error of this opinion is like that of a man who, after unwisely and incautiously exposing a barrel of gunpowder to all kinds of dangerous influences, and hav-

ing by good luck, and in spite of bad management, long escaped without an accident, should at last, when the fatal and inevitable explosion takes place, blame neither the gunpowder, nor his own rashness and indiscretion, but rather lay the whole mischief to account of some one of many little sparks flying about, and talk of limiting the use of fire and candle in future to prevent similar occurances'.—'Bengal under the Lieutenant-Governors, Vol-I' (2nd edition, 1902). C. E, Buckland, p 9.

(১৮) সিপাহী বিদ্রোহের অবসানে ভারতের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে ইংরেজ ও ভারতবাসীর পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দের ২৪ শে জুন House of Commons-এ বক্তৃতা প্রসঙ্গে Bright সাহেব বলেন, 'I remember that the Hon'ble Frederick Shore, who wrote thirty years since, stated in his able and instructive book, that even in his time the conduct of the English in India towards the Natives was less agreeable, less kindly, less just than it had been in former years, and in 1853, before the Committee presided over by the Hon. Member for Huntingdon (Mr T. Baring) evidence was given that the feeling between the rulers and the ruled in India was becoming every less like what could be desired.'

'Speeches of John Bright' (1898), p 29.

(১৯) 'The Black act agitation (1849) had completed the alienation of the Europeans from the politically conscious Bengalis.'—'The Bengali Press' (1976) Smarajit Chakravarty, p 140.

(২০) রামমোহন ও আয়ারল্যাণ্ড সম্পর্কে এই গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে কিছু আলোচনা করা হয়েছে।

(২১) 'Enemies of liberty and friends of despotiosm never have been and never will be successful'.

(২২) 'রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়' (১৩২৪) মন্মথনাথ ঘোষ। (পৃঃ ৩১-১৫)।

(২৩) 'বাংলা সাময়িক পত্র, ১৮১৮-৬৮' (১৩৫৪) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। (পৃঃ ১৫৪-২১৮)।

(২৪) এই কারণেই 'Vernacular Press Act' (1878) চালু হবার পূর্বে 'সহচর', 'সমাজ দর্পণ' প্রভৃতি পত্রিকার সঙ্গে 'সোমপ্রকাশ'ও Lytton-সরকারের কোপদৃষ্টিতে পড়ে। অপমান-জনক শর্তে পত্রিকা প্রকাশ করতে রাজি না হয়ে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ 'সোমপ্রকাশ' প্রচার বন্ধ করে দেন। অবশ্য বৎসরখানেক পরে তা আবার চালু হয়।

(২৫) 'The militant political philosophy of the Somprakash thus anticipated the extremist philosophy of later years.'
'The Bengali Press' (1976) Smarajit Chakravarti, p. 143.

(২৬) এই বক্তৃতায় যীশুখৃষ্টের প্রতি কেশবচন্দ্রের ভক্তির আধিক্য দেখে সেকালের বহু লোকের ধারণা হয়েছিল যে কেশবচন্দ্র অচিরে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করবেন। বিষয়টি সেকালে জনসমাজে বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল।

(২৭) 'They (Europeans) liken a Native to a fox—willy, fradulent, and mean—full of sinister motives, deceit and cunning. He is born and bred a fox and is destined to live and die a fox. As a fox, therefore, a Native should always be distrusted, and treated with contempt and hatred. Many natives, on the other hand, liken a European to a wolf—a vindictive, wrathful, ferocious, and blood thirsty. He is born and bred a wolf, and is destined to live and die a wolf…'—'Life and Works of Brahmananda Keshab Chandra' (1940) Compiled by Dr Preemsunder Basu. p. 99.

(২৮) 'হিন্দু মেলার ইতিবৃত্ত' (১৩৭৫) যোগেশ চন্দ্র বাগল। (পৃঃ ৩)

(২৯) 'আত্মচরিত' (তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৫২) রাজনারায়ণ বসু। (পৃঃ ৮১)

(৩০) 'পুরাতন প্রসঙ্গ' (বিদ্যাভারতী ১৩৭৩) বিপিনবিহারী গুপ্ত। (পৃ. ২৩৮)

(৩১) 'Chronicle of the British Indian Association'. (1966) Edited by P. N. Singh Roy, p. 19.

(৩২) Ibid, p. 42.
"...it was not liked by the British rulers'.—'The Bengali Press.' (1976) Smarajit Chakravarti, p. 180,

(৩৩) 'Congress and Congressmen, 1885-1917' (March, 1967) B.B. Majumder & B.P. Mazumdar, pp. 230-31.

(৩৪) 'The Emergence of Indian Nationalism' (1st Indian Reprint, 1982) Anil Seal, p. 137.

(৩৫) "Already in 1868 Strachey had been arguing that 'Some people seem to think that education will make the people of India loyal and contented'. I believe this opinion to be altogether erroneous." Ibid, p. 133,

(৩৬) "Education in the highest sense of the term must be one of national development to be of any use to a country. That result, however, is not to be expected in India, so long as the vast superiority of the English race produced in their minds an over-whelming sense of their own inferority. The two nations must be amicably parted before any thing, good or great, could be achieved by the people of this country.'—'The Proceedings and Transactions of the Bethune Society' from November 10th 1859 to April 20th, 1869.

(৩৭) 'The Wahabis...were the first terrorists.'—'Notes on the Bengal Renaissance' (2nd edition, 1957) Amit Sen, p. 57.

(৩৮) 'Rise of an Indian Public' (1977), Uma Dasgupta, p. 65.

(৩৯) 'Chronicle of the British Indian Association' (1966) Ed. by P.N. Singh Roy, p. 57.

(৪০) (ক) ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন থেকে প্রকাশিত 'Discontent and Dan-

ger in India' গ্রন্থের 'Drain of Capital' শীর্ষক দ্বিতীয় অধ্যায়ে গ্রন্থ-লেখক A. K. Connell, M A (late scholar of New College, Oxford) ভারতবর্ষ থেকে যে হারে বিপুল পরিমাণ অর্থ ইংরেজরা শোষণ করছে, তার ফিরিস্তি দিয়ে প্রশ্ন করেছেন, 'Is it possible for a country with such a teeming population to stand this drain ? If only half of it had been spent in India, it would have supported nearly one million families - the number calculated to have died in the recent famine. In spite of these figures Mr. Bright speaks of India as a burden on England. The truth is that scientific blood-sucking has taken place of promiscuous plunder, but the result for India is equally bad ; she is gradually losing her capital while her population increases, and periodical famines stare her in the face'. p 48.

(খ) Mr. Grant Duff ('Under Secretary of State') কর্তৃক উপস্থাপিত Indian Budget, 1872, যাতে আরো ৩০ লক্ষ পাউণ্ড বাড়তি রাজস্ব আদায়ের প্রস্তাব করা হয়েছিল, তার তীব্র সমালোচনা ক'রে পার্লামেন্টের অর্থনীতিবিদ্ সদস্য Henry Fawcett ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দের ৬ই আগষ্ট House of Commons-এ বক্তৃতায় জানান যে 'India is an extremely rich country' এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হ'য়ে তাকে আর দোহন করা থেকে ইংরেজদের অতঃপর ক্ষান্ত হওয়া উচিত। এবং নানা প্রমাণ উপস্থিত করে তিনি দেখিয়ে দেন যে নিরন্তর শোষণের ফলে ভারতবর্ষ ইতিমধ্যেই দেউলিয়া হয়ে গেছে। 'Speeches on Some Current Political Questions' [London, 1873)—Henry Fawcett. গ্রন্থটির প্রথম প্রবন্ধ 'Indian Finance—the Indian Budget, 1872' দ্রষ্টব্য।

(৪১) ১৯০১ খ্রীস্টাব্দে লণ্ডন থেকে প্রকাশিত 'Prosperous British India' গ্রন্থে গ্রন্থকার William Digby হিসাব দিয়েছেন যে ১৯০০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে ভারতবর্ষে ১৮টি দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল, যার মধ্যে ৪টি ছিল ভয়াবহ। 'Rise and Fulfilment of British Rule

in India' (2nd edition, 1955) গ্রন্থে গ্রন্থকারদ্বয় Edward Thompson ও G. T. Garratt স্বজাতির প্রতি পক্ষপাত সত্বেও লিখতে বাধ্য হয়েছেন, 'Four serious famines occured between 1867 and 1877 and in no case did the administrative machinery functioned satisfactorily'. p. 484.

(৪২) 'The rapid rise in the cost of living has affected no class more injuriously than the old clerkly castes from which the teaching staff and the scholars of our schools and colleges are mainly recruited'.—'Indian Unrest' (London, 1910) Valentine Chirol, p. 225.

(৪৩) 'Already in the 1880 s—70's unemployment arose among the intelligentsia, and it increased substantially by the beginning of the 20th century. At the some time continually rising prices througout the second half of the 19th century severely hit most of the unemployed too'.—'Social thought in Bengal in the late 19th and early 20th century,' by E. N. Komarov, in 'Tilak and the Struggle for Indian Freedom' (May 1, 1966) Edited by I. M. Reisner & N. M. Goldberg, p. 229.

(৪৪) সম্পাদকীয় নিবন্ধ 'বি,এ, উপাধি পরীক্ষা'—'সোমপ্রকাশ', ১লা পৌষ ১২৬৯ (১৫ই ডিসেম্বর, ১৮৬২)।

(৪৫) 'Voluntary Associations and the Urban Public Life in Bengal'. (1st edition, September, 1980)-Rajat Sanyal p. 24.

(৪৬) (ক) 'In 1870, Lord Mayo had proclaimed that the age of improvement has begun.'—'The Emergence of Indian Nationalism' (1982), Anil Seal, p. 136.

(খ) 'ভারতের মুক্তি সন্ধানী' (১৯৫৮) যোগেশচন্দ্র বাগল। (পৃ. ৮৬)।

(৪৮) 'Rise of an Indian Public' (1977) Uma Dasgupta, p 65.

(৪৯) 'Resolution of September, 1869'-এর সঙ্গে প্রেরিত ব্যাখ্যার এক অংশে সত্যটি এইভাবে স্বীকৃত হয়েছে'...the most intellectually

advanced provinces of India, such as Bengal….'—'Bengal under the Lieutenant-Governors, Vol-1' (1902) C. E. Buckland, p. 470.

(৫০) 'A Bengali Zamindar' (1975) Nilmani Mukherjee, p. 294.

(৫১) 'A further communication was then addressed to the Government of India, respectfully urging the ill-effect certain to be produced by the last Resolution on the people of Bengal in strengthening the belief, which had for some-time past been gaining ground, that the Government of India was opposed to the further spread of English education among them. And, in stating his views on the point, Sir. W. Grey expressed a hope that, if the general belief regarding the intentions of Government of India upon this important question was wrong, and without foundation some step should be taken to dispel the apprehension and the irritation which prevailed among the native community throughout Bengal.'—'Bengal under the Lieutenant-Governors, Vol I' (1902) Buckland, p. 470

(৫২) 'A Bengali Zamindar' (1975) Nilmani Mukherjee, pp 294-296.

(৫৩) 'Studies in the Bengal Renaissance : Bipin Chandra Pal Birth Centenary Volume' (1958), edited by Atul Chandra Gupta, p 89.

কেশবচন্দ্রের এই 'Perish British Bule' শব্দগুলি ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ব্যক্তিদের [অন্ততঃ আয়ারল্যাণ্ডের মুক্তি-সংগ্রামের নেতারা অবশ্যই। কেননা ইতিমধ্যেই পৃথিবী-ব্যাপী ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধাচারণ, তথা উচ্ছেদের জন্ত তাঁরা ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দে 'Fenian Brotherhood' সমিতি গঠন ক'রে কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ-আমেরিকা প্রভৃতি বৃটিশ-শাসিত অঞ্চলে তাঁদের কার্য সুরু করেছিলেন, অল্প পরে তাঁদের 'Constitutional Reform Association' গঠিত হলে ভারতের

রাজনৈতিক নেতাদের সহযোগিতা আহ্বানের কথা তাঁরা ১৮৭৪ সালে ভেবেছিলেন, ভারতে 'Vernacular Press Act' প্রভৃতি দমনমূলক আইনের বিরুদ্ধে O' Donnell প্রভৃতি আইরিশ সদস্য House of Commons এ প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেছিলেন (দ্বিতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য)] মধ্যে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে শুরু হওয়ায়, শব্দগুলিকে ব্যঙ্গ করে মাদ্রাজের 'Royal Artillery'-র অবসর প্রাপ্ত ('retired') 'কর্ণেল', অহঙ্কারী সাম্রাজ্যবাদী W. F. B. Laurie তাঁর 'Some Curiosities of Petition Literature, East and West : Remarks on Perish India' and the questions of the day' (London : 1878) গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় 'Perish India'-তে লিখেছেন, 'Perish India ' ringing in our ears , and while thinking o. the illustrious dead, the question more strongly put to us than ever.— Are we one day to lose, or are always to hold, the most splendid and hard-won dominion under the Sun ? · As long as the Sun shines in the Heavens, the British flag shall wave over those possessions ! Inscribe this saying on the doors of your Chambers ye ve n men, who talk of Perish India ! Perish British interests in the East !' p. 5

(৫৪) Anstey সাহেব সম্পর্কে কিছু কৌতূহলোদ্দীপক সংবাদ পাওয়া যায় বিলাতের বিখ্যাত ব্যারিষ্টার Serjeant Ballantine (বরোদারাজ মলহর রাওয়ের পক্ষ সমর্থনকারী)-এর স্মৃতিকথা 'Some experiences of a Barrister's life' (London' : 6th edition, 1882) গ্রন্থের ৪৫ সংখ্যক 'The trial of the Gaekwar of Baroda' অধ্যায়ে, 'Shortly before my arrival, a somewhat eccenric member of the bar, whom I had known well in London, had died— Mr. Chisholm Anstey. He had been in Parliament where he was so indefatigable in worrying every body that the Government made him Attorney General at Hong-Kong, and he celebrated the night before that fixed for his departure by breaking the heads of a couple of policemen, and

thus nearly lost his appointment. I was instrumental in setting the matter for him. At Hong-Kong he continued to commit such vagaries that he was recalled, before being so, there had been two unsuccessful attempts to poison him. He then settled down, as far as he could settle, as counsel at Bombay, where he became very popular with the natives, whose interests he advocated with great zeal, energy and ability, and was a considerable thorn in the sides of the constituted authorities (p 418) আমীর খাঁর পক্ষ-সমর্থনকারী এই Anstey সাহেবের সওয়াল-জবাবে শুধু মাত্র ভারতের Mayo-সরকারই নয়, ইংল্যাণ্ডের শাসন-কর্তৃপক্ষও যে বিশেষ শঙ্কিত হয়েছিলেন, তা এখান থেকে বোঝা যায়।

(৫৫) (ক) 'English Rule and Native opinion in India' (London, 1878) James Routledge p 72.

(খ) The Wahabi Movement in India' (1966) Qeyamuddin Ahmed, p. 301.

(৫৬) 'ভারত সংস্কার সভা' স্থাপন করা ছাড়াও কেশবচন্দ্র এই সময়ে এক পয়সা মূল্যের 'সুলভ সমাচার' পত্রিকা প্রচার এবং নৈশবিদ্যালয়, স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তার, সুরাপান-নিবারণী প্রচেষ্টা ইত্যাদি কার্যক্রমের পত্তন করেন।

(৫৭) 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ-সমাজ' (তৃতীয় সংস্করণ) শিবনাথ শাস্ত্রী, (পৃঃ ৩০৮)।

(৫৮) 'ভারত বিলাপ' ১২৭৭ সালের ২৮শে জ্যৈষ্ঠ (১০ই জুন, ১৮৭০) এবং 'ভারতসঙ্গীত' ১২৭৭ সালের ৭ই শ্রাবণ (২২ শে জুলাই, ১৮৭০) 'এডুকেশন গেজেটে' প্রকাশিত হয়। 'এই দুইটি কবিতা রচনা করিয়া হেমচন্দ্র একেবারে বাঙ্গালার প্রথম শ্রেণীর কবির আসন প্রাপ্ত হন এবং সর্বশ্রেষ্ঠ জাতীয় কবি বলিয়া তাঁহার যশঃ পরিব্যাপ্ত হয়'— 'হেমচন্দ্র, ১ম খণ্ড' (১৩২৩)-মন্মথ নাথ ঘোষ। (পৃঃ ২১১)

(৫৯) ঐ, (পৃঃ ২৩০-২৩১)।

(৬০) ঐ, (পৃঃ ২৩০)।

(৬১) ঐ, (পৃ: ২৪৬)।

(৬২) 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ-সমাজ' (৩য় সংস্করণ)-শিবনাথ-শাস্ত্রী, (পৃ: ৩০৫)

(৬৩) 'The Wahabi Movement in India' (1966) Qeyamuddin Ahmed, p. 321, Foot-note.

(৬৪) 'ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস, ১ম ভাগ' (১৯৭০) সুপ্রকাশ রায়। (পৃ: ৫২)

(৬৫) 'Indian National Congress, Vol-1' (1946) Hemendranath Dasgupta, p. 45.

(৬৬) 'Mr. Anstey's addresses, reprinted as a pamphlet, occupied a prominent place on the book shelf of every youth of the time' —'The Congress and the National Movement—From a Bengali standpoint' (1928), p. 8.

(৬৭) অবশ্য আবদুল্লা 'ওয়াহাবী' কিনা সে বিষয়ে নিঃসংশয় সিদ্ধান্তে এখনও পর্যন্ত কেউ পৌঁছাতে পারেন নি। 'The Wahabi Movement in India'(1966) গ্রন্থের লেখক Qeyamuddin Ahmed এবিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন (ঐ গ্রন্থের ৩০১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। অনেকে অবশ্য স্পষ্ট ভাবেই আবদুল্লাকে 'ওয়াহাবী' বলে উল্লেখ করেছেন, যেমন হেমেন্দ্র-নাথ দাশগুপ্তের 'The Indian National Congress, Vol 1 (1946) গ্রন্থের ৪৫ পৃষ্ঠায়; যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের 'Forward' সহ ১৯২৮ সালে প্রকাশিত 'The Congress and the National Movement,—From a Bengali standpoint' (1928) গ্রন্থের ৮ পৃষ্ঠায় ইত্যাদি। ওয়াহাবী বিচারের সঙ্গে জড়িত 'নর্মান' সাহেবের অপঘাত-মৃত্যু যে ওই বিচারকার্যের জন্যই হয়েছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত 'English Rule and Native opinion in India' গ্রন্থের ৭৬-পৃষ্ঠায় James Routledge সাহেবও তা বলেছেন, 'I have no doubt that the cause of the murder was the Wahabi trials', এবং এই জন্যই সাধারণভাবে আবদুল্লাকে 'ওয়াহাবী' বলে উল্লেখ করা হয়ে থাকে, যেমন নর্মান-হত্যার পাঁচ মাসের মধ্যেই ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারী আন্দামান-দ্বীপ পরিদর্শনরত বড়লাট

লর্ড মেয়োর হত্যাকারী শের আলি-কেও সাধারণভাবে ওয়াহাবী বলে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। শের আলিও ওয়াহাবী কিনা তারও নিঃসংশয় প্রমাণ নেই। তবে ঘটনার প্রায় পাঁচ বৎসর পরে, ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দের ১৪ই নভেম্বর তারিখের 'The Indian Mirror' পত্রিকার 'The week' অংশে এই সংবাদটি প্রকাশিত হতে দেখা যায়: 'The London correspondent of the Indian Daily News is informed 'that some private despatches, which have been, within the last few days, received at the India Office, tend to confirm the impression··· that the assassination of the late Lord Mayo was the result of a conspiracy amongst the Wahabis', p. 6.

(৬৯) 'The Indian National Congress, vol I' (1946) H. N. Dasgupta), p. 45.

(৭০) ভারতে 'East India Company'-র যথেচ্ছাচার ('Perjury and wrong are universal wherever the Courts of the Company's Service have been established in India') এবং সেখানকার ইংরেজ কর্মচারীদের বেতন ইংল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী বা অন্যান্য মন্ত্রীদের বেতনের সমান, একথা জানিয়ে ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দের ২৪শে জুন House of Commons-এর বক্তৃতায় Bright সাহেব বলেন, 'These salaries based upon the theory that India is a mine of inexhaustible wealth···' ইংল্যাণ্ডের লোকেদের এই ভুল ধারণাটি তিনি ভাঙতে চেয়েছিলেন। ঘুষ খেয়ে ও নানা বে-আইনী পদ্ধতিতে ইংরেজ কর্মচারীদের অপরিমেয় ধন-দৌলত নিয়ে দেশে ফিরে 'নবাব' সাজার কথাটা তিনি অবশ্য বলেন নি, যদিচ তিনি শুধু নন, ইংল্যাণ্ডের চক্ষুষ্মান ব্যক্তিমাত্রেই তা জানতেন। Lester Hutchinson-এর 'The Empire of the Nobabs' (London, 1937) গ্রন্থে এর ভুরি ভুরি প্রমাণ আছে।

(৭১) 'Life of Shishir Kumar Ghosh' (1946) Wayfarer, p. 32.

(৭২) 'মহাত্মা শিশির কুমার ঘোষ' (২য় সংস্করণ, ১৯১৬) অনাথ নাথ বসু। (পৃঃ ৮৬)

(৭৩) 'মসনদ' শব্দটি ব্যঙ্গার্থে ব্যবহৃত হয় নি। ১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দে ছুই

বাংলার এই 'Lieutenant-Governor'-এর আসনটিকে সেকালের ইংরেজরাও 'রাজসিংহাসনে'র সমান মর্যাদা-সম্পন্ন এবং বাংলা দেশকে সেই সিংহাসনাসীন ব্যক্তির 'রাজত্ব' বলে শুধু যে মনে করতো তাই নয়, লিখিত ভাবে উল্লেখ পর্যন্ত করতো। এখানে এমন একটি প্রমাণ উদ্ধার করছি। জনৈক ইংরেজ সিভিলিয়ান C.T Buckland, F. Z. S. (যিনি তাঁর নামের তলায় 'Father of the Bengal Civil Service in 1881' শব্দগুলি কেন বসিয়েছেন তা ঠিক বোঝা গেল না) ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দে লণ্ডন থেকে প্রকাশিত তাঁর 'Sketches of Social Life in India' গ্রন্থের 'Members of Council and Lieutenant Governors of Bengal' শীর্ষক সপ্তম অধ্যায়ে লিখছেন যে বাংলায় পাঁচজন লাট সাহেব ('Lord Saheb') আছেন বড়লাট, H. E. the Viceroy, ছোটলাট—Lieutenant Governor; লর্ড মেয়র সাহেব; লর্ড সেনাপতি সাহেব ও লর্ড বিশপ সাহেব। অতঃপর এই ছোটলাট সাহেবের প্রভাব প্রতিপত্তি বর্ণিত হয়েছে, 'The Lieutenant-Governor of Bengal rules over a kingdom containing so many thousand square miles and so many millions of people, that no person, of reasonable intellectual capacity ever tries to recollect the actual figures His dominion are not quite so extensive as the British realms, on which it is said that the Sun never sets, but the Sun gets up a long time earlier in the eastern portion of Bengal province than it does in the western portion of it, so huge is the extent of the territory' (p 32)। প্রসঙ্গতঃ Buckland সাহেব এই ছোটলাট-বাহাদুরের রাজার মতো বিলাস-বহুল জীবন যাপনের, অর্থাৎ তাঁদের বার্ষিক ১০ হাজার পাউণ্ড বেতন, প্রাইভেট সেক্রেটারী, A. D. C., স্পেশ্যাল ডাক্তার, তিনটে প্রাসাদ—চৌরঙ্গী, বেলভেডিয়ার ও দার্জিলিং, 'special train and State Carriages', প্রমোদ তরণী, 'Special yacht or state barge' ইত্যাদির লম্বা ফিরিস্তি দিতেও ভোলেন নি।

(১৪) বাঙালী-বিদ্বেষের ব্যাপারে বাংলার লেফটেনান্ট-গভর্নরদের মধ্যে অবশ্য পহেলা নম্বর বা সবার সেরা হলেন Sir Alfred Elliott (রাজত্বকাল ডিসেম্বর ১৮৯০—ডিসেম্বর, ১৮৯৫)। এবিষয়ে 'কলকাতা পুরশ্রী' পত্রিকার ১২ই ডিসেম্বর, ১৯৮১ সংখ্যায় মৎ রচিত 'কলিকাতার ছাত্রসমাজে বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ' প্রবন্ধটি দেখা যেতে পারে।

(১৫) ইংরেজ সাংবাদিক James Routledge, যিনি প্রায় ৫ বৎসর(১৮৭০-৭৫) ভারতে ছিলেন এবং বৎসর আড়াই বিখ্যাত 'Friend of India' নামক সাপ্তাহিক সংবাদ পত্রটি সম্পাদনা করেছিলেন, তিনি Campbell সাহেবকে ও তাঁর শাসন ব্যবস্থাকে খুব খুঁটিয়ে দেখে তাঁর সেই প্রত্যক্ষ-অভিজ্ঞতার যে বিশদ বিবরণ তাঁর 'English Rule and Native opinion in India' (London: 1878) গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন, সেখানে Campbell সাহেব সম্বন্ধে পাওয়া যায়, 'His views were clear, but his temper was uncompromising …he speedily acquired the character of an abrupt uncorteous man. His whole term of office was characterised by contention, not in the sense of wrangling, but of disputation In the Imperial Council where his sound views ought to have weight, his contentious tone and persistence did much to destroy the effect that his perception of facts created. As a statesman.……he was the least popular He left India with very little popular goodwill and very little goodwill of the English in Bengal' pp. 141-151.

(১৬) 'চাচা আপন প্রাণ বাঁচা' নীতি নিয়ে স্বাস্থ্যের অজুহাতে Campbell সাহেব যখন বাংলার গদি ছেড়ে মানে-মানে বিদায় নিচ্ছেন, তার পূর্বেই ক্যাম্বেলী অপশাসনের প্রায় সমস্ত দিক নিয়ে লেখা দশটি প্রবন্ধের সমবায়ে যে পুস্তিকাটি সাংবাদিক কৃষ্টদাস পাল প্রকাশ করেন, তার 'Adieu to Sir George' শীর্ষক নবম-দশম প্রবন্ধে Campbell সাহেব বাংলার অন্যান্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে 'English Community'-কে পর্যন্ত কি পরিমাণ উত্যক্ত, বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ করে তুলেছিলেন, তা দেখিয়েছেন। দ্রঃ 'The Life of the Hon'ble Rai Kristodas Pal Bahadur,

C. I. E.' (Calcutta, 1886) **Ramgopal Sanyal**, pp. 73-74.

(১৭) রাজনৈতিক চেতনায় ও চেষ্টায় বাঙালীদের আধিপত্য ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে সত্তরের দশকে বিশেষ ভাবে বিস্তৃত হয়। ভারত-বিদ্বেষী সাম্রাজ্যবাদী Sir Aucklad Colvin-শাসিত North-Western Province-এ এই সময়ে কোন পত্রিকায় বাঙালী-দের এই আধিপত্যের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে 'Bengali Baboos and India' নামক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যো-পাধ্যায় ১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দের ১৬ই মার্চ কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ থিয়েটার হলে 'Students' Association' আয়োজিত সভায় 'Indian Mutiny' শীর্ষক বক্তৃতায় ঐ-প্রবন্ধে বাঙালীদের সম্পর্কে নিক্ষিপ্ত আপত্তিকর মন্তব্যগুলির ভ্রম-প্রদর্শন ও তীব্র প্রতিবাদে বলেন, 'Now, gentlemen, I think I speak the sentiments of my educated countrymen, when I say that we Bengalees do not aspire to occupy the position of leaders. We are only anxious that the light which is in us, that the light under which we have basked for so many years, should spread over the whole of India and chase away that cimmerian darkness which has settled over the intellectual and moral atmosphere of this great country'.—'Speeches of Babu Surendranath Banerjea, 1876-80' (1880 edited by Ram Chandra Pailt. (p 59) এখানে সুরেন্দ্রনাথ ভারতের অন্যান্য প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত বাঙালীদের নেতৃত্বের সংবাদকে অস্বীকার করেন নি, তিনি বাঙালী-দের হেয় প্রতিপন্ন করার অপচেষ্টার পশ্চাদ্বর্তী জঘন্য মনোবৃত্তিকেই উদ্ঘাটন করেছেন। বাঙালীদের এই নেতৃত্বের কথা কয়েক বৎসর পরে H, J, S, Cotton লিখিত 'New India or India in transi-tion' (London, 2nd impression, 1886) গ্রন্থের ১৩ পৃষ্ঠায় অকুণ্ঠিত ভাবেই স্বীকৃত হয়েছে,—'The Bengalee Baboos now rule public opinion from **Peshawar to Chittagong**'.

(১৮) কয়েকজন উচ্চপদাধিষ্ঠিত ইংরেজের মন্তব্য এখানে সঙ্কলিত হোল :—

(ক) ১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দের ১৭ই আগষ্ট বড়লাট Lord Lawrence তদা-

নীস্তন 'Secretary of State'-কে লিখেছিলেন, 'We conquered India mainly by force, though policy and good government have largely aided us. In like manner we must hold it'.—'The Indian Middle classes' (1976) B.B. Misra, p. 372.

(খ) ১৮৭০ খ্রীস্টাব্দে 'Secretary of State' পদে অধিষ্ঠিত হয়েই Duke of Argyll ঘোষণা করেন ভারতবর্ষকে চিরকালীন দাস করে রাখাই আমাদের রাজনীতির সর্বপ্রধান উদ্দেশ্য। 'ভূদেব চরিত, ২য় ভাগ' (১৩৩০) মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়, (পৃ: ১১৮)

(গ) ১৮৭৭ খ্রীস্টাব্দে Lord Lytton লিখেছেন, We hold India as a conquered country…which must be governed in all essentials by the strong unchallenged hand of the conquering power '— The Emergence of Indian Nationalism'(1982) Anil Seal p. 140

(ঘ) 'As long as the Sun shines in the Heavens the British flag shall wave over those possessions' —'Some Curiosities of Petition Literature : East and west'(London, 1878) Col. W. F. B. Laurie, p. 5.

(ঙ) ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে মাদ্রাজের গভর্ণর M. E. Grant Duff ঘোষণা করেন, 'Great Britain were to govern India for all time'. 'The Emergence of Indian Nationalsim' (1982) Anil Seal, p. 178

(৭৯) 'The sympathy of officials generally and of the Anglo-Indian press was with Messrs. Cowan and Forsyth The Indian Press…raised its voice…in horror of what had happened'.
'Indian and Home Memories' (London, 1911) Sir Henry Cotton, p. 113.

(৮০) 'Kukas : the freedom fighters of the Punjab' (1965) M.M. Ahluwalia, p. 87.

(৮১) The actions of Cowan and Forsyth in blowing off sixty-five

people and hacking to pieces one in the short space of two days, though utterly illegal, were approved by the Punjab Government'.—'Kuka Movement' (1965) Fouja Singh Bajwa p. 107.

(৮২) 'Kukas : the freedom fighters of the Punjab' (1965) M.M. Ahluwalia, p. 87.

(৮৩) 'British Paramountcy and Indian Renaissance, Part II' (2nd edition, 1981) General Editor : R, C, Majumder, p 390. foot-note.

(৮৪) 'Mr, Forsyth was soon afterwards sent by Lord Northbrook on an important embassy and was Knighted'. 'English Rule and Native opinion in India' (1878) J, Routledge. p. 101.

১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দের শেষদিকে Sir. Douglas Forsyth-কে রাজপুতানায় 'Governor General's Agent' পদে নিয়োগ করার ব্যবস্থা হয়েছে দেখা যায়। দ্রঃ 'The Indian Mirror,' 17th October, 1875, p 5.

প্রায় এই সময়েই এর চেয়ে অনেক বেশি বীভৎস আর একটি ঘটনায় (যদিচ এরূপ ঘটনা অনেক আছে) ইংরেজদের সদাশয়তা কেমন ভাবে প্রকাশ পেয়েছিল, তা এখানে প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করছি। ১৮৬৫ খ্রীস্টাব্দে ইংরেজ-অধিকৃত Jamaica-তে সম্ভাব্য বিদ্রোহ ('supposed rebellion') দমনের ছুতোয় নারী-শিশু-বৃদ্ধ নির্বিশেষে হাজার হাজার নিগ্রোকে ইংরেজরা নৃশংসভাবে হত্যা করে। জামাইকার ইংরেজ গভর্ণর Edward John Eyre ছিলেন এই বীভৎস হত্যাযজ্ঞের প্রধান পুরোহিত। ইংল্যাণ্ডের সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ মাত্রেই এই হত্যাকাণ্ডের সংবাদে প্রথমে আঁৎকে উঠেছিল। ইংল্যাণ্ডের মানবতাবাদী সংস্থাগুলির (যেমন 'The Aborigines' Protection Society', 'The Anti-Slavery Society' প্রভৃতি) প্রচণ্ড আন্দোলনে ইংরেজ সরকার বাধ্য হয়ে কয়েকজন বিশিষ্ট ইংরেজ নিয়ে গঠিত একটি তদন্ত-কমিশনকে জামাইকাতে

পাঠায়। কমিশনের রিপোর্টেও অমানুষিক বীভৎসতার সংবাদ গোপন করা যায়নি—ফলে Eyre সাহেবকে ইংল্যাণ্ডে ফিরিয়ে আনতে হয়েছিল। অনেক চেষ্টা করেও Eyre-কে কোন রকম দণ্ড তো দেওয়া গেলই না, পরন্তু স্বজাতি প্রীতি বশে Eyre-এর কার্য সমর্থন করার লোকও দিনে দিনে বৃদ্ধি পেল। শেষাবধি 'মহামতি' Gladstone সাহেবের মন্ত্রিসভা ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দে 'decided on paying Mr, Eyre the which he had been put in defending himself against the various prosecution···The Jamaica Committee were deuounced by many voices, and in very unmeasured language, for what they had done',—'A history of our own times, Vol-IV' London: New illustrated edition, 1908) Justin McCarthy, p. 50.

(৮৫) 'অমৃতের অবশ্য একটা গূঢ়ার্থ আছে—অ্যাকোনাইট বা বিষ। সুতরাং পত্রিকার মালিকরা বললেন, অমৃতবাজার পত্রিকা বিষও অমৃত দুই-ই পরিবেশন করবে; উদার-পন্থীদের নিকট অমৃত, বিপরীত পন্থীদের নিকট বিষ।'—'মতিলাল ঘোষ' (১৯৭০) শচীন্দ্রলাল ঘোষ। অনুবাদিকা রত্না ঘোষাল। (পৃঃ ৬)

(৮৬) 'মহাত্মা শিশির কুমার ঘোষ' (২য় সংস্করণ, ১৯৭৬) অনাথনাথ বসু। (পৃঃ ৪৯)

(৮৭) ঐ, (পৃঃ ৯৫)

(৮৮) 'মতিলাল ঘোষ' (১৯৭০) শচীন্দ্রলাল ঘোষ। অনুবাদিকা রত্না ঘোষাল। (পৃঃ ১)

(৮৯) 'The Bengali Press' (1977) Smarajit Chakravarty, p. 184.

(৯০) 'The Emergence of Indian Nationalism' (1962) Anil Seal. (p. 204)

(৯১) 'History of Political thought: from Rammohun to Dayananda' (1934) Biman Behari Majumdar, p. 341.

(৯২) 'A Life of Ananda Mohan Bose' (1929) H.C. Sarker. p.35.

(৯৩) 'They first came accross each other in England about 1871, and it was there that Mr. Bose recommended to

his friend the life and writings of Mazzini, the study of which was first suggested to Mr. Banerjea'—'A Life of Ananda Mohan Bose' (1929) H. C Sarkar, p. 54.

(১৪) 'Rise of an Indian Public' (1977), Uma Dasgupta, p 65.

(১৫) 'Chronicle of the British Indian Association' (1966) ed. by P. N. Singh Roy, p. 51.

(১৬) বিভিন্ন কর-ভারে নিষ্পেষিত জনগণের করুণ অবস্থার চিত্র বৎসর তিনেক পরে মনোমোহন বসু (১৮৩১-১৯১২) লিখিত 'হরিশ্চন্দ্র নাটকে' (১৪ই ফেবরুয়ারী, ১৮৭৫) পুনরায় ফুটিয়ে তোলা হয়েছিল। এই সময়ে, ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দের 'Indian Budget'-এ আরো তিরিশ লক্ষ পাউণ্ড বাড়তি রাজস্ব আদায়ের যে প্রস্তাব Grand Duff ('Under Secretary of State') উপস্থাপিত করেন, তার প্রতিবাদ করতে উঠে ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দের ৬ই আগষ্ট House of Commons-এ Henry Fawcett তাঁর বক্তৃতায় ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ইংরেজদের ভুল ধারণা ভেঙে দিতে গিয়ে বলেন, 'Nothing has been a more fruitful source of serious evils than the opinion that is so prevalent in England that India is an extremely rich c untry.' ভারতবর্ষ যে ইতিমধ্যেই ইংরেজদের শোষণে দেউলিয়া হয়ে গেছে, তা নানা প্রমাণ দিয়ে দেখিয়ে তিনি ইংরেজদের সতর্ক করার জন্য বলেন, 'Let me earnestly entreat the House of Commons and the English nation not to delude themselves with the belief that such acts as these are not felt and are not commented upon by the Indian people. They are talked about, and they kindle a sense of injustice in millions of human breasts, and this sense of injustice it will require all our wisdom atd all our states monship to allay.' 'Speeches on some current Political 2nestion' (London, 1873), Henry Fawcett pp 38, 44.

(১৭) '...a person with even Re 1 profit per annum would not escapeit'. Rise of an Indian Public' (1977) Uma Dasgupta, p 70.

(৯৮) 'Along the affluent and the indigent Indians, Englishmen living in India were equally opposed to the income-tax. Not only were they united among themselves in opposing the tax, they also attracted a group of Indians of similar background and interests in a concerted effort to remove the tax. This effort took the shape of organised meetings in Calcutta and in Bombay'.—'Rise' of an Indian Public' (1977) Uma Dasgupta, p. 74.

(৯৯) Ibid, p. 76.

(১০০) 'Memories of my Indian Career, Vol-II' [London, 1893] Sir George Campbell, edited by Sir Charles E Bernard, p.27.

(১০১) 'Rise of an Indian Public'. (1977)—Uma Dasgupta pp. 234-236.

(১০২) Ibid, p. 235.

(১০৩) 'Bengal acted widely, to an extent even wildly'. Ibid, p. 237.

(১০৪) 'Report on the Administration of Bengal, 1872-73' (1874), p. 457.

(১০৫) এ ব্যাপারে সম্ভবত: 'The Hindoo Patriot' পত্রিকাই অন্যতম অগ্রণী ছিল। ঐ পত্রিকার সম্পাদক কৃষ্টদাস পালের জীবনী ['The Life of Hon'ble Rai Kristodas Pal Bahadur, C.I.E' (1886)] গ্রন্থে রামগোপাল সান্যাল লিখেছেন, 'Kristodas as a jouranlist opposed almost every measure taken by Sir. George Campbell during his administration in Bengal', p. 64., যে কারণে ১৮৭২-৭৩ সালের 'Annual General Report of the Presidency Commissioner'-এ Campbell সাহেব পত্রিকাটিকে 'ভণ্ড ও শত্রুভাবাপন্ন' ('The Lieutenant-Governor characterised the Hindoo Patriot as a pretentious paper cherishing ill-will towards Goverment') বলে উল্লেখ করেছিলেন। (পৃ: ৬৫)

(১০৬) 'Rise of an Indian Public' (1977) Uma Dasgupta, pp. 271-272.

(১০৭) 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ-সমাজ' (৩য় সংস্করণ) শিবনাথ শাস্ত্রী। (পৃ: ৩০৫)

(১০৮) 'The Emergence of Indian Nationalism' (1982) Anil Seal, p 269.

(১০৯) Ibid, p. 212.

'ছোটলাট বাহাদুরের সহানুভূতি পাইয়া হিন্দু ও মুসলমান প্রজাগণ জমিদারদিগের উপর বিদ্বেষপরায়ণ হইয়া উঠিয়াছিল।'—'মহাত্মা শিশিকুমার ঘোষ' (২য় সংস্করণ, ১৯৭৬) অনাথনাথ বসু। (পৃ: ৭৮)

(১১০) ঐ, পৃ: ঐ।

(১১১) 'An Indian Career, A Memoir. The Late Henry Woodrow Esq, Director of Public Instruction, Bengal'. (W. B. Whittingham & Co. 91, Grace Church street, London, 1877) p. 9.

(১১২) 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর' (মহর্ষির সার্ধশতবর্ষ পূর্তি উৎসব উপলক্ষে সংস্করণ, ১৯৭১) অজিতকুমার চক্রবর্তী। (পৃ: ৪২৮)

(১১৩) 'In September, 1872, the walls of Calcutta were placarded with an advertisement of a lecture to be given by the minister of the elder body of the Brahmists (termed the 'Adi Somaj'—Adi Church) on the superiority of Hindooism to all relgions.—'English Rule and Native opinion in India (London, 1878) James Routledge. p. 152.

(১১৪) 'নবযুগের সাধনা' (২য় সংস্করণ, ১৯১৩) কুলদাপ্রসাদ মল্লিক। (পৃ: ১০৪)

(১১৫) 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ-সমাজ' (৩য় সংস্করণ) শিবনাথ শাস্ত্রী। (পৃ: ৩০৭)

(১১৬) ঐ, (পৃ: ৩২২)

(১১৭) 'বাংলা থিয়েটারের বয়ঃসন্ধি ও ঠাকুরবাড়ির নাট্যালয়'—বিশ্বরঞ্জন সেনগুপ্ত। 'দেশ', ২২শে বৈশাখ, ১৩৮০।

(১১৮) 'Indlan and Home Memories' (London, 1911) Sir. Henry Cotton, p. 110.

(১১৯) সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ-শাসক ভারতসন্তানদের এই গুণটিকে যে কোন দিনই সহ্য করতে পারে নি, প্রসঙ্গতঃ প্রায় কুড়ি বৎসর পরের একটি ঘটনা থেকে তা উদ্ধার করে দেখানো যেতে পারে। প্রচণ্ড বাঙ্গালী-বিদ্বেষী ছোটলাট Sir Charles Elliott তাঁর রাজত্ব কালের (ডিসেম্বর ১৮৯০—ডিসেম্বর ১৮৯৫) প্রথম দিকে মৈমনসিংহের মুক্তাগাছার বিখ্যাত জমিদার সূর্যকান্ত আচার্যকে অপমানিত ও হেয় করবার জন্যে তাঁর বশংবদ জেলাশাসক H. A.D. Phillips-এর সঙ্গে যোগ-সাজসে তুচ্ছ কারণে (গৃহাদি সংস্কারের জন্য রাস্তায় কতকগুলি ইঁট-পাটকেল পড়ে থাকার জন্যে) সূর্যকান্তকে একেবারে সাধারণ আসামীর মতো আদালতের কাঠগড়ায় (dock) দাড করিয়ে ছাড়েন। ঘটনাটি নিয়ে পার্লামেণ্টেও প্রবল বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল। বিষয়টি সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে বিলাত থেকে প্রকাশিত 'India' পত্রিকার ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী সংখ্যার ৩২-৩৩ পৃষ্ঠায় 'A tall poppy in Bengal' শীর্ষক প্রবন্ধে তদানীন্তন 'সহকারী ভারত-সচিব' Sir John Crost-এর যে মন্তব্য উদ্ধার করা হয়েছে, তাতেই ভারত শাসন কর্তাদের সুচিরকাল অনুসৃত নীতিটি ধরা পড়েছে—'India Government has always hated and discouraged independent and original talent…in these modern times we dont lop or cut off the heads of the tall poppies, we take other and more merciful means of reducing any person of dangerous pre-eminence'. সুতরাং 'person of dangerous pre-eminence' না হলেও ভারতসন্তানদের মধ্যে 'original talent'-এর আভাস পাওয়া মাত্রই তাকে অঙ্কুরে বিনাশ করবার জন্যে সরকারী চক্রান্ত ভারতে ইংরেজ-রাজত্বের শেষ পর্যন্ত যে কি ভাবে সক্রিয় হয়ে উঠতো, তার বহু প্রমাণ আমাদের জানা আছে।

(১২০) 'মহাকবি রঙ্গলাল' (শ্রাবণ, ১৩৬৫) শিবলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। (পৃঃ ৫৫-৫৬)

(১২১) সম্পূর্ণ ঘটনাটির জন্য শিবলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মহাকবি রঙ্গলাল' গ্রন্থের ৫৫-৫৯ পৃষ্ঠা এবং মন্মথনাথ ঘোষের 'রঙ্গলাল' (১৩৩৬) গ্রন্থের ৪০৯-৪২০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(১২২) 'মনীষী ভোলানাথ চন্দ্র' (২য় সংস্করণ, ১৩৩৬) মন্মথনাথ ঘোষ। (পৃ ৭১-৭২)

(১২৩) 'বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্রের জীবনী' (১৮৯২) কালিপ্রসন্ন দত্ত। (পৃ. ১৭৮-১৭৯)

(১২৪) 'The Viceroy and Sir. George Campbell has appeared to clash from tho first…'.—'English Rule and Native opinion in India' (1878) J. Routledge, p. 147.

(১২৫) 'Reminiscences and Anecdotes of Great Men of India, Part-I' (Riddhi edition, 1980)—Ramgopal Sanyal. p. 25.

(১২৬) কাম্বেলী-শাসনের অপকর্মগুলির ফিরিস্তি দিয়ে কৃষ্টদাস পাল যে পুস্তিকা ('pamphlet') প্রকাশ করেন, তার নবম-দশম 'Adieu to Sir. George' প্রবন্ধে বাংলাদেশের জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষকে Campbell সাহেব কি ভাবে উত্যক্ত করেছেন, সেকথার সঙ্গে দেশের লোককে অপমান করার কথাটিও তিনি জানাতে ভোলেন নি, 'And lastly, he has been unpopular with thc educated classes of the native community, by pulling them down with a high hand, by fighting against their legitimate aspirations, by aspersing their character, and by prejudicing them in the estimation of the good and true'. 'The life of the Hon'ble Rai Kristodas Pal Bahadur, C.I.E' (1886) Ramgopal Sanyal, p. 75.

(১২৭) রেঙ্গুন থেকে ইডেন সাহেবের লিখিত পত্রটির তারিখ হোল—২৭ শে এপ্রিল, ১৮৭৩। ঐ পত্রে ইংরেজ 'Inspector of Schools' অপেক্ষা ভূদেবের কর্মশক্তির ভূয়সী প্রশংসা করে এক স্থানে ইডেন খোলাখুলি লিখেছেন, 'Bhudev has a fault and that is that he is a Bengalee'.

'ভূদেব চরিত' দ্বিতীয় ভাগ (১৩৩০) মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়। (পৃ. ৩৭)

(১২৮) 'To defeat the object of competitive system and to exclude the Bengalis, the Secretary of State introduced a Bill in Parliament in 1869. It became Act 33 Vict., C 3 in 1870'.—'The Indian Middle classes' (1978) B. B. Misra, p. 372.

(১২৯) 'It is true that Act XXXIII of 1870, while lying down the Principle that 'it is one of our first duties toward the people of India to guard the safety of our dominion', had provided for more extented employment of Indians in the uncovenanted Civil Service and for promotion therefrom to the Covenanted Service 'according to tried ability.' But such promotions were very rare and merely whelled rising generations'.— 'A History of the Indian Nationalist Movement' (London, 3rd edition, 1921) Sir Verney Lovett K. C S. I., p. 21.

(১৩০) 'Speeches by the Hon'ble Surendranath Banerjea, 1891-91, Vol-IV' (1894) Edited by Raj Jogeswar Mitter, p. 81.

(১৩১) 'English Rule and Native opinion in India' (1878) J. Routledge, p. 294.

(১৩২) 'Such discriminations and irresponsible actions of the ruling authorities, published in papers like the Amrita Bazar Patrika, exposed to the educated Indians the dark side of the British administration in India'.—'The Bengali Press' (1976) Smarajit Chakravarty, p. 181

(১৩৩) 'মনীষী ভোলানাথ চন্দ্র' (২য় সংস্করণ, ১৩৪৬) মন্মথনাথ ঘোষ। পৃ. ১৪৬।

(১৩৪) 'Indigenous Business enterprise in Bengal, 1780-1880' Chittabrata Palit. 'The Quarterly Review of Historical Studies, vol-VI, No. 4 (1966-67)

(১৩৫) 'The Indian Mirror', 10th August, 1873. p. 4.

(১৩৬) Ibid, 3rd August, 1873. p. 3.

(১৩৭) Ibid, 7th September, 1873, p. 4. Quoted from 'The Bengalee'.

(১৩৮) সেকালে শিক্ষিত ভারতবাসীরা এই ঘোষণাপত্রকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও সম্মানের বস্তু বলে জ্ঞান করতেন। সুরেন্দ্রনাথ তাঁর বহু বক্তৃতায় এই ঘোষণা পত্রকে ইংরেজদের 'Magna Carta'-র মত মর্যাদা দান করেছেন।

(১৩৯) 'The Indian Middle Classes' (1978) B. B Misra, p. 372.

(১৪০) মন্মথনাথ ঘোষের 'রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়' (১৩২৪) গ্রন্থে পাওয়া যায় যে দক্ষিণারঞ্জনের অনুরোধে শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লক্ষ্ণৌ এর 'তালুকদার সভা'-র এবং ঐ সভার মুখপত্র 'সমাচার হিন্দুস্থানী' পত্রিকার সহকারী-সম্পাদকপদে ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে যোগদান করেন এবং ১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে 'কোন অনিবার্যকারণবশতঃ উক্ত পদ ত্যাগ করিতে বাধ্য হন' (পৃঃ ১৫০–১৫২)। পক্ষান্তরে F. H. Skrine লিখিত শম্ভুচন্দ্রের জীবনী 'An Indian Journalist' (1895) গ্রন্থে পাওয়া যায় যে শম্ভুচন্দ্র ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ (খুব স্পষ্টভাবে সালটি অবশ্য উল্লেখ করা হয় নি) 'Secretary' হিসাবে সেখানের কর্মে যোগদান করেন এবং ১৮৬৪ খ্রীস্টাব্দে মুর্শিদাবাদের নবাব নাজিমের দরবারে উচ্চপদে (প্রথমে 'Political Adviser' ও পরে 'Dewan') যোগদান করেন এবং ঐ হিন্দুস্থান সমাচার' পত্রিকাটি ছিল 'সাপ্তাহিক' (পৃঃ ২৫) তবে মন্মথনাথের গ্রন্থে শম্ভুচন্দ্রের পদত্যাগপত্র থেকে মনে হয় শম্ভুচন্দ্র ১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দেই লক্ষ্ণৌ ত্যাগ করেছিলেন। যাই হোক, লক্ষ্ণৌয়ে অবস্থিতিকালে পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন স্থানে বসবাসকারী বাঙালীদের সম্পর্কে শম্ভুচন্দ্র যে প্রভূত অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

(১৪১) 'History of Political Thought: From Rammohun to Dayananda' (1934) Biman Behari Majumdar, pp. 323-24, foot-note.

(১৪২) ৪৩-সংখ্যক পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

(১৪৩) ৪১-সংখ্যক পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

(১৪৪) ৪২-সংখ্যক পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

(১৪৫) 'History of Political Thought: From Rammohun to Dayananda' (1934) B. B. Majumdar p. 325.

(১৪৬) 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' (৩য় সংস্করণ) শিবনাথ শাস্ত্রী। (পৃঃ ৩০৭)

(১৪৭) ১১৭-সংখ্যক পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

(১৪৮) প্রতিষ্ঠাবধি জাতীয়তাবোধ-উদ্বোধনে সাধারণ বঙ্গমঞ্চের বিশিষ্ট ভূমিকাটির কথা স্মরণ করে বিপিনচন্দ্র পাল তাঁর আত্মজীবনী 'Memories of My Life and Times' (1932) গ্রন্থে সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি জানিয়ে লিখেছেন, 'In the early years of the seventees of the last century before Surendranath and Anandamohan had organised their new platform, it was the Bengali stage which had found expression to the new spirit of patriotism among our rising generation of educated intellectuals'. p. 251.

(১৪৯) 'প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন।' 'বঙ্গদর্শন', পৌষ, ১২৮০। (পৃঃ ৪৮২)

(১৫০) 'প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা'। 'আর্যদর্শন', আষাঢ়, ১২৮১। (পৃঃ ১৫৩-১৫৪)

(১৫১) 'The Indian National Congress, vol-I' (1946) H. N. Dasgupta. p. 52.

(১৫২) কাব্যটির নামপত্রে (titlepage) 'দাসত্ব-শৃঙ্খল-'এর তলায় Sub-title হিসাবে মুদ্রিত চারি ছত্রের কবিতাটি এই: 'কল্পনে! নয়নে এ কি করি দরশন? / কোথায় আনিলে মোরে কারাগার মাঝে? / কেন গো বন্দিনী-আজি ভারত-জননী? / শোকে শীর্ণা (যথা সী' ‹ অশোক কাননে)।' কাব্যটি ১২৮৩ সালের পৌষ মাসে প্রক হলেও এটি যে তার অনেক আগেই রচিত হয়েছিল তা করবার প্রমাণ আছে। কাব্যটির শেষে কাব্যটি সম্পর্কে যে তুইল, তখনই

অভিমত মুদ্রিত হয়েছে, তার প্রথম অভিমতটির লেখকের নাম 'শ্রীজগন্মোহন শর্মা' এবং অভিমতটি রচনার তারিখ হোল, '৭ই পৌষ, ১২৮০'।

(১৫৩) 'The stike among the Gharrywans is not likely to last long. ·· It is said that a subscription of six annas will be raised from evry Gharrywan to meet the expenses of making a representation to Government in their behalf'.—'The Indian Mirror'. 19th October, 1873. p.5.

(১৫৪) 'It is this new-born zeal of the Police Magistrates since the accident to the carriage of the Lieutenant-Governor, that has set the metropoliton Jehus Into a flame and induced them to make a general strike'. 'The Indian Mirror', 19th October, 1873, p. 4

এই ঘটনার বৎসর দশেক আগে, প্রায়-সদৃশ কারণেই ১৮৬৪ খ্রীস্টাব্দের ১লা মার্চ থেকে ৩রা মার্চ পর্যন্ত তিনদিন কলকাতার ভাড়াটিয়া গাড়ির গাড়োয়ান ও পাল্কী-বাহকেরা ধর্মঘট ক'রে 'গভর্ণমেণ্ট নিকেতনের সম্মুখে গড়ের মাঠে' সমবেত হয়েছিল। কিন্তু তখনও পর্যন্ত ইংরেজ সরকারের সদাশয়তা বা মহানুভবতার প্রতি কিছু পরিমাণ শ্রদ্ধা থাকাতে সে সময়কার রাজভক্ত সংবাদ-পত্র সমূহ ঘটনাটির জন্য গাড়োয়ান ও পাল্কীবাহকদেরই দোষারোপ করেছিল। বিষয়টি বিস্তৃত ভাবে জানবার জন্যে 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার ১৪ই ফাল্গুন, ১২৭০ (২৫ শে ফেব্রুয়ারী ১৮৬৪) থেকে ৯ই চৈত্র, ১২৭০ (২২শে মার্চ, ১৮৬৪) পর্যন্ত সংখ্যাগুলি দেখা যেতে পারে।

(১৫৫) 'Rise of an Indian Public' (1977) Uma Dasgupta, p.29,272.

(১৫৬) 'The Emergence of Indian Nationalism' (1982) Anil Seal, p. 148

(১৫৭) Ibid, p. 132.

(১৫৮) 'মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ' (২য় সংস্করণ, ১৯৭৬) অনাথনাথ বসু। (পৃ. ৭২)

(১৫৯) 'Chronicle of the British Indian Association' (1966) Ed.by

P. N. Singh Roy, p. 70.

(১৬০) 'দর্পণ গোষ্ঠীর নাটকত্রয়ের ভূমিকা ও পটভূমিকা'—শৈলেন চৌধুরী। 'বিংশ শতাব্দী', শ্রাবণ, ১৩৬৩।

(১৬১) '১২৫ বছরের আলোয় মীর মশাররফ হোসেন'—সুজিতকুমার সেনগুপ্ত। 'দেশ', ৩০শে আষাঢ়, ১৩৮০।

(১৬২) 'Indian and Home Memories' (London, 1911) Sir. Henry Cotton, p. 125.

(১৬৩) English Rule and Native Opinion in India' (1878) J. Routledge, p. 212.

(১৬৪) ৪১-সংখ্যক পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

(১৬৫) '...a considerable portion remained unused'. 'Bengal under the Lieutenant-Governors, Vol-II' (1902) C. E. Buckland, p. 597.

(১৬৬) Memories of my Indian Career, vol-II' (1893) Sir. George Campbell. edited by Sir. Charles E. Bernard, p. 272. বাংলাদেশের সংবাদপত্রগুলির দংশনের জ্বালা যে Campbell সাহেব তখনও ভুলতে পারেননি, তার প্রমাণ তাঁর এই স্মৃতিকথায় ইতস্ততঃ অনেক ছড়িয়ে আছে, যেমন ৩১৪ পৃষ্ঠার এই অংশটি : 'We were good deal troubled by abusive and seditious attacks on the governing powers...No doubt the attacks were sometimes bad and scurrilous.'

(১৬৭) পার্লামেণ্টের এই বাদানুবাদের বিষয়টি উল্লেখ করতে গিয়ে Campbell সাহেব তাঁর আত্মস্মৃতি 'Memories of my Indian Career, Vol-II (1893)'-তে তাঁর অপদার্থতার কথা প্রকারান্তরে স্বীকার করেই ফেলেছেন দেখা যায়, 'It is curious to loo[illegible]
cussions in Parliament on th[illegible]
much in April, 1874, the Duke [illegible]
were obliged to defend us fron[illegible] [illegible] করবার
doing enough'. p. 301. [illegible] হল, তখনই

(১৬৮) 'Like an Ismaelite his (Compbel[illegible]

every body, and every body's hand aganist him. There is scarcely a class of this vast community with which he has not managed to be unpopular.' – 'The life of the Hon'ble Rai Kristodas Pal Bahadur, C. I. E' (1886), Ramgopal Sanyal, p. 74.

(১৬৯) 'Some Serious Reflections' (Bombay, 1881) George Abrigh Mackay, p. 85.

(১৭০) 'Many people in Bengal would be exceedingly glad to hear that Sir. Ashley Eden was about to be translated ; and the House of Commons would vote with acclamation for the deportation of Sir. George Campbell to Madras' —'Some Serious Reflections' (Bombay, 1881), George Aberigh Mackay, p. 124.

(১৭১) 'In the end, after a fierce and labourious term of office he (Campbell) left India with very little popular goodwill, and very little goodwill of the English in Bengal'.—'English Rule and Native Opinion in India' (1881) J. Routledge, p 144.

(১৭২) 'Freedom Movement in Bengal, 1818-1904, Who's Who' (1968) Compiler & Editor : Nirmal Sinha, p. 244.

(১৭৩) 'The life of the Hon' ble Rai Kristodas Pal Bahadur, C. I. E' (1886) Ramgopal Sanyal, p. 78.

(১৭৪) 'জাতীয়তার উন্মেষে সাময়িক পত্র'—যোগেশচন্দ্র বাগল। 'বিশ্বভারতী পত্রিকা', মাঘ-চৈত্র, ১৩৫৮।

(১৭৫) মাত্র কয়েক মাস পরেই একটা বিশেষ ঘটনার উপর সম্পাদকীয় মন্তব্য করতে গিয়ে 'Indian Daily News'-এর মতো ইংরেজ-ঘেঁষা পত্রিকাটিও শ্বেতাঙ্গ রাজকর্মচারীদের চূড়ান্ত অযোগ্যতার কথা স্বীকার

(১৮ না করে পারেনি। বরোদার গায়কোয়াড় মলহর রাওয়ের পদচ্যুতি-

র ঘটনার নাটের গুরু Col. Phayre-কে বরোদার 'Resident'-

১৭৭) 'Cৗনিয়োগ করবার জন্যে বোম্বাইয়ের গভর্ণর Sir Philip Wode-

house যে ওকালতি শুরু করেছিলেন, তারই উপর মন্তব্য করতে গিয়ে পত্রিকাটির ১৮৭৫ সালের ১৭ই জুলাই তারিখের সংখ্যায় সম্পাদকীয়তে ব্যঙ্গের সঙ্গে লেখা হয়েছিল, 'The excuse given by Sir. Philip Wodehouse, Governor of Bombay,for retaining Col. Phayre in his post at Baroda, long after he (Col. Phayre) had satisfactorily proved his utter incapacity, appears to us to deserve a little more attention than it seems to have received in this country.···No doubt···Col. Phayre was a rather more competent official than it would be possible to come accross every day.···If the Baroda Scandal had never occured, Colonel Phayre would some day have into an honoured grave, full of glory and renown, and it would have been considered the correct thing for his heirs to tell pleasant untruths regarding him in an epitaph. He was how ever, found out, and is ruined. A hundred other officers, more or less in important positions, and probably quite as incompetent positions, and probably quite as incompetent as Col. Phayre,···they have friends and relatives to think so (there are so suitable posts them) that they are retained in posts for which they are known to be unfit. We confess that we do not at all approve of Sir. Philip Wodehouse's principle of filling up important appointments. but we may just give a hint to those who may intend to grow more indignant over the matter, and it is—that the Principle is acted upon every day through out India.'

(১৬) 'মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ' (২য় সংস্করণ, ১৯৭৬) অনাথনাথ বসু (পৃ: ৭৬-৭৭)

(১৭) পদচ্যুতির প্রাক্কালে সুরেন্দ্রনাথের সামান্য অপরাধের বিচার করবার জন্যে যেভাবে আড়ম্বরের সঙ্গে বিচার কমিশন বসানো হচ্ছিল, তখনই

এদেশের লোকের বুঝ্‌তে বাকি ছিল না যে আমলাতন্ত্র পূর্ব অপমানের (বেশি বয়সের অজুহাতে সুরেন্দ্রনাথকে I. C.S. পদ লাভের অযোগ্য বিবেচনা করলে সুরেন্দ্রনাথ বিলাতে আদালতের সাহায্য নিয়ে আমলাতন্ত্রের চক্রান্ত ব্যর্থ করেন ও কভেনেণ্টেড চাকুরি আদায় করেন) প্রতিশোধ নেবার জন্যে সুরেন্দ্রনাথকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করার ব্যবস্থা করেছে। ১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দের ১২ই অকটোবর তারিখে 'The Indian Mirror' পত্রিকায় সেকথাই লেখা হয়েছিল, 'Babu Surendranath Benerjee, C. S., is a Bengali Civilian and not certainly a Wahabi. We are led into this remark because with Mr. O' Kinseley as a prosecutor and Mr. Princep as one of the Commissioners—will not the trial of Babu Surendranath Banerjee, C. S., look very much like the Wahabi Trial at Patna ? The name of the Military Commissioner has not yet been transpired The nomination of Sir. Renyonalls as one of the Commissioners, is unexceptionable'. p. 4.

(১৭৮) 'সুরেন্দ্রবাবু যেরূপ সামান্য অপরাধে কর্মচ্যুত হইলেন, ইংরাজ সিভিলিয়ানরা ইহার অপেক্ষা গুরুতর অপরাধ করিয়াও উন্নতিলাভ করিয়া থাকেন। এই সকল অবিচারেই ইংরাজদিগের প্রতি সাধারণের অভক্তি হয়।...সুরেন্দ্রবাবুর দোষ অপেক্ষা লিবিন সাহেবের দোষ অনেক গুরুতর। বোধহয় লিবিন সাহেব এবার কমিশনার হইবেন।' 'সুলভ সমাচার', ৩০ শে বৈশাখ, ১২৮১।

(১৭৯) 'মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ' (২য় সংস্করণ, ১৯১৬) অনাথনাথ বসু। (পৃঃ ৭৭)

(১৮০) 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস' (৫ম সংস্করণ ১৩৮৬) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। (পৃঃ ১০৬-১২৫)

(১৮১) 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি' (ফাল্গুন, ১৩২৬) বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়। (পৃঃ ১৪১)

(১৮২) 'The Indian Mirror', 19th October, 1873.

(১৮৩) 'হুগলী কলেজের ব্যায়ামশিক্ষক শ্রীশ্যামাচরণ ঘোষ প্রণীত' 'ব্যায়াম

শিক্ষক, ১ম ভাগ' ১২৮২ সালে প্রকাশিত হয়। Bengal Library Catalogue অনুসারে গ্রন্থটির প্রকাশের সঠিক তারিখ হোল ২৫শে জানুয়ারী, ১৮৭৬ (1st. quarter ending 28th March, 1876, pp. 8-9) এবং গ্রন্থটি উৎসর্গীত হয় 'R· Thwaytes Esqr· M. A. Principal, Hooghly College'.

(১৮৪) 'ভূদেব চরিত, ২য় ভাগ (১৩৩০) মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়। (পৃঃ ৫৩)

(১৮৫) 'জ্যোতিরিন্দ্র নাথ' (১৯৬০) সুশীল রায়। (পৃঃ ১৪, ১৪৫)

(১৮৬) 'My case excited very strong feeling in the Indian Community' —'A Nation in Making' (2nd impression, 1925) S. N. Banerjea p. 29.

(১৮৭) 'বিপ্লবী বাঙ্গালা বা স্বাধীনতার ইতিহাস' (১৯৪৯) রাজেন্দ্রলাল আচার্য। (পৃঃ ৭০)

'Surendranath's dismissal caused a pro-found sensation— it being deplored by his countrymen as a national calamity.' 'Raja Digumber Mitra. His life and career. vol-II' (1906) Bholanath Chander, p. 82.

(১৮৮) 'আমাদের কালের কথা' (চট্টগ্রাম, ২য় সংস্করণ, ১৩৮২) সৈয়দ মুর্তাজা আলি। (পৃঃ ১১০) এই সময়ে বিপিনচন্দ্র পাল শ্রীহট্টে ছিলেন—তিনি তখন প্রবেশিকা শ্রেণীর ছাত্র। শ্রীহট্টের আসাম-ভুক্তির ব্যাপারটি স্বচক্ষে দেখে পরবর্তী কালে 'প্রবাসী' পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে (মাঘ ১৩৩৩-বৈশাখ ১৩৩৫) প্রকাশিত 'সত্তর বৎসর' রচনায় লিখেছেন, '১৮৭৪ ইংরাজীতে শ্রীহট্ট বাংলার শাসন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নবপ্রতিষ্ঠিত আসাম শাসনের এলাকাভুক্ত হয়। শ্রীহট্টের শিক্ষিত সমাজ এই ব্যবস্থার গুরুতর প্রতিবাদ করেন। আমার বাবা প্রতিবাদীগণের অগ্রণী ছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের এই প্রতিবাদ অগ্রাহ্য হয়।' 'প্রবাসী', ভাদ্র, ১৩৩৪। (পৃঃ ৬৫৬)

(১৮৯) 'History of Freedom Movement in India, vol-1' (1971) R. C. Majumder, p 325

(১৯০) 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ-সমাজ' (৩য় সংস্করণ) শিবনাথ শাস্ত্রী। (পৃঃ ৩২৭)

(১৯১) 'Raja Subodh Chandra Mallik and his times'—Amalendu

Dey. 'Bengal Past and Present' Vol-XCIII Part-II No. 187, July—December, 1979. p. 137.

(১১২) 'গত ১৭ই কার্তিক (১২৮১) রাত্রি ১০টায় মেল ট্রেনযোগে আনন্দমোহন বসু হাবড়ায় আসিয়া উপস্থিত হন।'—'সুলভ সমাচার', ২৫শে কার্তিক (মঙ্গলবার), ১২৮১। (পৃঃ ৬৩০)

(১১৩) মলহর রাওয়ের পক্ষ সমর্থনকারী প্রধান কৌঁসুলী, বিলাতের বিখ্যাত ব্যারিস্টার Serjeant Ballantine তাঁর স্মৃতিকথা 'Some experieneces of A Barrister's Life (London, A New and Revised edition being the sixth, 1882) গ্রন্থে এ বিষয়ে তাঁর সুদৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করেছেন, 'My own deliberate and well-considered belief is that Colonel Phayre was subjected to no real attempt to be poisoned, but I think that certain persons were anxious to retain him in the Residency, and to defeat the endeavour of the Gaekwar to get him turned out, and suppossed that the alleged attempt would have the effect'. (p. 438) পরেও তিনি আবার বলেছেন, '.. the evidence in the case was followed with greatest attention, and opinion was, as far as I have seen, unanimous that it was most unsatisfactory and unreliable'. (p. 442)

সারা অষ্টাদশ ও উনবিংশ, দুটি শতক ধরে ইংরেজরা তাদের রাক্ষসে ক্ষুধা মিটাবার এবং ইংল্যাণ্ডের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপ কমাবার তাগিদে পৃথিবীময় উপনিবেশ স্থাপনের জন্য কিরূপ ছল, বল ও কৌশল প্রয়োগ করতো, তার একটা প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় Richard Cobden (1804-1865) এর ১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত 'How wars are got up in India' পুস্তিকায়। [এটি ১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দে ২য় খণ্ডে প্রকাশিত 'The Political Writings of Richard Cobden' এর দ্বিতীয় খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯০৩ খ্রীস্টাব্দে খণ্ড দুটির চতুর্থ সংস্করণ লণ্ডনের T. Fisher Unwin' কোম্পানী দ্বারা প্রকাশিত।] ১৮৫১ খ্রীস্টাব্দের জুন ও আগস্ট মাসে ইংরেজদের 'Monarch' ও 'Champion' নামক দুটি যুদ্ধ জাহাজের অপকর্মের জন্য বর্মা-সরকার

৯২০ পাউণ্ড খেসারত আদায় করেন। এই সামান্য ছুতোতেই ১৮৫২ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে বর্মাযুদ্ধ করে ইংরেজরা রেঙ্গুনে ঘাঁটি গেড়ে বসে গেল এবং অচিরে ব্রহ্মদেশ গ্রাস করলো।

Col. Phayre ও প্রথমে যে কৌশল অবলম্বন করেছিলেন, তা ধোপে টেঁকেনি বলেই ইংরেজ সরকারকে বলপ্রয়োগ দ্বারা মলহর রাওকে উৎখাত করতে হয়েছিল। কৌশল, Phayre-এর বা ইংরেজ জাতির মজ্জাগত হলেও, কিছুদিন আগে ভিন্ন দেশে, ভিন্ন পরিবেশে আর একজন পদস্থ ইংরেজ কর্মচারীর ঘটনা থেকেই সম্ভবতঃ উৎসাহের আতিশয্যে, মাত্রা বোধ হারিয়ে, Phayre সাহেব তড়ি-ঘড়ি কৌশলটিকে গ্রহণ করে ছিলেন। এখানে পার্থক্য হোল পূর্বের ক্ষেত্রে, ঘটনাটি ছিল প্রকৃত অর্থাৎ সাজানো নয় এবং তার জন্যে প্রাণবলিও হয়েছিল, আর এক্ষেত্রে Phayre সাহেব ভেবেছিলেন তালে-গোলে জাতভাইদের সহায়তায় তিনি বাজিমাৎ করে দিতে পারবেন। পূর্বের ঘটনাটি সংক্ষেপে হোল এই—ইংরেজ Sir. John Bowring (1792-1872), যিনি যৌবনে ফরাসী বিপ্লব ও প্রজাতন্ত্রের সমর্থক ছিলেন এবং জেল খেটেছিলেন, যিনি বিখ্যাত Jeremy Bentham-এর অত্যন্ত প্রিয় পাত্র ছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে ১৮২৪ খ্রীস্টাব্দে 'Westminister's Review' পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন, তিনি ইংরেজ সরকারের বিশেষ কর্মভার নিয়ে পাঁচের দশকে Hong-Kong-এ গিয়েছিলেন। জাহাজে মালপত্র বহন করবার ন্যায্য অধিকার ('license') ১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দের শেষ দিকে ফুরিয়ে গেলেও তিনি 'Canton'-এর প্রচলিত নিয়ম ভেঙে গায়ের জোরে ঐ কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন। এতে চীন সরকারের কর্মকর্তারা ('mandarins') ক্ষিপ্ত হয়ে Bowring-সাহেবের মাথার জন্যে পুরস্কার পর্যন্ত ঘোষণা করে। ফলে ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে রুটির সঙ্গে আর্সেনিক বিষ মিশিয়ে সমস্ত পরিবার সহ তাঁকে হত্যার চেষ্টা করা হয়। এতে তাঁর পত্নীর অবস্থা এত শোচনীয় হয়ে পড়ে যে তাঁকে ইংল্যাণ্ডে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হয় এবং সেখানেই তাঁর পত্নীর মৃত্যু ঘটে। 'The Dictionary of National Biography, Vol-II' (Reprinted, 1973). p. 987.

(১২৪) বরোদার ইংরেজরা কেমন সুপারিকল্পিত ভাবে সামান্য সামান্য বিষয়েও

মলহর রাওকে অপমান করে আসছিল. তার একটা উদাহরণ ১২৮৯ সালের ১১ই কার্তিক (২৮শে অক্টোবর, ১৮৭৪—বিষ প্রয়োগ সংবাদ প্রকাশিত হবার ৭দিন পূর্বে) 'সুলভ সমাচার' পত্রিকা থেকে পাওয়া যায়। সাত মাস পূর্বে লক্ষ্মীবাঈ নাম্নী এক সধবা মহিলাকে মলহর রাও বিবাহ করেন এবং তাঁর ঔরসে লক্ষ্মীবাঈয়ের গর্ভে একটি পুত্র-সন্তান জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু বরোদাব 'Agent' Sir. Lewis Pelly সামান্য ছুতোয় (অর্থাৎ পেলীর ধারণা সন্তানটি লক্ষ্মীবাঈয়ের পূর্ব স্বামীর ঔরসজাত) সংবাদটি বোম্বাইয়ের গভর্ণরকে জানালেন না এবং গায়কোয়াড়কে অপমান করবার জন্যে নিয়ম-মাফিক তোপধ্বনিও করলেন না। এই সংবাদটি দিয়ে 'সুলভ সমাচার' মন্তব্য করেছে, 'ইংরেজরা যখন বড বড রাজারাজড়াকে অনায়াসে অপমান করিতে পারে, তখন আমবা কোন্ ছার ?' বরোদারাজকে এই ভাবে দিনের পর দিন অপমান করার সংবাদ প্রকাশিত হতে থাকলে অনেক রাজ-ভক্ত পত্রিকাতেও বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এবিষয়ে ১২৮১ সালের মাঘ-ফাল্গুন সংখ্যা 'বামাবোধিনী' পত্রিকাব 'নূতন সংবাদ' (পৃঃ ৩৫৪-৩৫৫) অংশটি দ্রষ্টব্য।

(১৯৫) Col. Phayre ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই মার্চ বরোদার 'Resident' পদে যোগদান করা ইস্তক নানাভাবে প্রাতনিয়ত মলহর রাওকে অপমান ও অপদস্থ করার চেষ্টা করতে থাকেন। ফলে বিপর্যস্ত নিরুপায় মলহর রাও Col Phayre-কে ঐ পদ থেকে সরিয়ে নেবার জন্যে একাধিকবার ভারতসবকারকে অনুরোধ করেছিলেন। মলহর রাও তাঁর যথেচ্ছ কাজকর্মের প্রধান বাধা হওয়ায়, বিশেষতঃ তাঁকে অপসারণের জন্য চেষ্টা করছেন দেখে মলহর রাওয়ের উপর Phayre এর প্রচণ্ড ক্রোধ জন্মায়। জাত-সাম্রাজ্যবাদী Phayre অতঃপর একঢিলে দুটো পাখী মারবার জন্যে, অর্থাৎ মলহর রাওয়ের উপর প্রতিশোধ নেওয়া এবং স্বাধীন বরোদা রাজ্যকে গ্রাস করবার উপযোগী সুযোগ তৈরী করা, যার পিছনে ইংরেজ আমলাতন্ত্রেব সক্রিয় সমর্থন ছিল (আসলে Phayre-কে এই কাজ করতেই বরোদার Resident করা হয়েছিল, তাই অনুরোধ সত্ত্বেও তাঁকে সেখান থেকে সরানো হয়নি, বিষপ্রয়োগের অভিযোগ সাজানো ধরা পড়লেও তাঁর কোন সাজা হয়নি বা চাকুরি

যায়নি, পরন্তু তাঁর অচিরে সিন্ধু-প্রদেশের 'Political Agent'-রূপে পদোন্নতি হয়েছিল) এবং এজন্য বিষ-প্রয়োগের একটা আষাঢ়ে গল্প ফেঁদেছিলেন, যা ধোপে টেঁকেনি এবং মলহর রাওকে রাজ্যচ্যুত করবার জন্য ইংরেজ সরকারকে আবার একটা অজুহাত খাড়া করতে হল, মলহর 'রাজ্য শাসনের অযোগ্য'।

(১৯৬) মনে রাখা দরকার শিশিরকুমার ঘোষ যখন ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে এই সব লিখছেন, তখন পর্যন্ত মলহর রাওয়ের বিচার-প্রহসন শুরুই হয়নি (এটি শুরু হয় ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই ফেব্রুয়ারী থেকে) এবং বিষ-প্রয়োগে হত্যার চেষ্টা-রূপ অভিযোগটি যে সম্পূর্ণরূপে সাজানো এবং তাহা মিথ্যা এটিও জানা যায়নি। সুতরাং তখন পর্যন্ত প্রচলিত ধারণাকে অবলম্বন করেই শিশিরকুমার এই সব কথা লিখেছেন।

(১৯৭) 'The press in England almost universally demurred to his (Phayre's) evidence as unsatisfactory.'—'Some Experiences of A Barrister's life' (London. 6th edition, 1882) Serjeant Ballantine, p 433.

(১৯৮) এবিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার জন্য উমা দাশগুপ্তের 'Rise of an Indian Public' (1977) গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায় 'The Baroda Affair' দ্রষ্টব্য।

(১৯৯) 'Hem Chandra Mallik (1855–1906) came forward as leader of the Defence Committee formed in Calcutta in support of Malhar Rao Gaekwar. In 1875, the educated in Calcutta firmly defended the cause of Malhar Rao of Baroda when the Government of India, under the direction of Lord Northbrook, set up a Commission for Malhar Rao's trial'.—'Raja Subodh Chandra Mallick and his times' Amalendu De. 'Bengal Past and Present', vol. XC VIII, Part II, No. 187, July—December, 1979, p. 33.

(২০০) গায়কোয়াড়ের পক্ষে তাঁর সলিসিটার সংস্থা 'Messrs. Jefferson and Payne' মামলা চালাবার জন্যে দুলক্ষ উননব্বুই হাজার সাতশ'

টাকা ব্যয়ের যে হিসাব-তালিকা ভারত-সরকারের কাছে পেশ করেছিল. তার মধ্যে গাড়ি-ভাড়া, খাওয়া-দাওয়া, টাইপ, টেলিগ্রাম ইত্যাদি আনুষঙ্গিক সকল খরচ বাদ দিয়ে কেবলমাত্র আইন-জীবীদের দক্ষিণার পরিমাণ ধরা হয়েছিল প্রায় ১লক্ষ ৭০ হাজার টাকা। সম্পূর্ণ তালিকাটি 'The Indian Mirror' পত্রিকার ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দের ১৪ই ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় (পৃঃ ১—২) প্রকাশিত হয়েছিল।

(২০১) ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসী-নীতি সম্পর্কে তখন দেশের শিক্ষিত সমাজ এতদূর নিশ্চিত হয়েছিল যে এই 'কমিশন'-কে একটা বিচার প্রহসন বলে বুঝতে তাদের দেরী হয়নি। আসলে বরোদা রাজ্যকে গ্রাস করবার জন্যেই যে চতুর ইংরেজ এইভাবে ঘটনাটিকে সাজিয়ে তুলছে, এটা ইঙ্গিত করে ১২৮১ সালের ২রা অগ্রহায়ণ তারিখের 'সুলভ সমাচার' পত্রিকা লেখে, 'লক্ষ্মীবাঈয়ের সন্তানকে গুইকোয়ারের সন্তান বলিয়া স্বীকার না করাতে বিষ খাওয়ানো হইয়াছে বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন। গুইকোয়ারকে বিপদে ফেলিতে যেরূপ চেষ্টা হইতেছে, তাহাতে ইহা অপেক্ষা ভয়ানক দোষের কথা প্রকাশিত হওয়া অসম্ভব নহে। অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া একজন স্বাধীন রাজাকে দোষী করা উচিত নহে'। (পৃঃ ৬৩৩)

(২০২) ছলে-বলে-কৌশলে, যেভাবেই হোক মলহর রাওকে তাড়াতেই হবে, এই ছিল ইংরেজ শাসনকর্তাদের কিছু দিনের ইচ্ছে। তাই মলহর রাওয়ের বিচার কার্য শুরু হবার মাসাধিক পূর্বেই 'ভারত সচিব' Lord Salisbury 'বড়লাট' Lord Northbrook-কে সেকথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে লিখেছিলেন, 'We are anxious that whatever course you take at Baroda, it should be sufficiently penal to deter Princes from so simple a plan for changing their Residents'. উমা দাশগুপ্তের 'Rise of an Indian Public' (1977) গ্রন্থের ২১৭ পৃষ্ঠা থেকে উদ্ধৃত।

(২০৩) এই সময়ে কোন কোন পত্রিকাতে অভিযোগ প্রকাশিত হয়েছিল যে বরোদার 'Resident' Col. Phayre ও তাঁর শ্বেতাঙ্গ সাঙ্গোপাঙ্গের-দল বরোদার অধিবাসীদের মলহর রাওয়ের বিরুদ্ধে বিষিয়ে তোলার জন্যে বহুদিন ধরেই গোপনে গোপনে উস্কানী দিয়ে

আসছিলো। এ অভিযোগ যে মিথ্যা নয় তার পরোক্ষ প্রমাণ রয়েছে মলহর রাওয়ের পক্ষ-সমর্থনকারী ব্যারিস্টার Serjeant Ballantine-এর স্মৃতিকথা 'Some experiences of A Barrister's Life' (London, 6th edition, 1882) গ্রন্থে, যেখানে তিনি রাজভক্ত বরোদা-বাসীদের দ্বারা তাঁর বিপুল অভ্যর্থনার কথা বলেছেন, 'I can not doubt that the Gaekwar or Guicowar was popular amongst the native population from the reception that I met with' p. 421. এছাড়া কমিশনের বিচার-কার্যকালে যে সপ্তাহ তিনেক তিনি বরোদায় ছিলেন, সেই সময়কালে মলহরের শোকে শহরের সমস্ত দোকান পাট বন্ধ এবং শোকগ্রস্ত অধিবাসীদের করুণ অবস্থাও তিনি দেখেছেন, 'I never saw a smile upon countenance or heard a sound of gaiety.' p. 425.

সুতরাং মলহর রাওকে প্রচণ্ড প্রজাপীড়ক শাসকরূপে ইংরেজরা যে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছিল এবং শেষাবধি অযোগ্যতার বদনাম দিয়ে গদিচ্যুত করেছিল, তার সবটাই ছিল মিথ্যা। যদি মলহর রাও অযোগ্য এবং প্রজাপীড়ক রাজাই হবেন, তাহলে ইংরেজরা বরোদাবাসীদের হঠাৎ বিদ্রোহী হয়ে ওঠার ভয় পেয়েছিল কেন? [অবশ্য গ্রামাঞ্চলে কোথাও কোথাও প্রজারা ইতিমধ্যে ইংরেজকে কর (tax) দেবে না বলে শাসিয়ে ছিল এবং অস্ত্রশস্ত্র বাগিয়ে বিদ্রোহ করবার উপক্রম করেছিল। সে কারণে তাদের শায়েস্তা করবার জন্যে সৈন্য পাঠাতে হয়েছিল বলে ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দের ১৫ই এপ্রিলের 'The Indian Mirror' পত্রিকা থেকে জানা যায়।] কেনই বা বরোদাবাসীকে ধোঁকা দিয়ে (এলাহাবাদের নাম করে পূর্ব-নির্ধারিত মাদ্রাজে), গোপনে এবং প্রচুর শ্বেতাঙ্গ সেনায় পূর্ণ স্পেশাল ট্রেনযোগে মলহর রাওকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল? রাজ্যশাসন করতে গেলে রাজাকে কিছু কিছু কঠোর কার্য করতেই হয়। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন কোন রাজার নাম পাওয়া যাবে না, যাঁর রাজ্যে সকল প্রজাই সুখী ও সন্তুষ্ট ছিল, রাম-রাজত্বেও অসুখী লোকদের সন্তুষ্টির জন্য সীতাকে বিসর্জন দিতে হয়েছিল। মলহর রাও অবশ্যই ধোয়া তুলসীপাতা ছিলেন না এবং তাঁর পারিবদবর্গও যে কিছু অন্যায় কাজকর্ম না

করেছিলেন, এমন নয়। তবে এখানে মনে রাখতে হবে যে বিষপ্রয়োগের সাজানো গল্পের কিছু আগে পর্যন্ত মলহরের 'দেওয়ান' পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন স্মরণীয় পুরুষ দাদাভাই নৌরজী (১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে নৌরজী এই পদে যোগদান করেছিলেন), যাঁকে হটাবার জন্যে Phayro সাহেব প্রায় উঠে-পড়ে লেগেছিলেন। Phayre-এর পরামর্শ না নিয়ে বা তাঁকে টপ্‌কিয়ে মলহর রাও নৌরজীকে দেওয়ান করেছিলেন, শুধুমাত্র এই কারণেই নয়, মলহরের মতো নৌরজীও Phayre ও তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদের যথেচ্ছাচার তথা বরোদাকে শুষে খাবার পথে অন্তরায় হয়েছিলেন—নৌরজী তথা মলহর রাওয়ের উপর Phayre এর আক্রোশের এই হল প্রধান কারণ। তা নইলে আমাদের বুঝতে হয় মলহরের মতো নৌরজীও ছিলেন অযোগ্য ও প্রজাপীড়ক। কিন্তু ঘটনা তা নয়, নৌরজীর কর্মতৎপরতায় বরোদা-রাজ্যের অনেক উন্নতি হয়েছিল ইতিহাস এই সাক্ষ্যই দেয়।

(২০৪) 'The deposed Prince was promptly and secretly removed to Madras, and the threatened outbreak of popular feeling at Baroda was quieted by the immediate installation as Gaekwar of a child prince of the royal house.'—History of British India: Under the Company and the Crown' (London. 1927), P. E Roberts, p 423.

(২০৫) 'Reuter's Telegram, Bombay, April 24—The Gaekwar was deported yesterday by special train under European guard of soldiers to Allahabad. It is remoured that he will be imprisoned at the fort of Chunar'.—'The Indian Mirror', 25th April, 1875.

(২০৬) 'The right thing was done, but the manner of doing it was questionable'.—'Thomas George, Earl of Northbrook. A Memoir'. (London, 1908) Bernard Mallet, p. 97.

(২০৭) বরোদা-রাজ্যের আয়তন ও লোকসংখ্যা সম্পর্কে Serjeant Ballantine তাঁর 'Some experiences of A Barrister's Life' গ্রন্থের ৪২৯ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, 'The monarch of a country

embracing 4400 square miles and containing a population of 5000 persons to each mile'. পক্ষান্তরে উমা দাশগুপ্ত 'Gazetter of the Bombay Presidency, vol-7, Baroda (Bombay 1883), pp.1.48' থেকে তথ্য সংগ্রহ করে, তাঁর 'Rise of an Indian Public' (1977) গ্রন্থের ১২০-১২১ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, 'Baroda was the largest independent native state in Western India, with an area about 8100 square miles and a population of 1950000 in 1900'. উৎস হোল '১৮৮৩', কিন্তু হিসাব দিয়েছেন '১৯০০'-এর !

(২০৮) 'Roll of Honour' (1965) Kalicharan Ghosh, p. 28.

(২০৯) 'শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়'—মন্মথনাথ ঘোষ। 'পুরশ্রী', ২৬শে জানুয়ারী, ১৯৮০। (পৃঃ ১০৬৩)

(২১০) 'When it came out, it created a great sensation'.—'An Indian Journalist : Being the Life, Letters and Correspondence of Dr. Sambhu Chandra Mukhejee' (Calcutta, 1895) F. H. Skrine. p 36.

(২১১) 'মহাত্মা শিশির কুমার ঘোষ,' (২য় সংস্করণ, ১৯৭৬) অনাথনাথ বসু। (পৃঃ ১৬০)

(২১২) শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ছাড়া বাকি ৯জন বাঙালী হলেন—যদুনাথ ঘোষ, মন্মথচন্দ্র মল্লিক, হেমচন্দ্র মল্লিক, যোগেশচন্দ্র দত্ত, দেবেন্দ্রনাথ দত্ত, প্রবোধচন্দ্র মল্লিক, উপেন্দ্র চন্দ্র দত্ত, নরেশচন্দ্র দত্ত ও ভানুচন্দ্র দত্ত। সাংবাদিক কৃষ্টদাস পাল এঁদের 'Immortal Ten' আখ্যা দিয়েছিলেন।

(২১৩) 'Bengal under the Lieutenant-Governors, Vol-I' (2nd ed. 1902) C. E. Buckland, p. 632.

(২১৪) Ibid, p. 638.

(২১৫) আলোচ্য সময়কালের কিছু পরে Sir. Henry Cotton আসামের Chief Commissioner' রূপে কয়েক বৎসর আসামে ছিলেন এবং ঐ সময়কালে চা-কুলিদের কি অমানবিক উপায়ে সংগ্রহ করা হোত, তাদের কি পারিশ্রমিক দেওয়া হোত এবং তাদের প্রতি কি বীভৎস অত্যাচার করা হোত, ইত্যাদি বিষয়ে সংগৃহীত অভিজ্ঞতাকে তিনি তাঁর স্মৃতিকথা 'Indian and Home Memories' (London, 1911) গ্রন্থের 'Incedo

per ignes' অধ্যায়ে প্রকাশ করেছেন।

(২১৬) 'The recruitment of labourers for tea-gardens of Assam was carried on for years mostly by contractors under the provisions of the Transport of Native Labourers Act (No III) of 1863 of Bengal, as amended in 1865, 1870 and 1873. Although supposedly enacted for the protection of the labourers under contract, since it provided for licensed recruitment, the Act as amended in 1865, in reality benefited only the planters'.—'The Rise and Growth of Economic Nationalism in India (April, 1966) Bipan Chandra p. 362. [১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দে 'সঞ্জীবনী' পত্রিকায় রামকুমার বিদ্যারত্নের 'কুলি-কাহিনী' ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত (প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই গ্রন্থাকারেও প্রকাশিত) হতে থাকলে শিক্ষিত সমাজে তা বিশেষ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। এর সঙ্গেই ব্রাহ্মসমাজের দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, নীলমণি চক্রবর্তী প্রভৃতির ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সংবাদ সংযুক্ত হওয়ায় সে-চাঞ্চল্য আন্দোলনের আকার ধারণ করে।]

(২১৭) (ক) 'The plight of the indentured labourers in the tea-gardens of Assam had already commenced to be agitated in our vernacular press. The 'Amrita Bazar Patirka' was circulating broadcast tales of magisterial high handedness all over the province. All these things working upon our youthful imaginaion, created a profound sympathy in us with the struggle for national freedom in Italy led by Mazzini, when the story was presented to us by Surendra nath.'—'Memories of My Life and Times' (1932) Bipin Chandra Pal, p. 246.

(খ) 'In 1870's the Vernacular Press of Bengal had started writing of the abuses of the system and thus arousing the latent nationalism of the readers with hair-raising stories of the scandalous treatment meted out to the labo-

urers in Assam.'—'The Rise and Growth of Economic Nationalism in India' (April, 19৫6) Bipan Chandra, p. 362.

(২১৮) 'মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ' (২য় সংস্করণ, ১৯৭৬) অনাথনাথ বসু। পৃ. ৮৬।

(২১৯) 'Memories of My Life and Times', (1932) Bipinchandra Pal, pp. 232-233.

(২২০) 'Presidency College Register, 1927', p. 91.

(২২১) যোগেশচন্দ্র বাগল ইংরেজিতে লেখা তাঁর 'History of the Indian Association' (? 1953) গ্রন্থের সাত-পৃষ্ঠায় 'Students' Association' সম্পর্কে লিখেছেন, 'In June, 1875 Ananda Mohan Bose started a Students' Association with students of the Presidency College, of which he had been an illustrious alumnus' যোগেশ চন্দ্র বাগল-প্রদত্ত 'Students' Association-এর এই প্রতিষ্ঠা-কালটি ভুল (পরে তিনি তাঁর একটি গ্রন্থে এই ভুলটিকে সংশোধন করলেও পুনরায় যে একটা গোলমাল করে বসেছেন তা পরে বলছি) 'Bengal Administration Report, 1876-77' এর CCII-CCVII পৃষ্ঠায় মুদ্রিত 'Return of Scientific and Literary Societies in Bengal for the year ending 31st March, 1877' অংশে 'Students' Association'-এর প্রতিষ্ঠার শুধু বছর বা মাসই নয়, দিন পর্যন্ত উল্লেখ করা হয়েছে—24th April, 1875. এছাড়া সেখানে Students' Association সম্পর্কে আরো কিছু সংবাদও দেওয়া আছে, যেমন এই সংস্থাটির উদ্দেশ্য,- 'Its objects are to create a bond of union amongst the students of the different Colleges and to bring them on a common platform, as it were, for the discussion, and, as far as possible, the practical furtherance, questions affecting the well-being of the Bengali communtiy.' যোগেশচন্দ্র বাগল তাঁর 'ভারতের মুক্তি সন্ধানী' (১৩৫৮) গ্রন্থের ১৩৩ পৃষ্ঠায় একবার লিখেছেন যে আনন্দমোহন 'প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্রদের লইয়া ১৮৭৫, এপ্রিল মাসে একটি ছাত্রসভা বা স্টুডেন্টস্ এসোসিয়েশন গঠন করিলেন,' কিন্তু কিছু পরেই ১৫৪ পৃষ্ঠায় আবার লিখেছেন যে আনন্দমোহন

'কলিকাতার যুব-ছাত্রগণকে একত্র করিয়া ১৮৭৫ সালের এপ্রিল মাসে প্রেসিডেন্সী কলেজে একটি ষ্টুডেণ্টস্ এসোসিয়েশন বা ছাত্রসভা স্থাপন করেন।' এখানে দেখা যাচ্ছে 'Students' Association-এর প্রতিষ্ঠা-কালটিকে সংশোধন করলেও প্রাথমিকস্তরে সংস্থাটির ছাত্র-সভ্যদের অবস্থা (status) সম্পর্কে তাঁর ধারণাটি গোলমেলে হয়ে গেছে। বস্তুতপক্ষে প্রথমাবস্থায় কেবলমাত্র প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্রদের নিয়েই যে 'Students' Association গড়ে উঠেছিল, তার স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে পূর্বোক্ত 'objects' অংশে। বিপিনচন্দ্র পাল, যিনি ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সী কলেজের F. A. শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন, তিনিও তাঁর আত্মজীবনী 'সত্তর বৎসর' (জুলাই, ১৯৬২) গ্রন্থের ১৮৪ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, 'আমার কলিকাতা আসার (বিপিনচন্দ্র ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দের প্রথম দিকে কলকাতায় আসেন) অল্পদিন পরেই এই 'Students' Association' (ছাত্রসভা)-এর জন্ম হয়। প্রেসিডেন্সী কলেজের অগ্রণী ছাত্রদের প্রায় সকলেই এই সমিতিতে যোগদান করেন।' সুরেন্দ্রনাথের আত্মজীবনী 'A Nation in Making' (2nd impresson, 1925) গ্রন্থেও পরোক্ষভাবে একথার সমর্থন আছে, যেখানে তিনি লিখেছেন যে এই ছাত্র সভার তিনি 'active member' হিসাবে যোগদানের পর 'urged the establishment of branch Associations in different Colleges as feeder-institutions' (পৃ. ৩৫) ।

(২২২) 'The Story of my life' (1934) S. C. Bose, p. 44.

'Presidency College Register, 1927' দৃষ্টে জানা যায় যে নন্দকৃষ্ণ বসু ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দে বি, এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়ে ঐ কলেজেই এম্, এ পড়তে সুরু করেন এবং ১৮৭৭ খ্রীস্টাব্দে এম্, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বিভিন্ন কলেজে অধ্যাপনান্তে সরকারী কর্মে যোগদান করেছিলেন। (পৃঃ ৯৪)

(২২৩) (ক) 'An Indian Career. A Memoir. The Late Henry Woodrow Esq. Director of Public Instruction, Bengal' (W. B. Whittingham & Co. London, 1877), p. 12.

(খ) 'In 1875 Mr. Woodrow was for a short time the Principal of the Presidency College. He did not confine

himself to the discharge of his official duties. He joined the Students' society or Association, and became its President'.—'Sketches of some Distinguished Anglo-Indians. Second Series' (London, 1888) Col. W. F. B. Laurie, p. 147.

(২২৪) এই সময়ে ঢাকা জেলার কৃষকদের এবং বিহারের রায়তদের মধ্যে যে প্রবল বিক্ষোভ দেখা দিতে শুরু করেছিল, তা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

(২২৫) '…যাহাতে এদেশে সাধারণতন্ত্র রাজ্য স্থাপিত হয়, তাহা করা কর্তব্য।…কালেকটরীতে খাজনা দিও না, আদালতে মকদ্দমা করিও না, মহারাণীর নামাঙ্কিত মুদ্রা ব্যবহার করিও না। ইহাতে তোমার কষ্ট হইবেক, সংসারে থাকা দুষ্কর হইবে, তাহা হউক। কর্তব্যকর্ম সাধন অবশ্যই করিতে হইবে। শুদ্ধ ইহা করিলে চলিবে না, বন্দুক ধর, যুদ্ধ কর, যুদ্ধ করিয়া ইংরেজদিগকে তাড়াইয়া দাও। পারিয়া উঠিবা না? তাহাতে কি? তোমার কর্তব্য সাধন তুমি কর। ইংরেজগণকে তাড়াইতে গেলে অরাজক হইবে, তাহাতেই বা তোমার কি? ফল দেখিবার অধিকার তোমার নাই, তাহা ঈশ্বর দেখিবেন…।'

১৩৫৪ সালের বৈশাখ সংখ্যা 'প্রবাসী'-তে প্রকাশিত যোগেশচন্দ্র বাগলের 'অমৃত বাজার পত্রিকা ও ভারতবর্ষের স্বাধীনতা' শীর্ষক ধারাবাহিক (চৈত্র ১৩৫৩-জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৪) প্রবন্ধ থেকে গৃহীত। পত্রটির পাদটীকায় বাগল মহাশয়ের লিখিত মন্তব্য এই, 'পত্রখানি সম্পাদকীয় বলিয়া মনে করিবার সঙ্গত কারণ আছে। ৮ই ডিসেম্বর, ১৮৭০ তারিখের 'পত্রিকা'য় 'হিন্দুসমাজ' শীর্ষক সম্পাদকীয় নিবন্ধে পত্রোক্ত বিষয়টি মূলতঃ সন্নিবেশিত হইয়াছে।'

(২২৬) (ক) 'Memories of My Life and Times' (1932) B. C. Pal p. 227.

(খ) 'The Indian Mirror' পত্রিকার ১৩ই জুলাই, ১৮৭৩ সংখ্যার 'Literary' অংশে ওই সময়ে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার সর্বাধিক জনপ্রিয়তা সম্বন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে, 'Thus it surpasses in influence and

popularity its two English contemporaries'. p. 5.

(২২৭) ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দের জুন-জুলাই মাসের মধ্যে 'আর্যদর্শন' পত্রিকায় প্রকাশিত ১৪টি সংখ্যায় স্থান-প্রাপ্ত রচনাগুলি হোল—'সুপ্রসিদ্ধ প্রথম ফরাসি বিদ্রোহ,' 'সিপাহী বিদ্রোহ', 'ভারতের একতা', 'বঙ্গদেশের অধিবাসী', 'পলাশীর যুদ্ধ' (নবীন সেনের এই কাব্যটির প্রধানতঃ দেশপ্রেম-উদ্বোধক অংশ সমূহের সুপ্রচুর উদ্ধৃতিসহ প্রায় কুড়ি পৃষ্ঠা-ব্যাপী আলোচনা) ইত্যাদি।

(২২৮) এই ধরণের বিদ্রোহের ইঙ্গিতবহ কবিতাগুলি ছাত্রদের তরুণ মনে যে ধীরে ধীরে ইংরেজ-বিদ্বেষ সৃষ্টির কাজে ইন্ধন যোগাচ্ছে, তা টের পেয়ে কিছুদিন পূর্বে বঙ্গেশ্বর Campbell তদানীন্তন বঙ্গের শিক্ষা-অধিকর্তা ('Director of Public Instruction') W.S. Atkinson-কে স্কুলে বাংলা কবিতা পড়ানো বন্ধ করার আদেশ জারী করতে হুকুম করেছিলেন। নিরুপায় Atkinson-সাহেবের সনির্বন্ধ অনুরোধে সাংবাদিক কৃষ্টদাস পাল তাঁর 'Hindoo Patriot' পত্রিকায় 'Profane Ruler'-রূপী Campbell সাহেবকে তীব্র ব্যঙ্গের হুল ফুটিয়ে এই বদ মতলবের সাধ ঘুচিয়ে দিয়েছিলেন। দ্রঃ 'The Life of Rai Kristo das Pal Bahadur' (1886) Ramgopal Sanyal, pp. 63-64.

(২২৯) 'By criticising the colonial regime, demanding political rights for the Indians, and advocating the independent economic devolopment of the country, the liberal leaders of national organisations in the second half of the nineteenth century played an important part in awakening national consciousness. Their activity objectively helped to undermine the pillars of colonial rule'.—'Tilak and the Struggle for Indian Freedom' (May 1966), edited by I.M. Reisner & N. M. Goldberg, p. 234.

(২২৯ক) ১৯৩-সংখ্যক পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

(২৩০) '...there is a large and increasing class of native newspapers which would seem to exist only for the sake of spreading seditious principles, of bringing the Government

and its European officers into contempt, and of existing antagonism between the governing race and the native of the country. This description of writing is not of very recent growth, but there has been a marked increase in it of late. and especially the last three or four years. During the past twelve months it has been worse than ever, the writings gaining in boldness as they find that their writings are allowed to pass unpunished. The principal topics are the injustice and tyranny of the British Government, its utter want of consideration towords its native subjects and the insolence and pride of Englishmen in India, both official and non-official. There is no crime however heinous, and no meanness however vile, which according to these writers is not habitually practised by their English rulers···Of late, however, a further step has been taken, and a beginning has been made in the direction of inciting the people to upset the British Raj by denunciations, sometimes open and sometimes covert, of the alleged weakness and timidity ot the English and their inability to maintain their present position in India'. 'A History of the Indian Nationalist Movement' (London 3rd edition, 1921) Sir. Verney Lovett, p. 22.

(২৩১) 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ-সমাজ' (৩য় সংস্করণ) শিবনাথ শাস্ত্রী। (পৃ: ৩০৮)

(২৩২) 'Disappointment had already been acute when under Lord Lytton's Viceroyalty first Royal visit paid to India by the then Prince of Wales (afterwards King Edward VII) in 1876···.'—'India' (London, 1926) Sir. Valentine Chirol, p. 84.

(২৩৩) ১৮৭৪-৭৫ সালে যে এগুলি ঘটেছে তা ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে Vernacular Press Bill উত্থাপন কালে Sir Arthur Hobhouse প্রকারান্তরে স্বীকার করে নিয়েছেন দেখা যায়। (২৩০ সংখ্যক পাদ-

টীকা দ্রষ্টব্য।) এই সময়ে ইংরেজদের 'শক্তির দম্ভ ও ঔদ্ধত্য' বিনা প্ররোচনায় পথে-ঘাটে কিভাবে প্রকাশ পাচ্ছিল, জনৈক নামহীন ব্যক্তির পত্রে তার একটি বর্ণনা পাওয়া যায়। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই মে তারিখের 'The Indian Mirror' পত্রিকার 'Correspondence' অংশে 'A Query' নামে প্রকাশিত সেই পত্রটি হোল এই : 'Sir, A, a native walks on a street, when suddenly B, a European comes and without any provocation, beats A. If A meekly submits to the insult, he is considered a coward. He may go to the Police, but justice is not a cheap commodity, and especially as between Natives and Europeans it is in many cases hard to be obtained If A returns the blow, he creates a row and it may be that he may be arrested along with B for disturbing the peace What A is to do? A is a Baboo. Yours obdiently, Z.—P. S. I should feel obliged if you or any of your readers would kindly answer my query.' এর পরেও প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল কালা-আদমিদের উপর শ্বেতাঙ্গ জাতির এই প্রকার অত্যাচার প্রায় নিরঙ্কুশভাবে চলেছিল। নয়ের দশকে রবীন্দ্রনাথের রচনাদিতেও এর পরিচয় পাওয়া যায়।

(২৩৪) ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দের ২৭শে জুন তারিখের 'The Indian Mirror' পত্রিকার 'The week' অংশে এ-সম্পর্কে প্রকাশিত সংবাদ, "The Lieutenant-Governor does not know how to provide for the many candidates who have successfully passed the sub-ordinate Civil Service Examination during the last four years. His Honour has therefore wisely decided that 'it will not be necessary to hold another general examination until further notice." pp 4-5.

(২৩৫) যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের 'আধুনিক ভারত' নামক এই প্রবন্ধটি তাঁর 'আর্যদর্শন' পত্রিকার ১২৮৩ মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। (এই প্রবন্ধের সঙ্গে 'আর্যদর্শনে' প্রকাশিত তাঁর আরো ৬টি প্রবন্ধ যুক্ত হয়ে

১২৮১ সালে 'হৃদয়োচ্ছ্বাস বা ভারত বিষয়ক প্রবন্ধাবলী' গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।) প্রবন্ধটির পাদটীকায় লিখিত আছে, 'এই প্রবন্ধটি ১২৮৩ সালের হিন্দু মেলায় পঠিত হইবে বলিয়া লিখিত হয়। কিন্তু পুলিশের অদ্ভুত মহিমায় মেলাক্ষেত্রে যে দুর্ঘটনা উপস্থিত হয়, তাহার জন্য ইহা তথায় পঠিত হয় নাই।' 'হিন্দু মেলা'র ১১দশ বার্ষিক অধিবেশনের মূল অনুষ্ঠানে (১৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৭৭) এই পুলিশী গোলযোগ ঘটেছিল। সুতরাং প্রবন্ধটি ১৮৭৬ সালের শেষ দিকে বা ১৮৭৭ সালের প্রথম দিকে রচিত হয়েছিল।

(২৩৬) 'প্যারীচরণ সরকার' (১৩০৯)—নবকৃষ্ণ ঘোষ। (পৃঃ ৯৭) 'The Bengal Temperance Society'র সঙ্গে সম্পর্কান্বিত বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের ব্যক্তিরা হলেন—বিদ্যাসাগর, বিচারপতি শম্ভুনাথ পণ্ডিত, কেশবচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র ঘোষ (সাংবাদিক), Rev. C. H. Dall, আজিমুদ্দিন খাঁ, মৌলভী সৈয়দ আমীরুদ্দিন হোসেন প্রভৃতি। (নবকৃষ্ণের এই গ্রন্থের ৯৯-১০১ পৃষ্ঠায় আরো অনেকের নাম আছে।)

(২৩৭) 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস' (৫ম সং, চৈত্র, ১৩৮৬) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (পৃঃ ১২৯)।

(২৩৮) —'What we apprehended has come to pass. When native theatricals first undertook to parade courtesans on the stage, we raised a voice of protest and warning. Circumstances have proved, alas! too soon, that the warning was needed From the report of an eye-witness given below, it is clear that the Native stage has degraded itself, and threatens to engulf unprincipled youths in a flood of immorality and sensuality. A correspondent writes: 'A few minutes before the performance commenced, a certain stout and dark-looking gentleman, to the horror of some of the audience, entered the hall accompanied by a woman of ill-fame. The woman was placed in such a conspicuous part of the dress-circle that she could be seen from all parts of the room. Lea-

ving her there alone, to take care of herself as best as she could, the gentleman in question came down to take a seat in the stall. All eyes now turned towards the woman and, Sir, you can easily conceive how things passed after this. The whole room was soon perfumed with the smell of liquor. We could hardly believe that we were not in a brewing-house. Some of the visitors, being the worse for liquor, acted in so ungentlemanly a manner that I do not find proper words to describe the same.' 'The Indian Mirror', 7th December, 1873. pp. 1—2.

(২৩৯) 'The Indian Mirror' পত্রিকার ২রা নভেম্বর, ১৮৭৩ সংখ্যার 'The Week' অংশ দ্রষ্টব্য (পৃঃ ২)। পরবর্তী ৯ই নভেম্বর সংখ্যার 'Latest News' অংশে উদ্ধৃত 'The Indo-European correspondence'-এর মতও, এই সঙ্গে দেখা যেতে পারে। (পৃঃ ৪)

(২৪০) 'The Indian Mirror'. 'The Week', 14th September, 1873, p. 1.

(২৪১) এ বিষয়ে শ্রীপান্থ রচিত 'মোহন্ত-এলোকেশী সম্বাদ' (মে, ১৯৮৪) গ্রন্থ পঠনীয়।

(২৪২) 'The Indian Mirror', 31st August, 1873, p. 3.

(২৪৩) Ibid, 2nd November, 1873, p. 5.

(২৪৪) 'সেকাল আর একাল' (আশ্বিন, ১৩৫৮) রাজনারায়ণ বসু। (পৃঃ ৯০—৯২)

(২৪৫) 'The Indian Mirror', 11th April, 1875. 'Correspondence', pp. 3—4.

(২৪৬) ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ১৮ই সেপ্টেম্বর তারিখের 'Statesman' পত্রিকার সম্পাদকীয় মন্তব্যে লেখা হয়েছিল, 'Some years ago, Huxley's 'Life of Hume' was a part of the B A. Course, in which the young men of India were told that there was no God, no future state and that death was an eternal sleep.' (দেবীপদ ভট্টাচার্যের 'বাংলা চরিত সাহিত্য' (১৯৬৪) গ্রন্থের ৭৫ পৃষ্ঠা থেকে গৃহীত।)

(২৪৭) 'Memories of My Life and Times' (1932) B.C. Pal, p. 235.

(২৪৮) 'সাধু নাগ মহাশয়' (৮ম সংস্করণ, ১৩৫৬) শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী। (পৃঃ ১৯)

(২৪৯) 'শ্রী সন্তদাস কাঠিয়া বাবাজী মহারাজের জীবন চরিত, ১ম ভাগ,' (১৩৭০) শ্রীধনঞ্জয় দাস কাঠিয়া বাবাজী মহারাজ। (পৃঃ ১৪)।

(২৫০) 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত' (৭ম সংস্করণ, ১৩৫৭) রামচন্দ্র দত্ত। (পৃঃ ১০৪, ১১৬)

(২৫১) ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর 'Swami Vivekananda : Patriot-Prophet' (1954) গ্রন্থে (পৃঃ ৫৬, পাদটীকা) জানিয়েছেন, অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০—১৮৮৬) জীবনের শেষ দিকে 'নাস্তিক' হয়ে গিয়েছিলেন ; সুনীতিরঞ্জন রায়চৌধুরীর 'উনিশ শতকের নব্য-হিন্দু আন্দোলনের কয়েকজন নায়ক' (১৩৮৮) গ্রন্থ থেকে (পৃ: ৮০) জানা যায় আলোচ্য সময়কালে চন্দ্রনাথ বসু (১৮৪৪—১৯১০) 'সংশয়বাদী' ছিলেন ; বৃদ্ধ বয়সেও কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য (১৮৪০-১৯৩২) 'আমি Positivist আমি নাস্তিক' বলে দাবি করতেন ('পুরাতন প্রসঙ্গ' বিশ্বভারতী সংস্করণ ১৩৭৯, পৃঃ ১৩২) ইত্যাদি।

(২৫২) 'Agnosticism বা নাস্তিকতাবাদের সঙ্গে 'anarchism' বা রাষ্ট্র-হীনতাবাদের গভীর সম্পর্ক আছে—এই দুই মত প্রায় allied বা দোসর বলা চলে।'—'সংসার ও সংগ্রাম' (১৯৬০) সতীশচন্দ্র রায়-চৌধুরী। 'ভূমিকা,' (পৃঃ ১৭)

(২৫৩) 'Babu Surendranath Banerjea, late C. S. has returned to Calcutta.' 'The Indian Mirror', 25th July, 1875, p. 4. জীবন-সায়াহ্নে লেখা আত্মজীবনী 'A Nation in Making' (1925) গ্রন্থের একাধিক স্থানে স্মৃতিদৌর্বল্যবশতঃ সুরেন্দ্রনাথ তাঁর কলকাতা প্রত্যাবর্তনের সময় 'June 1875' বলে উল্লেখ করেছেন এবং পরবর্তী কালে সুরেন্দ্রনাথ-সম্পর্কিত প্রায় সমস্ত রচনায় এই ভুল সময়টি গৃহীত হয়েছে।

(২৫৪) 'বিপ্লবী বাংলা বা স্বাধীনতার ইতিহাস' (১৯৪৯) রাজেন্দ্রলাল আচার্য। (পৃঃ ৭০-৭১)

(২৫৫) 'I began to take part in public affairs'—'A Nation in Making' (2nd impression, 1925) Surendranath Banerjea p. 34.

(২৫৬) Ibid.

(২৫৭) 'কর্মবীর সুরেন্দ্রনাথ' (১৩১৮) সূর্যকুমার ঘোষাল সম্পাদিত। (পৃ. ২৭)

(২৫৮) 'Students' Association' প্রতিষ্ঠার সঠিক তারিখ হোল—২৪শে এপ্রিল, ১৮৭৫। ২২১-সংখ্যক পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

(২৫৯) 'স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১ম খণ্ড' (১৩৪০) জ্ঞানেন্দ্রনাথ-কুমার। (পৃ. ৪০)

(২৬০) 'In my mind my educational and my political work were indeed interlinked —'A Nation in Making', p. 38.

(২৬১) 'A Life of Anandamohan Bose' (1929) H.C. Sarkar p. 54.

(২৬২) এই গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

(২৬৩) ইতালীর অন্তর্গত 'জেনোয়া'র এক ডাক্তারের পুত্র ম্যাট্‌সিনি (Giuseppe Mazzini) ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দের ২২ শে জুন জন্মগ্রহণ করেন। যৌবনে তিনি ইতালীয় ভাষা ও সাহিত্য এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানে পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন। খণ্ড-বিচ্ছিন্ন এবং অষ্ট্রিয়া দ্বারা শৃঙ্খলিত ইতালীকে সঙ্ঘবদ্ধ ও স্বাধীন করার স্বপ্ন নিয়ে তিনি জেনোয়ার গুপ্ত-সমিতি 'Carboneria'-তে যোগদান করেন। ফলে তাঁকে দেশ থেকে প্রথমে ফ্রান্সের 'মার্সাই' (Marseilles)-তে এবং পরে ইংল্যাণ্ডে নির্বাসিত করা হয়। তিনি ইতালীর জাতীয় সভা ('Associazione Nazionale Italiana') গঠন করেন। তাঁর রচনা ও বক্তৃতা দেশবাসীকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে। বিখ্যাত গ্যারিবল্ডী ছিলেন তাঁর অন্যতম শিষ্য। দেশের যুব-শক্তির উপর তাঁর অসামান্য প্রভাব ছিল। ১৮৩০ ও ১৮৪৮ সালে ইতালীর নানা স্থানে সংঘটিত গণ অভ্যুত্থানের পিছনে ম্যাট্‌সিনি-প্রভাবিত যুবকরাই ছিল প্রধান। বস্তুতপক্ষে তাঁর বাণী ও কার্যধারা সেকালে অখণ্ড ইতালী গঠনের উপযোগী যে মানসিকভূমি প্রস্তুত করেছিল, তাই সত্তরের দশকে গ্যারিবল্ডী, কাভুর প্রভৃতির নেতৃত্বে সাফল্য-মণ্ডিত হয়। ইতালীর স্বাধীনতা আন্দোলনের পথিকৃৎ ম্যাট্‌সিনি ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই মার্চ 'পিসা'-তে দেহত্যাগ করেন।

(২৬৪) 'Upon my mind the writings of Mazzini had created a profound impression.'—'A Nation in Making,' p. 43.

(২৬৫) 'I discarded his (Mazzini's) revolutionary teachings as-

unsuited to the circumstances of India and as fatal to its normal development, along the lines of peaceful and orderly progress' – 'A Nation in Making', p. 43.

(২৬৬) Ibid.

(২৬৭) অবশ্য সুরেন্দ্রনাথ তাঁর আত্মজীবনী 'A Nation in Making' গ্রন্থে লিখেছেন, 'I persuaded Babu Jagendranath Vidyabhuson and Babu Rajanikanto Gupta…to translate into our language the life and works of Mazzini in the spint of my addresses…'(p. 43), কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ-প্রদত্ত এই সংবাদটি সম্বন্ধে কিছু প্রশ্নের অবকাশ আছে। প্রথমতঃ, ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসের তৃতীয় সপ্তাহে সুরেন্দ্রনাথের কলকাতা প্রত্যাবর্তনের পূর্বে যোগেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়ে ছিল, এমন কোন সংবাদ আমরা এখনও পাইনি। না হওয়াই সম্ভব, কেননা প্রথমবার বিলাত-প্রত্যাগত I. C. S. পদপ্রাপ্ত 'পাকা সাহেব' (বিপিন পাল তাঁর 'Memories of My Life and Times, 1932' গ্রন্থে এই সময়কার সুরেন্দ্রনাথকে 'Pucca Saheb' বলে বর্ণনা করেছেন, পৃ. ১৪৯) সুরেন্দ্রনাথ বিশেষ সাহেব-ঘেঁষা হয়ে উঠেছিলেন, এবং দেশীয়দের সঙ্গে মেলামেশা তখন আদৌ পছন্দ করতেন না—বিপিনচন্দ্রের বর্ণনা থেকে এরূপই মনে হয়। সুতরাং সামান্য ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট (তখনও 'আর্য দর্শন' পত্রিকার প্রকাশ সুরু হয় নি) যোগেন্দ্রনাথের সঙ্গে তিনি পরিচিত হয়েছিলেন, এমন মনে হয় না। অতএব সুরেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় দফায় কলকাতায় ফেরা এবং যোগেন্দ্রনাথের ম্যাট্‌সিনি-সংক্রান্ত রচনা প্রকাশের (আগষ্ট, ১৮৭৫) মধ্যবর্তী মাস খানেকের কম সময়ের মধ্যে তাঁদের মধ্যে এতদূর ঘনিষ্ঠতা হয়ে গেল যে একটি নতুন বিষয়ে লেখবার জন্যে তিনি যোগেন্দ্রনাথকে 'Persuade' অর্থাৎ বুঝিয়ে-সুজিয়ে রাজি করালেন!—বিষয়টি যথেষ্ট সংশয়ের অধীন। দ্বিতীয়তঃ, ম্যাট্‌সিনি অর্থাৎ ইতালির স্বাধীনতা-আন্দোলন সম্পর্কিত রচনা লিখতে যোগেন্দ্রনাথ কি অরাজী ছিলেন? ইতিপূর্বে প্রকাশিত যোগেন্দ্র-নাথের রচনাগুলি পড়লে তা কিন্তু মনে হয় না। তৃতীয়তঃ, যোগেন্দ্রনাথ অবশ্যই এমন কোন অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন পুরুষ ছিলেন না, যে

ম্যাট্‌সিনি-সংক্রান্ত এত গুরুতর রচনা এত অল্প সময়ের মধ্যে লিখে ফেলতে পারেন। বস্তুতঃ এই রচনার জন্যে যোগেন্দ্রনাথের যে দীর্ঘ দিনের পরিশ্রম, চিন্তা ও পরিকল্পনার প্রয়োজন ছিল, তার আভাসমাত্রও সুরেন্দ্রনাথের এই 'Persuaded' শব্দের দ্বারা ফুটে ওঠে না, পরন্তু একধরণের প্রচ্ছন্ন আত্মশ্লাঘার ভাবই ধরা পড়ে। আসলে সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতাদি শুনে এবং যোগেন্দ্রনাথের প্রবন্ধাদি পড়ে অর্থাৎ এইভাবে চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করেই যে সেকালের যুবসমাজ ম্যাট্‌সিনির ভক্ত হয়ে উঠেছিল, এটাই হোল সত্যের পূর্ণরূপ। ম্যাট্‌সিনিকে জনপ্রিয় করে তোলার কিছু কৃতিত্ব যোগেন্দ্রনাথেরও প্রাপ্য।

(২৬৮) ইতালীর অন্তর্গত 'নিস' (Nice) সহরে ১৮০৭ খ্রীস্টাব্দের ৪ঠা জুলাই গ্যারিবল্ডী (Giuseppe Garibaldi) এক সাধারণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ১৫ বছর বয়সে বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে তিনি নৌবিদ্যায় পারদর্শী হন। ইতালীর স্বাধীনতা সংগ্রামে তিনি ম্যাট্‌সিনির শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ ব্যর্থ হলে তিনি দক্ষিণ আমেরিকায় পলায়ন করেন ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে জনজাগরণ কালে তিনি ইতালীতে ফিরে এসে ম্যাট্‌সিনির সঙ্গে যোগ দেন। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে সার্ডিনিয়ার রাজা ভিক্টর ইমানুয়েলের পক্ষে যুদ্ধাভিযান চালিয়ে গ্যারিবল্ডী নেপলস্ ও সিসিলি দ্বীপ জয় করেন। অতঃপর পর তিনি রোম ও ভেনিস জয়ের জন্য প্রস্তুত হন। এতে ফরাসী ও অষ্ট্রিয়া মিলিত হয়ে ইতালীর স্বাধীনতাকে বিপন্ন করতে পারে মনে করে কাভুরের মধ্যস্থতায় গ্যারিবল্ডী সমস্ত ক্ষমতা ত্যাগ করেন এবং ভিক্টর দ্বিতীয় ইমানুয়েলকে ইতালীর সম্রাটরূপে স্বীকার করে অপরিসীম আত্মত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। শেষ জীবনে তিনি 'কাপ্রেরা' (Caprera) নামক ক্ষুদ্রদ্বীপে সামান্যভাবে জীবন যাপন করেন, এবং সেখানেই ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দের ২রা জুন তাঁর মৃত্যু হয়।

(২৬৯) 'Life of Shishirkumar Ghosh' (1946) Wayfarer. pp. 45-46

(২৭০) 'The Indian League was intended as a deliberate challenge to the British Indian Association'.—'The Emergence of

Indian Nationalism' (1982) Anil Seal, p. 213.

(২১১) 'History of the Indian Association' (? 1953) J. C. Bagal, pp. 8-9. যোগেশচন্দ্র বাগল তাঁর এই গ্রন্থে 'The Indian League' প্রতিষ্ঠার ইতিহাস যেভাবে বিবৃত করেছেন, তাতে সাধারণ পাঠকের মনে এক ধরনের বিরূপ ধারণা গড়ে ওঠার অবকাশ আছে। পক্ষান্তরে, অনাথনাথ বসু তাঁর 'মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ' (২য় সংস্করণ, ১৯১৬) গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে আনন্দ-মোহনের খানিকটা অজ্ঞাতেই শিশির কুমার কর্তৃক 'League' প্রতিষ্ঠার ইতিহাস যেভাবে বর্ণনা করেছেন, তার স্বাভাবিকতাকেও একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তবে কর্মব্যপদেশে আনন্দ মোহনের ঢাকায় অবস্থিতির সুযোগ নিয়ে শিশিরকুমার যে তড়িঘড়ি ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দের ২৫শে সেপ্টেম্বর কলকাতায় 'The Indian League' প্রতিষ্ঠা করেছেন, সে কথা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই স্বীকার করে তিনি ৩০শে সেপ্টেম্বর (১৮৭৫) তারিখের অমৃতবাজার পত্রিকাতে লিখলেন, 'The Organisation was formed by a coupde etat as that was the only possible way of carrying it out successfully'.

(২১২) 'The Indian League' প্রতিষ্ঠার ইতিহাস সম্পর্কে রজত সান্যাল তাঁর 'Voluntary Associations and the Urban Public Life in Bengal' (1980) গ্রন্থের ৮১ পৃষ্ঠায় একটি গুরুতর মন্তব্য করেছেন, 'The Indian League was formed in 1875 clearly with the backing of the Government', কিন্তু তাঁর গ্রন্থের কোথাও তথ্যাদি দিয়ে মন্তব্যটিকে সমর্থন করেন নি। শিশিরকুমার ও অমৃতবাজার পত্রিকা এই সময়ে শাসকদের যে সুনজরে ছিলনা, তার প্রমাণ পাওয়া যায় কয়েক মাস মাত্র পূর্বে মলহর রাওয়ের গদিচ্যুতির ব্যাপারে অমৃতবাজারের অগ্নিস্পর্শী ভাষায় ইংরেজ শাসনের প্রচণ্ড সমালোচনায় ক্ষিপ্ত সরকার পত্রিকাটির কণ্ঠরোধ করবার জন্য Advocate-General-এর পরামর্শ চাওয়া থেকে। সুতরাং এমন ভয়ঙ্কর ব্যক্তিকে সমিতি গঠন দ্বারা রাজনীতি করার সুযোগ করে দেবার জন্য ইংরেজ সরকার এত শীঘ্র পৃষ্ঠপোষকতা ('backing') করতে কি ভাবে এগিয়ে আসতে পারে, তা আমাদের বোধগম্য হল না।

(২১৩) '...another sort of unity is just becoming possible, and that is national or political unity. The Mohamedans, Hindus, Maharattas and Bengalees are just learning to sympathise with each other'.—Amrita Bazar Patrika, 30th September, 1875.

(২৭৪) 'History of the Indian Association' (? 1953) J. C. Bagal, p. 10.

(২৭৫) 'ভারতের মুক্তি সন্ধানী' (১৯৫৮) যোগেশচন্দ্র বাগল (পৃঃ ৯১)।

(২৭৬) ঐ, (পৃঃ ৯১-৯২)

(২৭৭) 'চন্দ্রনাথ বসু : জীবন ও সাহিত্য' (১৯৮৪) করুণাময় মজুমদার (পৃঃ ৭)

(২৭৮) 'দয়ানন্দ চরিত' (১৯২৯) দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। (পৃঃ ২৮১-২৮২)

(২৭৯) 'পুরানো কথা' (১৩৫৩) চারুচন্দ্র দত্ত (পৃঃ ৫৪)।

(২৮০) যুবরাজের ('Prince of Wales') ভারত-পরিদর্শনে আসার ব্যবস্থাদি, মায় দিনক্ষণ পর্যন্ত স্থির হয়ে গেলে এতদিন পর্যন্ত মলহর রাও সংক্রান্ত যে উত্তপ্ত বিতর্কাদি House of Commons-এ চলছিল, তা হঠাৎ ই ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্টের প্রথম দিকে বন্ধ হয়ে গেল দেখে রাজভক্ত 'The Indian Mirror' পত্রিকা ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই আগষ্ট তারিখে 'The Week' অংশে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করেছে এই ভাবে, 'The Baroda affair is completely hushed up and the two parties in Parliament have made in up between themselves that there shall be no debate this sess on, p 4.

(২৮১) 'দেশাত্মবোধক ও ঐতিহাসিক বাংলা নাটক' (১৯৮৫) ডঃ প্রভাত-কুমার গোস্বামী। (পৃঃ ১০৮)

(২৮২) যুবরাজের ভারত পরিদর্শন উপলক্ষে হেমচন্দ্রের 'ভারত ভিক্ষা', নবীনচন্দ্রের 'ভারত উচ্ছ্বাস,' রঙ্গলালের 'ভারত ভূমির অভ্যর্থনা' ছাড়াও হরিশচন্দ্র নিয়োগীর 'ভারতে সুখ', রাজকৃষ্ণ রায়ের 'ভারতে যুবরাজ', গোপালচন্দ্র দে-র 'রাজোপহার' ইত্যাদির সবিশ্লেষণ সুবিস্তৃত (কুড়ি পৃষ্ঠাব্যাপী) আলোচনা করতে গিয়ে ১২৮২ সালের পৌষ সংখ্যা 'আর্যদর্শন' পত্রিকায় 'রাজভক্তি ও রাজোপহার' প্রবন্ধে যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ জানিয়েছেন যে এগুলির মধ্য দিয়ে রচয়িতাদের ছদ্ম রাজভক্তি মাত্র প্রকাশিত হয়েছে। প্রবন্ধের উপসংহার ভাগে তিনি লিখেছেন, 'যুবরাজ-সাহিত্য হইতে আমরা যে সকল উদাহরণ তুলিলাম, তাহাতে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের প্রতি ভারতবাসীদিগের অন্তর্নিগূহিত বিরাগের স্পষ্ট প্রতিবিম্ব পতিত রহিয়াছে। যেগুলি

স্তোত্রে পরিপূর্ণ, সেগুলিতে কেবল মৌখিক ভক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে মাত্র। কারণ আমাদিগের বিশ্বাস প্রকৃত ভক্তি বাহ্যাডম্বর শূন্য'। (পৃঃ ৩৮৩-৪০২)

(২৮৩) 'সাহিত্য সাধক চরিতমালা'স্তর্গত 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর' (৩য় মুদ্রণ, ১৩৮৪) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। (পৃঃ ৩০-৩১)

(২৮৪) 'কবিতাবলী' দুই খণ্ডে বিভক্ত। 'প্রথম খণ্ডের' ১৩টি 'মধুর ভাবময়ী কবিতা'র রচনাকাল সমেত নাম—(১) বসন্তাগমে বিরহ সঙ্গীত (২৭ মাঘ, ১২৮৪), পৃঃ ১-৭ ; (২) নিশীথ চিন্তা (২৯ মাঘ, ১২৮৪), পৃঃ ৮-১৮ ; (৩) প্রণয়-প্রবাহ (১০ বৈশাখ, ১২৮৫), পৃঃ ১৯-২৬ ; (৪) প্রণয়-পত্রিকা (১৬ মাঘ, ১২৮৫), পৃঃ ২৭-৩০ ; (৫) নলিনী (২১ ভাদ্র, ১২৮৫), পৃঃ ৩১-৩৮ ; (৬) একখানি পত্র (১৬ চৈত্র, ১২৮৫), পৃঃ ৩৯-৫০ ; (৭) একটি গান (রচনাকালের উল্লেখ নেই), পৃঃ ৫১ ; (৮) কোন এক স্ত্রীলোকের প্রতি (৩০ কার্তিক, ১২৮৫), পৃঃ ৫২ ; (৯) কোন বন্ধুর একবিংশ বয়সে (২ পৌষ ১২৮৫), পৃঃ ৫৩ ; (১০) কোন বন্ধুর বিবাহ উপলক্ষে (২২ শ্রাবণ, ১২৮৬) পৃঃ ৬২-৬৪ ; (১১) সুষুপ্ত সুন্দরী (রচনাকালের উল্লেখ নেই) পৃঃ ৫৮-৬১ ; (১২) ভগ্নহৃদয় (২১ ভাদ্র, ১২৮৬) পৃঃ ৬২-৬৪ , (১৩) বিদায় (রচনাকালের উল্লেখ নেই) (পৃঃ ৬৫-৬৮)

'দ্বিতীয় খণ্ডে'র '৭টি জাতীয় ভাবময়ী কবিতা'র নাম (কোনটিরই রচনা কালের উল্লেখ নেই) : (১) ভারতগান, পৃঃ ৭১ ; (২) স্বদেশ, পৃঃ ৭২-৭৭ ; (৩) বীণা, পৃঃ ৭৮-৮২ , (৪) ভারত সুন্দরী, পৃঃ ৮৩ ; (৫) ভারত স্বপ্ন, পৃঃ ৮৪-৯২ ; (৬) ভারতবিলাপ-সূচনা, পৃঃ ৯৩-৯৬ ; (৭) ভারতবিলাপ —বিলাপ, পৃঃ ৯৭-১২৪। ১ম খণ্ডের ৯-সংখ্যক কবিতার পাদটীকা এই, 'উত্তরপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি কবির বিশেষ বন্ধু ছিলেন। ইনি এক্ষণে মন্সবি ['munsiff'] করিতেছেন'। ১০-সংখ্যক কবিতার পাদটীকা—'এই সংগ্রাহকের [দেবেন্দ্রবিজয় বসুর] বিবাহ উপলক্ষেই এই কবিতা লিখিত হইয়াছিল।'

(২৮৫) Bengal Library Catalogue, 4th quarter ending 31st December, 1896, pp. 22-23. কবিতামালা সম্বন্ধে এখানের সংক্ষিপ্ত মন্তব্য এই, 'Emotional and lyrical pieces, the latter deploring

the Poverty, degeneracy and political servitude of the people of India, and calling upon them to gird up their loins to better their conditions'. এই Catalogue থেকে আরো দুটি সংবাদ পাওয়া যায় (১) প্রথম সংস্করণে 'কবিতামালা'র একহাজার খণ্ড (Copy) ছাপা হয়েছিল এবং (২) সংগ্রাহক দেবেন্দ্রবিজয় বসু এই সময়ে হাওড়ার 'মুন্সেফ' ছিলেন। ['কবিতামালা'র আর কোন সংস্করণ হয়নি।]

(২৮৬) হুগলী জেলার বাকসাডা গ্রামে ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দে ১০ই মার্চ (২৮ ফাল্গুন, ১২৬৪) দেবেন্দ্রবিজয় বসু জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মাতার নাম যথাক্রমে শ্যামাচরণ ও গঙ্গামণি। 'Presidency College Register, 1927'-এর ৯২ পৃষ্ঠা থেকে জানা যায় যে দেবেন্দ্রবিজয় ১৮৭৬ থেকে ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ঐ কলেজের ছাত্র হিসেবে F.A. (1879), M A. (1881) ও B.L (1882) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ['কবিতামালার সংগ্রাহকের নিবেদন' অংশে দেবেন্দ্রবিজয় লিখেছেন, '১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দে সুরেন্দ্রবাবু প্রথমে মেট্রোপলিটান কালেজের শিক্ষক হইলেন···ঐ সময়ে আমি ও গোপাল উভয়েই সেই কালেজে পড়িতাম।' এ থেকে বোঝা যায় যে দেবেন্দ্রবিজয় মেট্রোপলিটন কলেজের F.A. ক্লাসে একবছর (Session 1875-76) পড়ে ১৮৭৬ সালে সেখান থেকে প্রেসিডেন্সী কালেজের F.A ক্লাশের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে গিয়ে ভর্তি হন এবং ১৮৭৭ সালে F.A পাশ করেন। "Presidency College Register, 1927-'এ তাঁর এই F.A পাশের সংবাদটি নেই।] হেয়ার স্কুলের শিক্ষকরূপে দেবেন্দ্রবিজয়ের কর্মজীবন শুরু হয়। পরে কিছুদিন মেট্রোপলিটন ইনষ্টিউশনে বিজ্ঞানের অধ্যাপক রূপেও কাজ করেন। এই সময়ে তিনি কিছুদিন 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার সহকারী সম্পাদকের কাজ করেন, কিছুদিন বাংলা সরকারের লাইব্রেরীয়ানের পদেও কাজ করেন। আবার ১৮৮৭ সালে Bengal Art and Limited নামে একটি কোম্পানী খুলে স্বাধীনভাবে ব্যবসাও করেন। অতঃপর কিছুদিন আলিপুর কোর্টে ওকালতি করে ১৮৮৯ খ্রীস্টাব্দে 'মুন্সেফ' হন। ১৯১০ সালে পদোন্নতির ফলে তিনি 'Sub-judge' হন এবং ১৯১৩ সালে সরকারী কর্ম থেকে অবসর গ্রহণ করেন। ছাত্রজীবন থেকেই তাঁর সাহিত্য সাধনা শুরু হয়েছিল। সেকালের বঙ্গবাসী, নবজীবন,

প্রচার পন্থা নব্যভারত, ভারতবর্ষ প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর মননশীল প্রবন্ধাদির প্রকাশ হওয়ায় তিনি একজন বিশিষ্ট লেখকরূপে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এই সব পত্রিকায় প্রকাশিত বহু রচনা গ্রন্থ-বদ্ধ না হওয়ায় তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা বেশি নয়—'প্রতিভাপূজা', 'সমাজ ও তাহার আদর্শ', 'চন্দ্রশেখর মাহাত্ম্য ও মেধসাশ্রম আবিষ্কার', শ্রীমদ্ভাগবতগীতা'-ব্যাখ্যাসহ পদ্যানুবাদ, (৬টি খণ্ড), এইগুলি তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ। শেষোক্ত গ্রন্থটি ৮ খণ্ডে সমাপ্ত করার পরিকল্পনা ছিল, কিন্তু ১৩২৯ সালের ৭ই কার্তিক রাত্রি ১২টা ১০ মিনিটে তাঁর মৃত্যু হওয়ায় শেষ খণ্ড দুটির রচনাও সম্ভবতঃ শেষ হয়নি। সম্প্রতি তাঁর কোন বর্ষীয়ান নিকটাত্মীয়ের মুখে শুনেছি যে দেবেন্দ্রবিজয় ঋগ্বেদের সম্পূর্ণ বঙ্গানুবাদও করেছিলেন, কিন্তু ভাটপাড়ার রক্ষণশীল পণ্ডিতসমাজ শূদ্রের রচনা বলে অবজ্ঞা করায় দেবেন্দ্রবিজয় মনঃক্ষোভে সমস্ত পাণ্ডুলিপিটি নষ্ট করে ফেলেন।

(২৮৭) দেবেন্দ্রবিজয় বসু ১৩০৩ সালের ৬ই শ্রাবণ (২০ জুলাই, ১৮৯৬) 'সংগ্রাহকের নিবেদন' অংশ লেখার সময়ে 'কুড়ি বৎসরের কিছু অধিক' কাল পূর্বের, অর্থাৎ ১৮৭৫-৭৬ সালের কথা বলতে গিয়ে সামান্য যে দু'একটি তথ্যগত ভুল করেছেন, তার প্রথমটি হোল এই যে, ঐ সময়ে অর্থাৎ ১৮৭৫-৭৬ সালে হিন্দুধর্ম পুনরুজ্জীবন-আন্দোলন সুরু হয়েছিল বলে তিনি যে উল্লেখ করেছেন, তা ঠিক নয়। বস্তুত এ-আন্দোলন ঠিকমতো সুরু হয়েছিল কিছুপরে, আশির দশকে। করুণাময় মজুমদার তাঁর 'চন্দ্রনাথ বসু : জীবন ও সাহিত্য' (১৯৮৪) গ্রন্থে সঠিক তারিখ নির্দেশ করে লিখেছেন, 'নব্যহিন্দু আন্দোলন আনুষ্ঠানিকভাবে সুরু হয় ২৮শে অক্টোবর, ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দে।' (পৃঃ ১০)। সত্তরের দশকটিকে এই আন্দোলনের প্রস্তুতিপর্ব বলা যায়। তথ্যগত দ্বিতীয় ত্রুটিটি হোল—দেবেন্দ্রবিজয় লিখেছেন, 'থিওজফির দল বোধ হয় সেই আন্দোলনের (নব্যহিন্দু আন্দোলনের) সূত্রপাত করেন।' এটিও ঠিক নয়। প্রকৃতপক্ষে ১৮৭০ খ্রীস্টাব্দে মুঙ্গেরে এই আন্দোলনের প্রধান দুই প্রবক্তা শশধর তর্কচূড়ামণি ও কৃষ্ণপ্রসন্ন সেনের সাক্ষাৎ-পরিচয়ের সময়কে এই আন্দোলনের নীহারিকা অবস্থা বলা যায়। ক্রমে তার চৌহদ্দি বাড়তে থাকে এবং ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে অ্যালবার্ট-হলে 'ভারতের মূর্চ্ছাভঙ্গ' শীর্ষক কৃষ্ণপ্রসন্নের প্রথম কলকাতা-বক্তৃতার মধ্যে ভাবী আন্দোলনের ভূমি প্রস্তুত

হয়। ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দে General Assembly's Institution-এর অধ্যক্ষ রেভাঃ উইলিয়াম হেষ্টির সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের মসীযুদ্ধের মধ্যেই আন্দোলনটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘটে। পক্ষান্তরে, ১৮৮২ সালের এপ্রিল মাসে কলকাতায় 'Bengal Theosophical Society' স্থাপিত হলেও তার কার্যধারা এবং প্রভাব অনেকদিন পর্যন্ত কলকাতার নেতৃস্থানীয় কয়েকজন বুদ্ধিজীবীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এ বিষয়ে তারেশরঞ্জন মিত্রের 'থিওসফিক্যাল সোসাইটির ইতিহাস' (১৯৬৪) গ্রন্থটি দ্রষ্টব্য।

দেবেন্দ্রবিজয়-প্রদত্ত আর একটি সংবাদকে সরাসরি 'ভুল' না বলে বলা উচিত 'অসম্পূর্ণ'। সহপাঠী গোপালচন্দ্রের দেশপ্রীতি ও কর্মশক্তির পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি লিখেছেন, 'গোপাল যে বৎসর আইন পরীক্ষা দিবে, সেই সময় আমাদের দেশে প্রাতঃস্মরণীয় লর্ড রিপণ মহোদয় স্বায়ত্তশাসন প্রচলিত করেন। গোপাল সেই যুগে উত্তরপাড়ার মিউনিসিপ্যালিটিতে নির্বাচন প্রথা প্রচলিত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিল।...উত্তরপাড়ার মুখোপাধ্যায় গোষ্ঠীর কিরূপ আধিপত্য তাহা অনেকেই জানেন। তাঁহারা প্রায় সকলেই এই নির্বাচন প্রথার বিরোধী ছিলেন।' বস্তুতপক্ষে উত্তরপাড়ার একই মুখোপাধ্যায় পরিবারের দুই প্রধান ব্যক্তি, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও তাঁর বৈমাত্রেয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের মধ্যে দীর্ঘ প্রায় ১৫ বৎসর ব্যাপী রেষারেষি এই সময়ে উত্তরপাড়া মিউনিসিপ্যালিটিতে নির্বাচন প্রথা চালু করার পক্ষে ও বিপক্ষে শক্তি-পরীক্ষায় নেমেছিল। জয়কৃষ্ণ প্রভৃত জনহিতকর কাজ করলেও কৌশলী বিজয়কৃষ্ণ, যিনি প্রায় ১৪ বছর ধরে মিউনিসিপ্যালিটির মনোনীত 'চেয়ারম্যান' পদে (এই পদে তাঁকে বসিয়েছিলেন স্বয়ং জয়কৃষ্ণ) অধিষ্ঠিত থেকে, এবং জয়কৃষ্ণের কনিষ্ঠ সহোদর বুদ্ধিহীন রাজকৃষ্ণ-কে হাত ক'রে জয়কৃষ্ণকে লোকচক্ষে হেয় ও অপমানিত করার এই সুযোগ পেয়ে সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। অপরদিকে জয়কৃষ্ণের সমর্থক-গোষ্ঠীও নির্বাচন প্রথা চালু করে মিউনিসিপ্যালিটিতে বিজয়কৃষ্ণের নিরঙ্কুশ আধিপত্যকে খর্ব করার জন্যে উঠে-পড়ে লাগেন। সুতরাং 'মুখোপাধ্যায় পরিবারের... প্রায় সকলেই এই নির্বাচন প্রথার বিরোধী' ছিলেন, দেবেন্দ্রবিজয়ের এই সংবাদটি অসম্পূর্ণ। এ বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণের জন্য নীলমণি মুখোপাধ্যায়ের 'A Bengali Zamindar' (1975) গ্রন্থের 'Municipal Reform and

Uttarpara' অধ্যায় দ্রষ্টব্য। এ প্রসঙ্গে দেবেন্দ্রবিজয় দাবী করেছেন, 'একমাত্র গোপালের চেষ্টায়, যত্নে ও উদ্যোগে এই নির্বাচন প্রথা উত্তরপাড়ায় প্রবর্তিত হয়', কিন্তু নীলমণিবাবুর উপরোক্ত গ্রন্থে আমরা এ দাবীর কোন সমর্থন দেখতে পাইনি। কেননা, এই শক্তির লড়াইয়ে জয়কৃষ্ণ বা বিজয়কৃষ্ণের দলের কোন ব্যক্তি বিশেষরই তিনি নাম করেন নি। তবে দেবেন্দ্রবিজয়ের বক্তব্য থেকে আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে গোপালচন্দ্র এই নির্বাচন প্রথা চালু করার পক্ষপাতী জয়কৃষ্ণের দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং প্রভূত পরিশ্রমও করেছিলেন।

(২৮৮) গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং দেবেন্দ্রবিজয় বসুর সঙ্গে 'নিবাস-ত্রিবেণী' কালিদাস ভট্টাচার্যও ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দে মেট্রোপলিটন ইনষ্টিটিউসনের এফ্. এ ক্লাসে ভর্তি হয়েছিলেন কিনা, তা দেবেন্দ্রবিজয় স্পষ্টকরে কোথাও বলেন নি বটে, কিন্তু তাঁদের তিনজনের ঘনিষ্ঠতার যে নিদর্শনগুলি তিনি তাঁর রচনায় তুলে ধরেছেন ['কালি গোপালের সহপাঠী ছিল', 'গোপাল যখন কালেজে পড়িত, তখন আমি ও কালি তাহার সহিত বরাবর একত্রে থাকিতাম', 'সেই সময়ে গোপাল যে সকল কবিতা লিখিত, তাহার অধিকাংশই কালি নিজের খাতায় লিখিয়া লইত। যে তারিখে যে কবিতা রচিত হইত, তাহাও কালি অনেক স্থলে লিখিয়া রাখিত……ইহাব্যতীত গোপাল তাহার নিজের কবিতার খাতা খানিও পরে কালিকে দিয়াছিল,' ইত্যাদি], বিশেষতঃ কালিদাসের ও গোপালচন্দ্রের অকাল-প্রয়াণের বেদনাকে সংক্ষিপ্ত পরিসরে যে ভাবে কারুণ্য-মণ্ডিত ভাষায় প্রকাশ করেছেন ['কালিও আজ তিন মাস হইল আমাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছে।…… যৌবনের প্রথম উন্মেষ হইতে যে দুই হৃদয়ের সহিত আমার এ ক্ষুদ্র হৃদয়কে বন্ধুত্বের ডোরে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলাম, সেই দুইজনেই সে শিকল কাটিয়া চলিয়া গেল !'], এসব থেকে বোঝা যায় যে কালিদাসও কলেজ-জীবনে তাঁর বা তাঁদের সহপাঠী ছিলেন এবং 'হিন্দুস্থান ইউনিয়নে'রও সভ্য ছিলেন।

(২৮৯) ৫৮-সংখ্যক পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

(২৯০) ১৮৩০ সালের গণ-বিপ্লব ব্যর্থ হলে ম্যাট্‌সিনিকে ফ্রান্সের 'মার্সাই' ('Marseilles)-এ নির্বাসিত করা হয়। এখানে অবস্থানকালে তিনি ১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দে ইয়ং ইতালী সমিতি ('La Giovine Italia') গঠন করেন।

(২১১) রাজকৃষ্ণ রায়ের 'নানা বিষয়িনী কবিতা প্রসবিনী' 'বীণা' নামক মাসিক পত্রিকাটি ১২৮৫ সালের বৈশাখ (এপ্রিল ১৮৭৮) থেকে ১২৯৪ সালের আশ্বিন পর্যন্ত জীবিত ছিল, তবে নিয়মিতভাবে সকল সংখ্যা প্রকাশিত হয়নি।

(২১২) 'চৈতালী কাব্যের নেপথ্য ইতিহাস'—প্রতাপ মুখোপাধ্যায়। 'শারদীয়া শিল্প ও সংস্কৃতি', ১৩৮৮।

(২১৩) 'কলকাতার ছাত্রসমাজে বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ'—প্রতাপ মুখোপাধ্যায়। 'কলকাতা পুরশ্রী,' ১২ই ডিসেম্বর, ১৯৮১।

(২১৪) 'এডুকেশন গেজেট' ও 'অবোধ বন্ধু' পত্রিকাদ্বয়ে প্রকাশিত কবিতাগুলির মধ্যে ১৪টি কবিতা নিয়ে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কবিতাবলী' প্রথম প্রকাশিত হয় ২১ নভেম্বর, ১৮৭০। এর ২য় সংস্করণ ১৮৭১ খ্রীস্টাব্দে এবং ৩য় সংস্করণ ১৪ই জুলাই, ১৮৭৬ সালে প্রকাশিত হয়। Bengal Library Catalogue, 3rd Quarter, 1876, pp. 4-5.

(২১৫) নবীনচন্দ্র সেনের 'অবকাশরঞ্জিনী' কাব্যের প্রথম ভাগ প্রকাশিত হয় ১৮৭১ খ্রীস্টাব্দে।

(২১৬) রাজকৃষ্ণ রায়ের 'অবসর সরোজিনী' কাব্যের প্রথম ভাগ প্রকাশিত হয় ১৩ই মে, ১৮৭৬।

(২১৭) ১২৮১ সালের কার্তিক সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' 'কমলাকান্তের দপ্তরে'র অন্তর্গত 'আমার দুর্গোৎসব' রচনাটি প্রকাশিত হয়।

(২১৮) ৪২-পৃষ্ঠার বিভিন্ন কবিতার এই সঙ্কলন গ্রন্থটি 'G. P. Roy & Co, 21 Bowbazar Street, Calcutta' দ্বারা মুদ্রিত হয়ে 'জাতীয় সঙ্গীত'-প্রথম ভাগ (স্বদেশানুরাগোদ্দীপক সঙ্গীতমালা)' ও 'National Song Book, Part-I (Patriotic Songs)' এই দুই নাম নিয়ে ১৮৭৬ সালে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থোদ্ধৃত 'বিজ্ঞাপন' (ভূমিকা) রচনার তারিখ হোল ৬ই ফাল্গুন, ১২৮১ সাল। গ্রন্থের প্রথম সঙ্গীত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মিলে সবে ভারত সন্তান…'। মনোমোহন বসুর 'হরিশ্চন্দ্র নাটক' থেকে 'দিনের দিন সবে দিন…'কবিতাটিও এখানে সঙ্কলিত হয়েছে। অনতিবিলম্বে 'জাতীয় সঙ্গীত' নাম নিয়ে আরো কতকগুলি সঙ্কলন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

(২১৯) বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' উপন্যাসটি 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার ১২৮৭ চৈত্র থেকে ১২৮৯ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থাকারে

প্রকাশের তারিখ হোল ১৫ই ডিসেম্বর, ১৮৮২ সাল।

(৩০০) যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের ম্যাট্‌সিনির জীবন কথা তাঁর 'আর্যদর্শন' পত্রিকার ১২৮২ সালের ভাদ্র (আগষ্ট ১৮৭৫) সংখ্যা থেকে প্রকাশিত হতে শুরু করে। ঠিক দশ বছর পরে, ১২৯২ সালের শ্রাবণ সংখ্যায় তাঁর 'আমেরিকা ও ইতালীর ইতিহাস-সম্বলিত জেনারেল জোসেফ গ্যারিবল্ডীর জীবনবৃত্ত' রচনাটি প্রকাশিত হয়। পরবর্তী ভাদ্র-আশ্বিন এই যুগ্ম সংখ্যার পর রচনাটি আর প্রকাশিত হয়নি, কেননা 'আর্যদর্শন' পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। ১৮৯০ সালে সমগ্র রচনাটি 'গ্যারিবল্ডীর জীবনবৃত্ত' নামে প্রকাশিত হয়। এই সময়কালের মধ্যে গ্যারিবল্ডীর জীবনী আর কেউ লিখেছিলেন এমন সন্ধান এখনও পর্যন্ত পাইনি। কোন কোন পত্রিকায়, যেমন 'The Indian Mirror' পত্রিকায়, গ্যারিবল্ডীর ব্যক্তি-জীবনের কিছু সংবাদ, যথা তাঁর 'The Thousand' নামক গ্রন্থের প্রকাশ, বা তাঁর কন্যার মৃত্যু সংবাদ, কচিৎ কদাচিৎ প্রকাশিত হতে দেখা যায়। তবে ইংরেজি 'Q' অক্ষরের সঙ্গে 'U' অক্ষরটি যেমন অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত, তেমনি ইতালীর মুক্তি-সংগ্রামে ম্যাটসিনির সঙ্গে গ্যারিবল্ডীর নামটিও স্বতঃসিদ্ধবৎ যুক্ত হয়ে ঐ সময় থেকেই উচ্চারিত হতে থাকে।

(৩০১) 'Indian Association'-এর প্রাথমিক অবস্থার সঙ্গে নেপথ্যচারী এই ক্ষুদ্র ইতিহাসটি যোগেশচন্দ্র বাগলের 'History of the Indian Association' গ্রন্থে নেই, যদিচ প্রথম এক বছর 'ভারতসভা'কে যে নানা দিক থেকে আগত অনেক ঝড়-ঝাপটা সহ্য করতে হয়েছে, সে কথার উল্লেখ করে তিনি লিখেছেন, 'During the first year of its existence, the Indian Association had to face formidable opposition from different quarters' (p. 10), এবং প্রমাণ স্বরূপ একমাত্র 'British Indian Association' এর নামোল্লেখ করেছেন।

(৩০২) বিষয়টি সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার জন্য অমলেন্দু দে রচিত 'বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ' (১৯৭৪)-এবং 'Roots of seperatism in Nineteenth century Bengal' (1974) গ্রন্থদুটি দ্রষ্টব্য।

(৩০৩) 'British Paramountcy and Indian Renaissance, Part-II' (2nd edition, 1981), General Editor : R. C. Majumdar, p. 472.

(৩০৪) এবিষয়ে গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে কিছু আলোচনা করা হয়েছে।

(৩০৫) 'কবিতামালা'র 'প্রথম খণ্ডে'র ৯-সংখ্যক 'কোন বন্ধুর একবিংশ বয়সে' কবিতাটির পাদটীকানুষায়ী 'মুন্সেফ' কুমুদনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম ১৮৫৬-৫৭ সাল, অর্থাৎ তিনি ছিলেন গোপালচন্দ্র-দেবেন্দ্রবিজয়ের প্রায় সমবয়সী। ইনি কোন্ কলেজে পড়াশোনা করেন তা জানা যায়নি, তবে কলকাতার কোন কলেজের ছাত্র হিসাবে ইনিও 'হিন্দুস্থান ইউনিয়নে'র সভ্য ছিলেন এরূপ মনে হয়।

(৩০৬) কলকাতা হাইকোর্টের সুবিখ্যাত উকিল শ্রীনাথ দাসের (১৮২৯-১৯০৭) পুত্র সুরেন্দ্রনাথ দাস সম্পর্কে জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার-সঙ্কলিত 'বংশ পরিচয়, দ্বিতীয় খণ্ড' (ফাল্গুন, ১৩২৮) গ্রন্থের ২২৩-২২৪ পৃষ্ঠায় লিখিত সংবাদ এই—শ্রীনাথের মধ্যম পুত্র উপেন্দ্রনাথ (১৮৪৮-১৮৯৫) ছিলেন বিখ্যাত দেশ-প্রেমিক নাট্যকার এবং অপর পুত্র দেবেন্দ্রনাথ (১৮৫৭-১৯০৯) ছিলেন বহু-ভাষাবিদ্ অধ্যাপক ও গ্রন্থকার। এ দুজনের মধ্যবর্তী পুত্র সুরেন্দ্রনাথ সম্ভবত ১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন এবং তিনি তাঁর 'ভ্রাতাদের ন্যায় নির্ভীক ও স্বদেশ-হিতৈষী ছিলেন।' তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে ১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দে B.A এবং ১৮৭৭ খ্রীস্টাব্দে M. A পাশ করেন ['Presidency College Register, 1927', p. 104] 'অক্লান্ত পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের গুণে [তিনি] সহজেই কলেজে বৃত্তিলাভ করিতেন।' পরবর্তীকালে তিনি বিখ্যাত এটর্নী হন এবং 'এ ব্যবসায়ে প্রভূত অর্থ উপার্জন করেন। সুরেন্দ্র-বাবু ইংরাজী ভাষায় 'Depreciation of silver' নামে একটি পুস্তক লিখেন এবং Nation প্রভৃতি নানা কাগজে সম্পাদকীয় মন্তব্য লিখিতেন।' স্যার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারীর আত্মজীবনীমূলক 'স্মৃতিরেখা' (আশ্বিন, ১৩৪০) গ্রন্থের ১৭৩-পৃষ্ঠায় সুরেন্দ্রনাথ দাস সম্পর্কে প্রদত্ত সংবাদ এই যে আশির দশকে সুরেন্দ্রনাথ তাঁর বাড়িতে একটি সমিতি স্থাপন করেছিলেন। এখানে 'রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিশিষ্ট আলোচনা হইত' এবং সে-আলোচনা সভায় সাংবাদিক 'কৃষ্ণদাস পাল ও তাঁহার সহকারী মথুরার শেঠেদের দেওয়ান শ্রীযুক্ত শীতল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়…গণি-তাধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিদাস গড়গড়ি' প্রভৃতি যোগদান করতেন। স্যার দেব-প্রসাদের রচনা থেকে এই সমিতিটির নাম 'নিভৃত বান্ধব সভা' ছিল বলে মনে হয়। সুরেন্দ্রনাথের মৃত্যুকাল জানতে পারিনি।

(৩০৭) 'Memories of My Life and Times' (1932) B.C. Pal, p. 247.

(৩০৮) বিদেশী সরকারের দৃষ্টি এড়াবার জন্যেই এই সময়ে, 'উত্তরপাড়া হিতকরী সভা'য় ১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দের ২রা এপ্রিল তারিখে 'Joseph Mazzini' শীর্ষক বক্তৃতায় সুরেন্দ্রনাথ জোর গলায় ঘোষণা করেছিলেন, 'I need hardly remind you, gentlemen, that there are no secret associations in India ; and it is indeed not necessary that we should have any. We are not rebels ; we are not treasonably affected towards the Government. We are loyal subjects of Her Majesty the Queen.' ['Speeches of Babu Surendranath Banerjea, 1876-80', (1880) edited by Ram Chandra Palit, p. 79.] সুরেন্দ্রনাথ সারাজীবন একদিকে যেমন 'রাজভক্ত' থেকেছেন, অন্য দিকে তেমনি দেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সারাজীবন নিয়মতান্ত্রিক পথে আন্দোলনও চালিয়ে গেছেন। এদিক থেকে তাঁর সঙ্গে আইরিশ মুক্তি আন্দোলনের একদা প্রধান নেতা Henry Grattan (1746-1820)-এর বিশেষ সাদৃশ্য আছে। Grattan সম্পর্কে ঐতিহাসিক Hon'ble Emily Lawless তাঁর 'Ireland' (London, 5th edition, MD CCCXCII) গ্রন্থে লিখেছেন, 'He was consistently loyal and he was consistently patriotic. From the beginning to the end of his career, his patriotism never hindered him either from risking his popularity whenever he considered duty or the necessities of the case required him to do so ; a resolution which more than once brought him into sharp collision with his countrymen'. p, 328.

(৩০৯) 'সত্তর বৎসর' এবং 'Memories of My Life and Times' গ্রন্থদ্বয়ে বিপিনচন্দ্র অসংখ্য গুপ্ত-সমিতি ছিল বলে জানিয়েছেন, দেবেন্দ্রবিজয়ও 'হিন্দুস্থান ইউনিয়ন' ছাড়া 'দুই একটা এরূপ সভা ছিল' বলেছেন, আর দেবপ্রসাদও তাঁর 'স্মৃতিরেখা' গ্রন্থে 'কোথাও কোথাও গুপ্ত-সমিতি গঠিত' হয়েছিল বলে জানিয়েছেন।

(৩১০) 'Voluntary Associations and the Urban Public life in Bengal' (1980) Rajat Sanyal, p. 141,

(৩১১) কলকাতায় এরূপ একটি সমিতি স্থাপনের সংবাদ ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দের ২৬শে ডিসেম্বরের 'The Indian Mirror' পত্রিকায় এইভাবে প্রকাশিত হয়েছে, 'It is proposed to start another Native Association in India, and with that object a public meeting was held yesterday at 3-30 p.m. In course of time, we are afraid, we shall have as many Native Associations as B.A.'s and M.A's in Bengal'. (p. 5) দেশীয়দের সমিতি গঠনের প্রতি রাজভক্ত 'মিরার' পত্রিকার বিরাগ এখানে স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে। এই সমিতিটির নাম কি ছিল, অথবা তা আদৌ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কিনা তা জানতে পারিনি।

(৩১২) 'Voluntary Associations and the Urban Public life in Bengal'.—R. Sanyal, p. 225.

(৩১৩) 'The Indian Middle Classes' (1978) B.B. Misra, p. 348.

—•—

২.

'সঞ্জীবনী সভা'

নানাকারণে উনিশ শতকের সত্তর দশকের প্রথম দিক থেকেই ব্রাহ্ম-সমাজের প্রভাব প্রগতিশীল ছাত্রদের উপর থেকে কমতে সুরু করে,[১] তা আমরা পূর্ব অধ্যায়ে দেখেছি। এই দশকের মাঝামাঝি সময় থেকেই, বলতে গেলে, বঙ্গের দুই উদীয়মান রাজনীতিবিদ্ আনন্দমোহন বসু ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের যুগ আরম্ভ হয়। উভয়েই সদ্যবিলাত-প্রত্যাগত—প্রথমজন ব্যারিষ্টারী পেশায় নিযুক্ত থেকেও কলকাতার ছাত্রদের নিয়ে 'Students' Association' গঠনক'রে তাদের প্রকৃত দেশসেবক করে তোলার সাধনায় লিপ্ত, দ্বিতীয় জন অধ্যাপনা-সূত্রে ছাত্রদের নিকটতর সংস্পর্শে এসে স্বদেশের ও বিদেশের নানা বীরত্ব ও আত্মত্যাগের কাহিনী পরিবেশনের মাধ্যমে তাদের মধ্যে বৈপ্লবিক চেতনা সঞ্চারে নিবিষ্ট-চিত্ত। প্রধানতঃ সুরেন্দ্রনাথের মুখ থেকে উনিশশতকের প্রথমার্ধে সংঘটিত পরাধীন ইতালীর মুক্তিসংগ্রাম ও সেই সংগ্রামের অগ্রনায়ক ম্যাট্‌'সান ও তদীয় শিষ্য গ্যারিবল্ডীর অসামান্য ত্যাগ, বীরত্ব ও কর্মকুশলতার সংবাদ শুনে এবং আর্যদর্শনের পাতায় পাতায় সে সব কথা পড়ে সেকালের ছাত্রের দল উন্মত্ত-প্রায় হয়ে উঠছিল, এবং ম্যাট্‌সিনির আদর্শ অনুসরণ করে অচিরে বহু গুপ্ত-সমিতি গড়ে তুলেছিল, বিপিনচন্দ্র ও স্বার দেবপ্রসাদের স্মৃতিকথা সমূহে উল্লিখিত এরূপ ছাত্র-সৃষ্ট গুপ্ত-সমিতির অবস্থিতির সত্যতা 'হিন্দুস্থান ইউনিয়ন' দ্বারা প্রমাণিত হয়।

বিপিনচন্দ্র আরো সংবাদ দিয়েছেন যে এই রকম একটা গুপ্ত-সমিতির কথা তিনি জানেন, যে সমিতিতে প্রত্যেক সভ্যকে তলোয়ারের অগ্রভাগ দিয়ে বুক চিরে রক্ত দিয়ে প্রতিজ্ঞা পত্রে স্বাক্ষর করতে হোত। সঙ্গে সঙ্গে তিনি আবার জানাচ্ছেন যে এরূপ সমিতির সঙ্গে তিনি অবশ্য যুক্ত ছিলেন না।[২] এদিকে তাঁর বন্ধু, ব্রাহ্মসমাজের গগনচন্দ্র হোম (১৮৫৭-১৯২৭) মহাশয়ের জীবনস্মৃতি' [২রা ভাদ্র, ১৩৩৬] গ্রন্থের ২৭-২৮ পৃষ্ঠায় বরানগরের গঙ্গাতীরস্থ এক বাগানে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কর্তৃক বিপিনচন্দ্র পাল, তারাকিশোর চৌধুরী, সুন্দরীমোহন দাস, শরৎচন্দ্র রায়, আনন্দচন্দ্র মিত্র,

কালীশঙ্কর সুকুল এবং গগনচন্দ্র হোমের বুক চিরে রক্ত দিয়ে প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষরের যে বর্ণনা পাওয়া যায়, সেটিকে লক্ষ্য করেই যে বিপিনচন্দ্র পূর্বোক্ত গুপ্তসমিতির কথা বলেছেন, তাও মনে হয় না। কেননা, বিপিনচন্দ্রের ইংরেজি ভাষায় লিখিত আত্মজীবনীতে হেয়ার স্কুলের দোতালার একটি ঘরে ১৮৭৭ সালের শরৎ কালে ('autumn') শিবনাথ শাস্ত্রী কর্তৃক (গগনচন্দ্র হোম-কে বাদ দিয়ে) পূর্বোক্ত ছয় জনের দীক্ষাদানের একটি বর্ণনা পাওয়া যায়। তবে সেখানে লম্বা লম্বা সবুজ কলা পাতায় কামনা, ক্রোধ, ঈর্ষা প্রভৃতির কথা লিখে বিশুদ্ধ মাখনে ('pure clarified butter' ? ঘি) ডুবিয়ে প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডকে মন্ত্রউচ্চারণ-পূর্বক প্রদক্ষিণ ক'রে সেগুলিকে ঐ অগ্নিকুণ্ডে সমর্পণ করার কথা আছে[৩]। (গ্রন্থের ৩১১-পৃষ্ঠায় এই সমিতি গঠনের বা দীক্ষাদানের সময়কালকে বিপিনচন্দ্র আবার ১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দের মাঝামাঝি', 'About the middle of 1876' বলেছেন।) এর উপর শিবনাথ শাস্ত্রীর 'আত্মচরিত', গ্রন্থের 'একাদশ পরিচ্ছেদে' যে একটি দীক্ষাদান-অনুষ্ঠানের উল্লেখ আছে, (যেটি '১৮৭৮ জানুয়ারী-মে' মাসের কোন সময়ে অনুষ্ঠিত হয়েছিল), সেখানে দেখা যায় যে, 'কয়েকজন উৎসাহী ব্রাহ্ম' কর্তৃক 'ঘনিবিষ্ট দল সৃষ্টি করিবার' জন্য তিনি আমন্ত্রিত হয়ে এই রকম একটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন, যেখানে 'উপাসনান্তর প্রতিজ্ঞা পত্রে স্বাক্ষর করিয়া, আগুন জ্বালিয়া, ঈশ্বরের নাম লইতে লইতে তাহা প্রদক্ষিণ পূর্বক', অগ্নিতে নিজের নাম 'অর্পণ পূর্বক, প্রার্থনান্তর প্রতিজ্ঞা পুনরায় পাঠ করিয়া স্বাক্ষর' করার কথা পাওয়া যায়। ঐ দলে বিপিনচন্দ্র পাল, সুন্দরীমোহন দাস, আনন্দচন্দ্র মিত্র ছাড়া, শিবনাথের 'যতদূর স্মরণ হয়, ময়মনসিংহের শরচ্চন্দ্র রায়ও ঐ দিন উপস্থিত ছিলেন।' শিবনাথ এবং 'ঐ দলের একজন গবর্ণমেণ্টের চাকুরি'-জীবী কিছুদিন পরে সরকারী চাকুরি ছেড়ে ঐ দলে যোগদান করেছিলেন।[৪] বিপিনচন্দ্র অবশ্য তাঁর ইংরেজি আত্মজীবনীতে জানিয়েছেন যে তাঁদের ঐ সমিতি বা দলটি সুরেন্দ্রনাথের প্রভাবে গড়ে ওঠা 'Political society' (? গুপ্তসমিতি) থেকে ভিন্ন ছিল।[৫] এখানে স্পষ্টতঃই দেখা যাচ্ছে যে উপরোক্ত তিন জনের স্মৃতিকথাতে স্থানগত-কালগত যেমন পার্থক্য আছে, তেমনি প্রকরণগত পার্থক্যও কম নয়। সুতরাং আরো বিস্তৃততর তথ্য না পাওয়া পর্যন্ত এই বর্ণনীয় বিষয়গুলি সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তে পৌছানো যায় না।

যদিচ বিপিনচন্দ্র ঘোষণা করেছেন যে বুকচিরে রক্ত দিয়ে প্রতিজ্ঞাপত্রে

স্বাক্ষর করা হোত, এমন এক [? নাকি একাধিক, কেননা সুরেন্দ্রনাথ বহু গুপ্ত-সমিতির 'সভাপতি' ছিলেন[৬] বলে যখন তিনি সংবাদ দিচ্ছেন[৭], তখন ঐ জাতীয় না হোক্, সাধারণ বহু গুপ্ত-সমিতির সন্ধান যে তিনি রাখতেন, সেকথা তাঁর উভয় ভাষায় রচিত আত্মজীবনী থেকেই পাওয়া যায়] গুপ্ত-সমিতির সংবাদ তিনি জানেন, অথচ কেন যে এমন একটি গুপ্ত-সমিতিরও নামধাম তিনি প্রকাশ করলেন না (যেখানে ইতিপূর্বেই রবীন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁদের সৃষ্ট একটি গুপ্ত-সমিতির কথা প্রকাশ করেছেন), সেটাই বড় বিস্ময়ের কথা। তবে কি ঐ সময়ের প্রায় অর্ধশত বৎসর কাল পরেও ইংরেজ পুলিশের ভয়[৮] তাঁর ছিল?

আবার, কেবলমাত্র 'বিস্ময়ের কথা' এই পর্যন্ত বলেই আমরা থেমে থাকতে পারি না, কেননা এই বিষয়ে বিপিনচন্দ্রের নীরবতা পরবর্তী কালের বাংলা তথা ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস-লেখকদের কারুর কারুর কিছু বিভ্রান্তির কারণ হয়েছে দেখা যায়। সেই বিভ্রান্তি অপনোদনের কথঞ্চিৎ প্রয়াসই বর্তমান অধ্যায় রচনার একটি প্রধান উদ্দেশ্য।

ঊনিশ শতকের সত্তরের দশকে কলকাতার ছাত্রদের মধ্যে গুপ্ত-সমিতির অস্তিত্ব সম্পর্কে বিপিনচন্দ্র পালের পূর্বে আর কোন ঐতিহাসিক আলোকপাত করেছেন কিনা, তার সন্ধান পরবর্তী কালের ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস লেখকদের রচনা থেকে আমরা এখনও পাই নি। (দেবেন্দ্রবিজয় বসুর বক্তব্যকে এখন বাদ দিচ্ছি।) তবে তাঁদের কেউ কেউ যে বিপিনচন্দ্রের মন্তব্যকে প্রায়-স্বীকার করে নিয়েই অগ্রসর হয়েছেন, এবং ঐ সময়ের গুপ্ত-সমিতির নিদর্শন হিসাবে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-রবীন্দ্রনাথের জীবনের সঙ্গে জড়িত 'তথাকথিত' (পরে এই শব্দটি ব্যবহারের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে) 'সঞ্জীবনী সভা'-র উল্লেখ করেছেন, তা আমরা দেখতে পাই। এই সব ইতিহাস-গ্রন্থের বিস্তৃত অংশসমূহ উদ্ধারের প্রয়োজন নেই, তবে এই লেখকদের বক্তব্যগুলির সার সঙ্কলন করলে দেখা যায় যে, কোন লেখক কলকাতার ছাত্র-সাধারণের প্রসঙ্গ না তুলেও দাবী করেছেন যে 'সঞ্জীবনী সভা' হোল বাংলার 'প্রথম' গুপ্ত-সমিতি,[৯] কেউ কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করেও শেষ পর্যন্ত বিপিনচন্দ্রের মন্তব্যকে অনুসরণ করে গুপ্ত-সমিতির নিদর্শন হিসাবে 'সঞ্জীবনী সভা'র নাম উল্লেখ করেছেন,[১০] কেউ কেউ স্পষ্টতই ছাত্রদের গুপ্ত-সমিতির উদাহরণ দিতে

গিয়ে 'সঞ্জীবনী সভা'র উল্লেখ করেছেন,[১১] কোন গবেষক আবার এতদূর পর্যন্ত অনুমান করেছেন যে 'সঞ্জীবনী সভা'র কথা মনে রেখেই বিপিনচন্দ্র পাল রক্ত দিয়ে অঙ্গীকার পত্র স্বাক্ষর করার গুপ্ত-সমিতিটির কথা বলেছেন।[১২] এক্ষেত্রে লক্ষণীয় এই যে, বিপিনচন্দ্র পাল তাঁর আত্মজীবনীদ্বয়ে সত্তরের দশকে মূলতঃ ছাত্রদের দ্বারা গঠিত গুপ্ত-সমিতির কথাই একাধিকবার বলেছেন। কিন্তু তাব নিদর্শন হিসাবে এই 'সঞ্জীবনী সভা'-কে গ্রহণ করা আদৌ সঙ্গত হবে কিনা, এ প্রশ্ন ঐতিহাসিকদের অনেকেরই মনে জাগেনি বলে মনে হয়, অন্ততঃ তাঁদের লেখা থেকে তা খুব স্পষ্ট ভাবে বোঝা যায় না। [কেউ কেউ যে একটু ইতস্ততঃ করেছেন, সেকথা মনে রেখেই একথা বলা হচ্ছে] যদিচ সভাটির গঠন [Composition]-টি একটু খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করলে এ-প্রশ্ন জাগাই স্বাভাবিক ছিল।

এ প্রশ্নের উত্তর সন্ধানের পূর্বে যেহেতু প্রশ্নটি উঠেছে 'সঞ্জীবনী সভা'-কে নিয়ে, অতএব সভাটির সময়কাল দেখে নেওয়া দরকার। তবে তার আগে আরো কিছু প্রাসঙ্গিক বিষয় আলোচনা করে নিলে ভাল হয় বলে মনে করি। একটি 'গুপ্ত-সমিতি' রূপে তথাকথিত 'সঞ্জীবনী সভা'টির অস্তিত্ব সম্পর্কে আমরা সর্বপ্রথম সচেতন হই 'প্রবাসী' পত্রিকার ১৩১৮ ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের ধারাবাহিক রচনা [ভাদ্র ১৩১৮ থেকে শ্রাবণ ১৩১৯ পর্যন্ত প্রকাশিত এই ১২ কিস্তি রচনা ১৯১২ খ্রীস্টাব্দের ২৫শে জুলাই 'জীবন স্মৃতি' গ্রন্থ নামে প্রকাশিত হয়[১৩]] 'জীবনস্মৃতি'-র 'স্বাদেশিকতা' অংশটি থেকে। রবীন্দ্রনাথ সেখানে লিখেছেন, 'জ্যোতিদাদার উদ্যোগে আমাদের একটি সভা হইয়াছিল, বৃদ্ধ রাজনারায়ণ বাবু ছিলেন তাহার সভা-পতি। ইহা স্বাদেশিকের সভা।' লক্ষণীয়, রবীন্দ্রনাথ এখানে সভাটিকে যেমন 'স্বাদেশিকের সভা' বলেছেন, 'সঞ্জীবনী সভা' এরূপ নাম উল্লেখ করেন নি, তেমনি সভাটির নির্দিষ্ট সন-তারিখেরও উল্লেখ করেন নি।

রবীন্দ্রনাথের পরে আমরা 'ভারতী' পত্রিকার ১৩২১ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখিত 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি-৮' রচনায় 'সভা'টির নাম যে 'সঞ্জীবনী সভা' তা প্রথম জানতে পারি।[১৪] রচনাটির সূত্রপাতই হয়েছে এইভাবে 'এই সময়ে জ্যোতিবাবুর উদ্যোগে আর একটি সভা স্থাপিত হইয়াছিল। সেই সভার নাম ছিল 'সঞ্জীবনী সভা' (পৃঃ ৭৬২)। লক্ষণীয় এই যে বাক্য দুটি 'কোটেশন চিহ্ন' বিহীন, অর্থাৎ

বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়-প্রদত্ত প্রথম কিস্তি (বৈশাখ, ১৩২১) রচনার পাদটীকানুযায়ী বাক্য দুটি 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মুখের কথা অবিকল' নয়, বাক্য দুটি বসন্তকুমারের রচনা। তবে বিষয়টি যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মুখ থেকে শুনেই বসন্তকুমার নিজের ভাষায় লিখেছেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।[১৫] আরও লক্ষণীয় এই যে 'জ্যোতিবিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি'-তেও সভাটির কোন নির্দিষ্ট সময়েব উল্লেখ নেই। প্রথম বাক্যটির প্রথমে ব্যবহৃত 'এই সময়ে' শব্দ দুটি অনির্দেশ্য-কাল জ্ঞাপক, বিশেষতঃ পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে (গ্রন্থের 'সাহিত্য-চর্চা ও সমাজ সংস্কার' পরিচ্ছেদে) ঠাকুর-পরিবারের যুবকদের সাহিত্য ও সমাজ সম্পর্কিত নানাবিধ ক্রিয়াকলাপের বর্ণনা আছে, তবে সেখানেও নির্দিষ্ট কোন সাল তারিখের উল্লেখ নেই।

'সভা'টি সম্পর্কে আমরা তৃতীয় উল্লেখ পাই সাপ্তাহিক 'বিজলী' পত্রিকার ১৩২৯ সালের ২৬শে শ্রাবণ (১১ই আগষ্ট, ১৯২২) সংখ্যায় বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষের 'বোমার যুগের কাহিনী' শীর্ষক প্রায়-ধারাবাহিক[১৬] রচনায়, সেখানে বারীন্দ্রকুমার লিখেছেন, 'আমাদের এই সত্যিকার দেশ উদ্ধারের আগে পোষাকী দেশ উদ্ধারের চেষ্টা অনেকবার হয়ে গেছে, অন্ততঃ দুটি গুপ্ত সমিতির কথা আমিই জানি। প্রথম যখন দাদাবাবুরা (রাজনারায়ণ বসু ছিলেন বারীন্দ্রকুমারের মাতামহ, লেখক তাঁকেই দাদা-বাবু' বলে উল্লেখ করেছেন) যুবা ও হাজার হুজুগের রঙ্গী ছিলেন, তখন তাঁরা একবার গুপ্ত সমিতি স্থাপন করেন; এখনকার অনেক বড় বড় মানুষ তা'তে ছিলেন, তাঁদের কয়েকজন এখনও ইহলোকে, বাকি পরলোকে। তা'তে দীক্ষা দেওয়া হতো একটি অন্ধকার ঘরে। সেখানে বেদীতে লাল সালুর ওপর মড়ার মাথা রাখা হোত, তার দু'পাশে দেশানুরাগের প্রতীক দু'টি মোমবাতি জ্বলতো আর তলোয়ার ঝলমল্ করতো। বাঙ্গালীর দেশানুরাগ তখন ছিল যা', তার ঠিক প্রতীক মোমবাতিই বটে, যতক্ষণ সুতো আর মোম ততক্ষণ আলো। তাঁদের অতি গম্ভীর চালে সভা বস্‌তো তাতে দেশে বিদ্রোহ জাগাবার লাখ ফন্দী দরিদ্রের মনোরথের মতো উঠতো আর হৃদি-হ্রদে লীন হ'তো। ঘরটির কোণে একজন কিন্তু সভ্য বসে থাকতেন আর মাঝে মাঝে প্রত্যেক প্রস্তাবের উত্তেজনার মুখে বলতেন, 'কিস্যু হবে না'। শেষে সেই বুদ্ধিমানের কথাই ফললো, জীবনের নাগর-দোলায় পাক খেতে খেতে কে কোথায় গেলেন তার পাত্তা রইলো না।'

(পৃঃ ৫)। লক্ষণীয়, এখানে বারীন্দ্রকুমার ঘোষ 'সভা'টির কোন নাম ['সঞ্জীবনী সভা' বা 'হামচু পামু হাফ্'] বলেন নি, 'সভা'টির কোন সময়-কালও নির্দেশ করেন নি। তবে তিনি সভাগৃহের বর্ণনায় 'বেদীতে লাল সালুর ওপর মড়ার মাথা', তার দুপাশে দুটি জ্বলন্ত মোমবাতির কথা যা বলেছেন, তা অল্প কিছু দিন পূর্বে প্রকাশিত (ফাল্গুন, ১৩২৬) 'জ্যোতিরিন্দ্র-নাথের জীবন স্মৃতি'-র সঙ্গে সামান্য মেলে বটে, কিন্তু সেখানেও 'তলোয়ার ঝল্‌মল্' করার ছবি আমরা দেখতে পাই না। আর 'অন্ধকার-ঘর' এবং 'দীক্ষা' এই শব্দ দুটি ছাড়া রবীন্দ্রনাথের 'জীবন স্মৃতি'র সঙ্গে বারীন্দ্রকুমারের বর্ণনার কোন মিলই নেই।

'সভা'টি সম্পর্কে চতুর্থ, এবং এখন পর্যন্ত সর্বশেষ যে উল্লেখ আমরা পেয়েছি, তা রবীন্দ্রনাথের 'আত্ম পরিচয়' [প্রথম প্রকাশ ১লা বৈশাখ, ১৩৫০] গ্রন্থ-ধৃত পঞ্চম প্রবন্ধে। প্রথম সংস্করণের 'আত্মপরিচয়' গ্রন্থটি আমরা দেখিনি, তবে গ্রন্থটির 'পুনর্মুদ্রণ, চৈত্র ১৩৫২' সংস্করণের গ্রন্থ-শেষে মুদ্রিত 'বিজ্ঞপ্তি' অংশে এই পঞ্চম প্রবন্ধটি রচনার ও প্রকাশের যে ইতিহাস পাওয়া যায় তা হল : 'সপ্ততিবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে কলিকাতা টাউন হলে যে রবীন্দ্র-জয়ন্তী (১১ পৌষ, ১৩৩৮) অনুষ্ঠিত হয়, সেই উৎসবে পাঠ করিবার জন্য এই গ্রন্থের পঞ্চম প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছিল এবং 'প্রতি-ভাষণ' নামে পুস্তিকাকারে মুদ্রিত হইয়াছিল। রচনাটি দীর্ঘ বলিয়া তথায় পঠিত হইতে পারে নাই, ছাত্র-ছাত্রীগণ কর্তৃক সেনেট হলে অনুষ্ঠিত (১৭ই পৌষ, ১৩৩৮) রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসবে এই প্রতিভাষণ কবি পাঠ করেন।' (পৃঃ ১৩২-৩৩)। এই রচনাটিতেও রবীন্দ্রনাথ সভাটির নাম 'সঞ্জীবনী সভা' [বা 'হামচুপামুহাফ্'] বলে উল্লেখ করেন নি, বা সভাটির কোন সময় কালও নির্দেশ করেন নি। তিনি লিখেছেন, 'জ্যোতি দাদা এক গুপ্ত সভা স্থাপন করেছেন, একটি পোড়ো-বাড়িতে তার অধিবেশন, ঋগ্‌বেদের পুঁথি মড়ার মাথার খুলি আর খোলা তলোয়ার নিয়ে তার অনুষ্ঠান, রাজ নারায়ণ বসু তার পুরোহিত ; সেখানে আমরা ভারত-উদ্ধারের দীক্ষা পেলেম' (পৃ. ৮৭)। এখানে লক্ষণীয় এই যে 'ঋগ্‌বেদের পুঁথি মড়ার মাথার খুলি আর খোলা তলোয়ার'-এর কথা তাঁর 'জীবন স্মৃতি'তে নেই, 'জ্যোতিরিন্দ্র নাথের জীবনস্মৃতি'তে 'লাল রেশমে জড়ান বেদমন্ত্রের এক খানা পুঁথি··· টেবিলের দুই পাশে দুইটি মড়ার মাথা'-র উল্লেখ আছে, কিন্তু 'খোলা

তলোয়ার'-এর কথা সেখানেও নেই। তাহলে রবীন্দ্রনাথ এই 'খোলা তলোয়ার'-এর কথা কোথায় পেলেন? তিনি কি বারীন্দ্রকুমার ঘোষের পূর্বোল্লিখিত 'বোমার যুগের কাহিনী' রচনাটি ইতিমধ্যে পড়ে ছিলেন?

'আত্মপরিচয়' গ্রন্থের এই ৫নং রচনাটি লেখার এক যুগেরও অধিক পূর্বে 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি' ধারাবাহিকভাবে 'ভারতী'তে এবং কিছু পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়ে গেছে, এ সংবাদ নিশ্চয়ই রবীন্দ্রনাথের অজানা ছিল না। বিশেষতঃ তাঁর অত্যন্ত প্রিয় 'জ্যোতিদাদা', যিনি 'সাহিত্যের শিক্ষায় ভাবের চর্চায় বাল্যকাল হইতে' তাঁর 'প্রধান সহায়'[১৭] ছিলেন, যিনি '…ভিতরে বাহিরে সকল দিকেই সমস্ত বিপদের সম্ভাবনার মধ্যে তিনি আমাকে মুক্তি দিয়াছেন;—কোনো বিধি বিধানকে তিনি ভ্রূক্ষেপ করেন নাই এবং আমার সমস্ত চিত্তবৃত্তিকে সংকোচ মুক্ত করিয়া দিয়াছেন'[১৮] বলে রবীন্দ্রনাথ সকৃতজ্ঞ ভাবে স্বীকার করেছেন, তাঁর স্মৃতিকথা কবি সাগ্রহে পড়েছিলেন বলেই মনে করি। সত্তরোর্ধ্ব বয়সে বাল্য-কৈশোর জীবনের অনেক কথাই মানুষ ভুলে যেতে পারে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তার অনেকটাই যে মনে রেখেছিলেন, এমনকি তারও অনেক পরে কবির নিকটতম সান্নিধ্যে যাঁরা এসেছিলেন এবং পরবর্তী কালে স্মৃতি-কথাদি রচনা করেছেন, সেসবের মধ্যে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ ষোলবছর বয়সে 'ক্ষ্যাপামীর তপ্ত হাওয়ায়' যে "উত্তেজনার আগুন" পুইয়ে 'বীরত্বের প্রহসন মাত্র অভিনয়' করে একধরণের 'স্বর্গলোক'-এ তিনি বাসা বেঁধেছিলেন, তার সবটাই যে 'অন্ধকারে অগোচরে পড়িয়া থাকে' নি, এই সময়ের অনেক আগেকার, তাঁর একেবারে নিতান্ত শৈশবের কথা নিয়ে প্রায় ৮০ বছর বয়সে লেখা তাঁর 'ছেলেবেলা' গ্রন্থে প্রচুর পরিমাণে রয়ে গেছে। এ সবের উপর তাঁর প্রিয় 'জ্যোতিদাদা'র দুইভাবে ['ভারতী' পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে এবং অনতিবিলম্বে গ্রন্থাকারে] প্রকাশিত 'জীবনস্মৃতি' পাঠে তাঁর কৈশোরের স্মৃতি আরো পরিষ্কার এবং উজ্জ্বল হয়ে ওঠাই প্রত্যাশিত ছিল। কিন্তু আমাদের এই অনুমান তথা প্রত্যাশা ব্যর্থ হয়, যখন দেখি রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই সত্তর বয়সের স্মৃতিচারণাতেও 'গুপ্ত সভা'টির নাম বা তার প্রতিষ্ঠাকাল সম্বন্ধে কোন কথাই বললেন না। যদিচ তাঁর 'জীবন স্মৃতি'-বহির্ভূত 'ঋগ্‌বেদের পুঁথি মড়ার মাথার খুলি'-র কথা 'আত্মপরিচয়ে' উল্লেখ করেছেন, যা তিনি তাঁর পুরানো দিনের স্মৃতি রোমন্থন করে উদ্ধার করে

থাকতে পারেন বা 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন স্মৃতি' থেকে, বা খানিকটা বারীন্দ্রকুমার ঘোষের 'বোমার যুগের কাহিনী' থেকেও পেয়ে থাকতে পারেন।

'জীবন স্মৃতি'-তে রবীন্দ্রনাথ যদিচ বলেছেন, 'আমরা মধ্যাহ্নে কোথায় কী করিতে যাইতেছি তাহা আমাদের আত্মীয়েরা জানিতেন না'[১৯], কিন্তু সেটি বোধহয় যথার্থ নয়, অর্থাৎ তাঁদের এই 'গুপ্ত সভা'টির অস্তিত্ব সম্পর্কে ঠাকুর-বাড়ির কেউ কেউ ওয়াকিবহাল ছিলেন বলে মনে হয় [অবশ্য এমনও হতে পারে, 'গুপ্ত সভা'টির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হবার পরেই তাঁরা 'সভা'টি সম্বন্ধে জানতে পেরেছিলেন, কিন্তু এটিও অনুমান মাত্র]। ১২৯৬ সালের বৈশাখ সংখ্যা থেকে 'ভারতী ও বালক' পত্রিকায় তৎকালীন পত্রিকা-সম্পাদিকা শ্রীমতি স্বর্ণকুমারী দেবীর 'স্নেহলতা' নামে একটি উপন্যাস ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হতে শুরু হয়।[২০] পত্রিকাটির কার্তিক ও অগ্রহায়ণ (১২৯৬) সংখ্যা দুটিতে, উপন্যাসটির অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ পরিচ্ছেদে, যোড়শ বর্ষীয় কবি-প্রকৃতিসম্পন্ন বালক চারু, একটি গুপ্তসভা এবং সভাটির আনুষঙ্গিক কার্যকলাপের মোটামুটি বিস্তৃত বর্ণনা আছে [পৃঃ ৩৬৪-৬৫ এবং পৃঃ ৪৩৫-৪৪৩]। ঠাকুর পরিবারস্থ ব্যক্তিদের দ্বারা বার-তেরো বৎসর পূর্বে স্থাপিত 'গুপ্ত সভা'টি থেকে লেখিকা সম্ভবতঃ তাঁর উপন্যাসের এই গুপ্ত-সভাটির পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। এরূপ অনুমানের কারণও আছে। ১৯১১ সালের ২০শে ডিসেম্বর[২১] জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সত্য', সুন্দর, মঙ্গল' নামক যে গ্রন্থটি 'ভিকটর কুঁজ্যার ফরাসী হইতে [বাংলায়] ভাষান্তরিত' হয়ে[২২] প্রকাশিত হয়, সেই গ্রন্থটির সমালোচনা করেন জনৈক অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি 'ভারতী' পত্রিকার ১৩১৮ সালের মাঘ সংখ্যায় 'সত্য, সুন্দর, মঙ্গল' এই শীর্ষনাম দিয়েই (পৃঃ ৯১০-৯১৫)। গ্রন্থটি আলোচনা-প্রসঙ্গে ঐ সমালোচক জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কর্মময় তথা স্বদেশোন্নয়ন-মূলক নানা কীর্তি বর্ণনান্তে রচনার শেষে (রচনাটির শেষ অনুচ্ছেদের পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে) লিখেছেন, 'দেশের প্রায় প্রত্যেক সদনুষ্ঠানে তিনি অগ্রণী ছিলেন। স্বদেশী সভার প্রতিষ্ঠা করিয়া তিনি আত্মীয়-বন্ধু সমাজে স্বদেশানুরাগের বীজ অঙ্কুরিত করেন। শুনিয়াছি, ভারতী-সম্পাদিকা রচিত 'স্নেহলতা' উপন্যাসে নায়ক-বৃন্দের পরিচালিত যে সভার উল্লেখ আছে, সে সভার চিত্র জ্যোতিরিন্দ্র-নাথের স্বদেশী সভার আদর্শ অবলম্বনে রচিত' (পৃঃ ৯১৫)। রচনাটি সম্বন্ধে

বিশ্লেষণাত্মক যথোচিত আলোচনা পরে করা হবে, তবে এখানে লক্ষণীয় যে রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি' তখন 'প্রবাসী' পত্রিকার ১৩১৮ সালের ভাদ্র সংখ্যা থেকে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়ে চলেছে, এবং ঐ নামহীন লেখক তাঁর সমালোচনায় 'সঞ্জীবনী সভা' বা 'হামচুপামুহাফ্‌' কোন নামই ব্যবহার করেন নি। সম্প্রতি প্রকাশিত 'রবি জীবনী-প্রথম খণ্ড' [১লা বৈশাখ, ১৩৮৯] গ্রন্থের ৩০৬ পৃষ্ঠায় প্রশান্ত কুমার পাল, স্বর্ণকুমারীর 'স্নেহলতা' উপন্যাসে অঙ্কিত চারু ও গুপ্ত সভাটিকে 'রবীন্দ্রনাথ ও সঞ্জীবনী সভার একটি প্রতিচিত্র বলে মনে হয়', এই মত প্রকাশ করেছেন। পক্ষান্তরে পশুপতি শাশমল তাঁব 'স্বর্ণকুমারী ও বাংলা সাহিত্য' (পৌষ, ১৩৭৮) গ্রন্থে খোলাখুলি ভাবে তাঁর মত ব্যক্ত করে লিখেছেন, 'স্নেহলতার প্রথম ভাগে (অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে) বর্ণিত ষোড়শ বর্ষীয় বালক চারুর 'গুপ্তসভা' জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঞ্জীবনী সভার আদর্শে পরিকল্পিত হয়েছে' (পৃ: ৮৪)। আবার গ্রন্থের ২৪৯-পৃষ্ঠায় শ্রী শাশমল 'ভারতী ও বালক' পত্রিকার ১২৯৫ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত অঘোরনাথ দত্তের 'য়ুরোপীয় গুপ্ত সমাজ' প্রবন্ধটি স্বর্ণকুমারী দেবীর 'চিত্তাকর্ষণ করতে পারে' একথাও জানিয়েছেন।

যাই হোক, এখন পর্যন্ত একমাত্র 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথেব জীবনস্মৃতি' গ্রন্থেই 'সঞ্জীবনী সভা' (বা 'হামচুপামুহাফ্‌') এই নামটি পাওয়া গিয়েছে [পরবর্তী কালে রচিত গ্রন্থাদির কথা আমরা এখানে ধরছি না, কেননা সেসব ক্ষেত্রে নামটি 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি' থেকেই গৃহীত হয়েছে]। অতঃপর অভিনিবিষ্ট পাঠকের মনে স্বতঃই এই প্রশ্ন উঠতে পারে, সভাটির এই নাম (বা তার সাংকেতিক নাম) কবে প্রথম ব্যবহৃত হয়েছিল, অথবা সভাটির আয়ুষ্কালে আদৌ ব্যবহৃত হয়েছিল কিনা? [প্রবন্ধের শেষ দিকে এবিষয়ে আমাদের কিছু মন্তব্য নিবেদন করা হয়েছে।] 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি'তে জানান হয়েছে যে সভাটির 'কার্যবিবরণী জ্যোতিবাবুর উদ্ভাবিত এক গুপ্ত ভাষায় লিখিত হইত। এই গুপ্ত ভাষায় 'সঞ্জীবনী সভা'কে 'হাঞ্চুপামুহাফ' [হামচু পামুহাফ্‌] বলা হইত'।[২৩] এই বাক্য দুটিও বসন্তকুমার বিজ্ঞাপিত 'কোটেশনচিহ্ন' দ্বারা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'মুখের কথা অবিকল' না হলেও তা যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথেরই বক্তব্য, সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নেই। কিন্তু এ প্রসঙ্গে গুপ্তসভা গৃহ ও তার আসবাব পত্র, সভ্যদের দীক্ষাদানের প্রক্রিয়া, তাদের কার্যকলাপ ইত্যাদির বর্ণনায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিচারণাগুলিতে

যে পার্থক্য-সমূহ[২৪] আছে, তা মিলিয়ে দেখবার চেষ্টা করলে পাঠকের মনে স্বভাবতঃই এই সংশয় জাগতে পারে যে, প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বেকার কথা বলতে গিয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্মৃতি শক্তি তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেনি তো! জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অত্যন্ত উর্বর মস্তিষ্কের অধিকারী ছিলেন,[২৫] বহু নতুন নতুন জিনিষের উদ্ভাবন করে তিনি সকলকে বিস্মিত করতেন (তার একটা উদাহরণ হোল আলোচ্য সময়কালে তাঁর 'সার্বজনিক পোষাক' সৃজন ও প্রবর্তনের চেষ্টা)। এ থেকে আমাদের মনে এরূপ সন্দেহও হয় যে, সভাটির এবম্বিধ নামকরণ তাঁর পরবর্তীকালের ঐ উদ্ভাবন-শক্তির একটি ফলশ্রুতি। বস্তুতঃপক্ষে আরো বিস্তৃততর তথ্য না পাওয়া পর্যন্ত সন্দিগ্ধ পাঠকদের মনে এই প্রকার সন্দেহ জাগতেই পারে। আবার, 'জ্যোতিরিন্দ্র-নাথের জীবনস্মৃতি'-র অনুলেখক বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়-প্রদত্ত জ্যোতিরিন্দ্র-নাথ কর্তৃক 'গুপ্ত ভাষ' উদ্ভাবনের কথাটিকেও ঠিক একটি পরিপূর্ণ সংবাদ হিসাবে গ্রহণ করার পথেও কিছু সংশয় দেখা দেয়। কেননা এই উদ্ভাবনের পশ্চাদ্বর্তী অনুপ্রেরণার সংবাদটি তিনি দেন নি, হয়ত বা স্বয়ং জ্যোতিরিন্দ্র-নাথই তাঁকে বলতে ভুলে গিয়েছিলেন, অথবা বলেন নি। জ্যোতিরিন্দ্র-নাথ যে বহু-পাঠী ছিলেন, তাঁর সুপ্রচুর অনুবাদ গ্রন্থগুলি সে প্রমাণ বহন করছে। তবে আমাদের আলোচ্য সময়কালের পূর্বেই তিনি ইতালীয় মুক্তি-যোদ্ধা জোসেফ ম্যাট্‌সিনির বিচিত্র জীবন-কাহিনী বা কার্যকলাপ সম্বন্ধে কতদূর অবগত হয়েছিলেন, এমন স্পষ্ট প্রমাণ আমরা এখনও পর্যন্ত পাই নি। এখন পর্যন্ত আমরা এইটুকু জানি যে বাঙালীদের 'কানে' ম্যাট্‌সিনি ও আনুষঙ্গিক প্রসঙ্গটি প্রথম শোনান সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর অসামান্য উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতায়, এবং অনেকটা 'চোখে' দেখান যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যা-ভূষণ তাঁর 'আর্যদর্শন' পত্রিকার পাতায়। এবং এইভাবে চক্ষু-কর্ণের বিবাদ-ভঞ্জন করেই সেকালের যুবচিত্ত এক নতুন ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। 'গুপ্ত ভাষা' বিষয়টির উপর প্রশান্ত কুমার পাল তাঁর 'রবিজীবনী-প্রথম খণ্ড' [১লা বৈশাখ, ১৩৮৯] গ্রন্থের ৩২০-৩২১ পৃষ্ঠায় যেভাবে আলোকপাত করেছেন, তাতেও বিষয়টি যথেষ্ট স্বচ্ছ হয়ে ওঠেনি। 'বসুমতী সংস্করণ'-ধৃত যোগেন্দ্রনাথের রচনা থেকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কি ভাবে 'উদ্বুদ্ধ' হতে পারেন, তা সাধারণ পাঠকের মনে সংশয় সৃষ্টির অবকাশ তৈরি করবে বলে মনে হয়। আসলে এই রচনাংশটুকু, অর্থাৎ যে-রচনা থেকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ

বাংলায় 'গুপ্তভাষা'-সৃষ্টিতে 'উদ্বুদ্ধ' হয়েছিলেন, বলে মনে করা যায়, তা 'সঞ্জীবনী-সভা' স্থাপনের বহু আগেই প্রকাশিত হয়েছিল।[২৬] যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত মাসিক 'আর্যদর্শন' পত্রিকাটি ১২৮১ সালের বৈশাখ [ইংরেজি এপ্রিল-মে, ১৮৭৪] মাস থেকেই প্রকাশিত হতে শুরু হয়। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে পত্রিকাটি যে সাদরে গৃহীত হয়েছিল তার অনেক প্রমাণ আছে।[২৭] এই পত্রিকার ১২৮২ সালের ভাদ্র [আগষ্ট, ১৮৭৫] সংখ্যায় 'জোসেফ ম্যাট্‌সিনি ও নব্য ইতালী' শীর্ষক রচনাটির প্রথম কিস্তি লেখকের, অর্থাৎ যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের, নামবিহীন হয়েই প্রকাশিত হয়।[২৮] এই সংখ্যায় ম্যাট্‌সিনির বিচিত্র জীবনকথার যে অংশটুকু বিবৃত হয়েছে, তার একাংশে পাওয়া যায় কি ভাবে মেজর কটিনের ['Major Cottin'] বিশ্বাসঘাতকতায় ম্যাট্‌সিনিকে সেভোনার ['Savona'] দুর্গ মধ্যে বন্দীজীবন কাটাতে হয়, তার বর্ণনা।[২৯] বন্দী অবস্থায় ম্যাট্‌সিনি তাঁর মা'র কাছ থেকে 'প্রতি দশম দিবসে' অর্থাৎ দশদিন অন্তর যে পত্র পেতেন, তা তাঁর রক্ষী প্রথমে খুলে পড়ে তবে ম্যাট্‌সিনিকে দিত, এবং ম্যাট্‌সিনিকেও তাদের সামনে মায়ের চিঠির উত্তর লিখতে হোত। 'গবর্ণমেণ্টের এতদুর সতর্কতাতেও বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত তাঁহার ষড়যন্ত্র নির্বিবাদে চলিতেছিল, তাঁহাদিগেব সহিত ম্যাট্‌সিনির এরূপ সঙ্কেত ছিল যে তিনি জননীকে যে চিঠী [চিঠি] লিখিবেন, তাহার একটি অন্তর প্রত্যেক পদের প্রথম অক্ষরগুলি একত্র করিলে যে ল্যাটীন পদগুলি প্রস্তুত হইবে, সেইগুলিই তাঁহাদিগের মনোযোগের বিষয়। এইরূপ সাঙ্কেতিক উপায় অবলম্বন করিয়া তাঁহার বন্ধুবান্ধবও তাঁহার জননীর পত্রে আপনাদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া পাঠাইতেন' [পৃ. ২২১]। সন্দেহ নেই যে এখান থেকে ইঙ্গিত সংগ্রহ করে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বাংলায় 'গুপ্তভাষা' সৃষ্টি করে সভার 'কার্য-বিবরণী' রচনায় ব্যবহার করেছিলেন (যা আমরা পাই নি) এবং সভাটির 'হাঞ্চুপামুহাফ্' এই সাঙ্কেতিক নামকরণ করেছিলেন। তবে যথেষ্ট প্রমাণাভাবে এসব তৎকালে, অর্থাৎ সভাটির আয়ুষ্কালে প্রকৃতই ব্যবহৃত হয়েছিল কিনা সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ থেকেই যায়।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ বা বারীন্দ্রকুমার ঘোষ সভাটির আয়ুষ্কাল সম্বন্ধে কিছু বলেন নি। তবে এ বিষয়ে সাম্প্রতিক কালে কিছু আলোচনা হয়েছে। ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার 'Indian Political Associations and Reform

of Legislature, 1818-1917' (November, 1965) গ্রন্থের 'Some minor Associations in India and England' অধ্যায়ে লিখেছেন যে ভারতের গভর্নর-জেনারেল লর্ড লীটনের প্রতিক্রিয়াশীল সরকারের আমলে, ১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ, 'সঞ্জীবনী সভা'-টি স্থাপিত হয়েছিল বলে তাঁর মনে হয়।[৩০] মন্তব্যটি সামান্য আলোচনার অপেক্ষা রাখে। লর্ড লীটন 'গভর্নর-জেনারেল' রূপে ভারতের মাটিতে (বোম্বাইয়ে) পদার্পণ করেন ১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দের ৭ই এপ্রিল। রাজত্বের প্রথম দিকে তাঁর কোন কোন কাজকর্মের দ্বারা তিনি ভারতীয়দের কিছু প্রশংসা অর্জনই করেছিলেন, 'ফুলার'-সংক্রান্ত ঘটনাটি তার প্রমাণ। আগ্রার আইন-ব্যবসায়ী Robert Augustus Fuller সামান্য ত্রুটিতে তাঁর সহিসের পেটে লাথি মেরে প্লীহা ফাটিয়ে মৃত্যু ঘটালেও আদালত নামমাত্র ৫০ টাকা জরিমানা করে ফুলারকে মুক্তি দিয়েছিল। লর্ড লীটন সেই 'হত্যাকারী' ফুলারকে যথোচিত শাস্তি দান করে ভারতীয়দের কৃতজ্ঞতা ভাজন হয়েছিলেন।[৩১] এমনকি, ১৮৭৭ খ্রীস্টাব্দের ১০ই মার্চ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'কনভোকেশন'বক্তৃতা দিতে গিয়ে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণা-পত্রে ['Proclamation,' of 1858] প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিগুলি সর্বাংশে পালিত হয়নি বলে তিনি দুঃখ প্রকাশ করেছেন এবং দেশীয় শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রতি দরদ দেখিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেবলমাত্র পরীক্ষা গ্রহণ কেন্দ্রে পরিণত না করে শিক্ষাদান কেন্দ্ররূপে গড়ে তোলার সৎপরামর্শও তিনি দিয়েছেন।[৩২] কিন্তু এই বক্তৃতার দিন কুড়ির মধ্যেই, ১৮৭৭ খ্রীস্টাব্দের ২৮শে মার্চ তারিখে লর্ড লীটন যে বাজেট প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন, যাতে জমির খাজনা বৃদ্ধি ছাড়াও ইংরেজদের স্বার্থরক্ষার জন্য ভারতের সুতা, সুতিবস্ত্র, লবণ প্রভৃতি শিল্পকে ধ্বংস করার পরিকল্পনা ছিল, তারই ফলে দেশময় অচিরে প্রবল আন্দোলন শুরু হয়। ইতিমধ্যে 'সিভিল সার্ভিস' পরীক্ষা সংক্রান্ত প্রশ্ন নিয়ে সুরেন্দ্রনাথ ভারতের বিভিন্ন স্থানে জনমত সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিলেন। ফলে ১৮৭৭ খ্রীস্টাব্দের প্রায় মাঝামাঝি সময় থেকেই লীটনের প্রতিক্রিয়াশীল শাসন-যন্ত্র সক্রিয় হয়ে ওঠে,[৩৩] এবং ১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দ থেকে একে একে 'Vernacular Press Act,' 'License Act,' 'Arms Act' প্রভৃতি দেখা দেয়। সুতরাং ডঃ মজুমদার সভাটিকে একবার ১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দে স্থাপিত বলে মনে করে আবার তাকে লীটনের প্রতিক্রিয়াশীল শাসনকালের পরিপ্রেক্ষিতে স্থাপন করতে গিয়ে বিষয়টিকে একটু গোলমেলে করে ফেলেছেন। শ্রীমতী সংঘমিত্রা

বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'রবীন্দ্র সাহিত্যের আদিপর্ব' (১৫ই এপ্রিল, ১৯৭৮) শীর্ষক গবেষণা-গ্রন্থের 'গীতরচনারম্ভ' অধ্যায়ে এই সম্পর্কে আলোচনান্তে 'সঞ্জীবনী সভা' কে ১৮৭৪ খ্রীস্টাব্দের শেষদিকে বা ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দের প্রথম দিকে স্থাপিত বলে মনে করেছেন (পৃঃ ২৬১ ২৬২)। কিন্তু তাঁর যুক্তি খুবই দুর্বল। সম্প্রতি প্রশান্তকুমার পাল তাঁর 'রবিজীবনী, প্রথমখণ্ড' (১লা বৈশাখ ১৩৮৯) গ্রন্থে নানা আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উপকরণের সহায়তায় 'সঞ্জীবনী সভা'র আয়ুষ্কাল মোটামুটি পৌষ, ১২৮৩ (ইং ১৮৭৬-এর শেষ) থেকে জ্যৈষ্ঠ, ১২৮৪ (ইং ১৮৭৭ এর মে-জুন), অর্থাৎ ছয়মাসের বলে যে সিদ্ধান্তে পৌচেছেন [পৃঃ ৩০৫], আরো নতুন তথ্য আবিষ্কৃত না হওয়া পর্যন্ত আপাততঃ আমরা এই সময়টিকেই 'সঞ্জীবনী সভা'র আয়ুষ্কাল বলে গ্রহণ করেছি।

'সঞ্জীবনী সভা'র কার্যকলাপ সম্বন্ধে 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি', রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি' ও 'আত্মপরিচয়' গ্রন্থগুলিতে এবং 'বিজলী' পত্রিকায় প্রকাশিত বারীন্দ্রকুমার ঘোষের 'বোমার যুগের কাহিনী' রচনায় যে সব সংবাদ আছে, আমাদের বক্ষ্যমাণ আলোচনার পক্ষে আপাততঃ সেগুলি একান্ত প্রয়োজনীয় নয় বলে, সে সব প্রসঙ্গ উপস্থিত বাদ দেওয়া হল (পরে এ বিষয়ে কিছু আলোচনা করা হবে)। উনিশ শতকের সত্তরের দশকে কলকাতার ছাত্রদের মধ্যে গুপ্ত-সমিতি সৃষ্টির যে প্রবণতা সাধারণভাবে দেখা দিয়েছিল, 'সঞ্জীবনী সভা'কে সেরূপ একটি গুপ্ত সমিতি রূপে গ্রহণ করা যায় কিনা, অতঃপর এই প্রশ্নটির সমাধান করার চেষ্টা করা যেতে পারে। এ ব্যাপারে প্রথমেই আমাদের ঐ সভার সঙ্গে জড়িত সভ্যদের কিঞ্চিৎ পরিচয় নেওয়ার প্রয়োজন হয়। প্রথমে সভাটির 'সভাপতি' বা 'পুরোহিত' রাজনারায়ণ বসুকে আলোচনার ক্ষেত্রে আনলে দেখা যাবে যে তাঁর বয়স তখন পঞ্চাশ বৎসর [রাজনারায়ণের জন্ম, সেপ্টেম্বর ১৮২৬]। রবীন্দ্রনাথ এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দুজনেই তাঁকে বলেছেন 'বৃদ্ধ'। এই 'সভা'র সঙ্গে যুক্ত হবার অনেক আগে, রবীন্দ্রনাথের আরো 'ছেলেবেলায় রাজনারায়ণবাবুর সঙ্গে যখন আমাদের পরিচয় ছিল··· তখনই তাঁহার চুলদাড়ি প্রায় সম্পূর্ণ পাকিয়াছে' বলেছেন রবীন্দ্রনাথ।[৩৭] 'সভা'র অন্যতম প্রধান উদ্যোগী জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বয়স তখন প্রায় আঠাশ বৎসর [জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জন্ম ৪ঠা মে, ১৮৪৯], এবং তিনি তখন প্রায় দশ বৎসরের বিবাহিত জীবন যাপন করছেন। সভার তরুণতম সভ্য রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন ষোল বৎসর

[রবীন্দ্রনাথের জন্ম ৭ই মে, ১৮৬১]। সভাটির অপর এক সভ্য 'মেট্রোপলিটান কলেজের সুপারিণ্টেন্ডেণ্ট' ব্রজনাথ দে মহাশয়ের বয়সও যে তখন কম নয়, তা রবীন্দ্রনাথের উক্তিতেই পাওয়া যায়, 'তখন ব্রজবাবুর মাথার চুলে পাক ধরিয়াছে'।[৩৫] এই সভার পঞ্চম সভ্য নবগোপাল মিত্রের বয়স তখন প্রায় সাঁইত্রিশ বৎসর (নবগোপালের সঠিক জন্মতারিখ পাইনি, তবে তিনি যে আনুমানিক ১৮৪০ খ্রীস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেছিলেন,[৩৬] এরূপ উল্লেখ পাওয়া যায়)। 'সঞ্জীবনী সভা'র 'প্রধান উদ্দেশ্য' ছিল 'জাতীয় হিতকর ও উন্নতিকর সমস্ত কার্য'-এর অনুষ্ঠান,[৩৭] এরূপ উদ্দেশ্যের সঙ্গে জড়িত 'একটি কোনো অল্প-বয়স্ক বালক'-এর কথা রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি'তে (পৃ: ১৫৩) আছে বটে ('জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন স্মৃতি' বা বারীন্দ্রকুমার ঘোষের 'বোমার যুগের কাহিনী'তে নেই), তবে সভাটির সঙ্গে তার (ঐ বালকটির) প্রত্যক্ষ সংযোগেরও কোন প্রমাণ নেই। 'বঙ্গবাণী' পত্রিকার ১৩২৯ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত বিপিনচন্দ্র পালের 'হিন্দুমেলা ও নবগোপাল মিত্র' প্রবন্ধটি পড়লে মনে হয় এই 'অল্প বয়স্ক বালক' হলেন ত্রিপুরার কালীকচ্ছের মহেন্দ্রনাথ নন্দী। কিন্তু এটিও অনুমান মাত্র। এ বিষয়ে প্রশান্তকুমার পাল তাঁর 'রবিজীবনী, ১ম খণ্ড (১লা বৈশাখ, ১৩৮৯) গ্রন্থে এই পর্যন্ত বলতে পেরেছেন, 'বোঝা যায়, উক্ত মহেন্দ্রনাথ নন্দীই সঞ্জীবনী সভার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন' (পৃ: ৩২১), অর্থাৎ বস্ত্রের কল চালু করার জন্যে আর্থিক সহায়তা লাভ করে-ছিলেন। 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি'-ধৃত সংবাদ 'যে দিন নূতন কোনও সভ্য এই সভায় দীক্ষিত হইতেন .....' (পৃ: ১৬৬), থেকে এরূপ সন্দেহ মনে জাগতে পারে বটে যে মহেন্দ্রনাথ নন্দীই সম্ভবতঃ ঐরূপ কোন নতুন সভ্য ছিলেন। কিন্তু এক্ষেত্রেও প্রমাণাভাব। বরং এই 'নূতন সভ্য' অর্থে নব-গোপাল মিত্রকে গ্রহণ করাই বাঞ্ছনীয়, যেহেতু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ জানিয়েছেন, 'পরে নবগোপাল বাবুকেও সভ্য শ্রেণী ভুক্ত করা হইয়াছিল' (পৃ: ১৬৬)। এমন কি এই 'নূতন সভ্য' অর্থে রবীন্দ্রনাথকেও বোঝান হয়ে থাকতে পারে, কেননা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর এই কনিষ্ঠ সহোদরটিকে কোন কোন ব্যাপারে আগাম 'প্রমোশন' দিতেন[৩৮] সম্ভবতঃ তাঁদের এই প্রাচীন ও বৃদ্ধদের গুপ্ত সভায় কিশোর ভ্রাতাকে এই রকম 'প্রমোশন' দিয়েই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এনেছিলেন।

যাই হোক, মোটামুটি এই পাঁচ জন ছাড়া 'সঞ্জীবনী সভা'র সঙ্গে প্রত্যক্ষ-ভাবে জড়িত ছিলেন, এমন আর কোন ব্যক্তির নামধাম এখনও পর্যন্ত পাওয়া

যায় নি। বারীন্দ্রকুমার ঘোষ তাঁর 'বোমার যুগের কাহিনী'তে (২৬ শে শ্রাবণ, ১৩২৯, ১১ই আগষ্ট, ১৯২২) লিখেছেন, 'এখনকার অনেক বড় বড় মানুষ তা'তে ছিলেন, তাঁদের কয়েকজন এখনও ইহলোকে, বাকি পরলোকে', কিন্তু এঁদের কারুরই তিনি নাম বলেন নি। 'কয়েকজন এখনও ইহলোকে' বলতে জীবিত রবীন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ছাড়া আর কাউকে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন কিনা বোঝা যায় না। 'বাকি পরলোকে' বলতে রাজনারায়ণ বসু [মৃত্যু: ১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৯] ও নবগোপাল মিত্র [মৃত্যু: ৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৪] ছাড়া আর কোন্ ব্যক্তি বা কোন্-কোন্ ব্যক্তিকে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন তাও আমরা জানতে পারিনি। ইহলোক-বাসী ও পরলোক-বাসী এই দুই দলের মধ্যে সভার সদস্য ব্রজনাথ দে-কে কোন্ দলে ফেলা যাবে সে কথাও বারীন্দ্রকুমার বলেন নি, আমরাও এবিষয়ে নিঃসংশয় নই, কেননা ব্রজনাথের মৃত্যুকাল আমরা পাই নি।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জীবনস্মৃতি'তে একজন 'মধ্যবিত্ত জমিদার'-এর উল্লেখ করেছেন, কিন্তু তাঁর নামধাম জানান নি—'আমাদের দলের মধ্যে একটি মধ্যবিত্ত জমিদার ছিলেন। তিনি নিষ্ঠাবান্ হিন্দু। তাঁহার গঙ্গার ধারে একটি বাগান ছিল। সেখানে গিয়া আমরা সকল সভ্য একদিন জাতি বর্ণ নির্বিচারে আহার করিলাম'। (পৃঃ ১৫১) 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি'-তে আমরা প্রায়-অনুরূপ কথাই পাই, কেবল বাড়তি যে সংবাদটুকু পাই তা হল, এই জমিদারটি 'ব্রাহ্মণ' ছিলেন (পৃঃ ১৭০) এখানে 'দল' শব্দে রবীন্দ্রনাথ ঠিক 'সঞ্জীবনী সভা'কেই বোঝাতে চেয়েছেন কিনা, সে বিষয়ে একটু সংশয় আছে (জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অবশ্য 'জমিদার সভ্য' শব্দটি ব্যবহার করেছেন দেখতে পাই)। কেননা যে-প্রসঙ্গের পরে রবীন্দ্র-নাথ এই 'জমিদার'-এর কথাটি পেড়েছেন, সেটিকে একটু বিশ্লেষণ করলেই আমাদের এই সংশয়ের কারণ ধরা পড়বে। সেটি হল, রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'রবিবারে রবিবারে জ্যোতিদাদা দলবল লইয়া শিকারে বাহির হইতেন,' এবং সেই শিকারীর দলে 'রবাহূত অনাহূত যাহারা আমাদের দলে আসিয়া জুটিত তাহাদের অধিকাংশকেই আমরা চিনিতাম না' (পৃঃ ১৫০), অর্থাৎ তারা 'সভা'টির সভ্য ছিল না। এই শিকারী দলেরই এক দিন 'মানিকতলা'র 'যে কোন একটা' 'পোড়োবাগানে' ঢুকে পড়ে 'পুকুরের বাঁধানো ঘাটে বসিয়া উচ্চ নিচ নির্বিচারে সকলের' 'বৌঠাকুরাণী' কর্তৃক 'প্রস্তুত' 'রাশী-কৃত লুচিতরকারি' ভক্ষণের কথা কবি জানিয়েছেন (পৃঃ ১৫১) এবং

এমনি এক শিকার-পার্টি শিকার শেষে ফেরবার পথে একটা অচেনা বাগানের কাছে এলে ব্রজনাথবাবু কিভাবে 'মালি'-কে ধোঁকা দিয়ে সকলকে ডাবের জল খাইয়েছিলেন (পৃঃ ১৫১), সেই বর্ণনার পরেই কবির রচনা-ক্ষেত্রে এই 'জমিদার'টির আবির্ভাব ঘটেছে। সুতরাং এই 'জমিদার'টি শিকারীদলের অন্তর্ভুক্ত, অথবা বনভোজন-পার্টির (জ্যোতিরিন্দ্রনাথ একে 'প্রীতিভোজ' বলেছেন, পৃঃ ১৭০) অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, এমনও বোঝান হয়ে থাকতে পারে। আর 'আমরা সকল সভ্য' অর্থে 'সঞ্জীবনী সভা'-র ওই গুটি-কয়েক সভ্য ছাড়া পূর্বোক্ত 'রবাহুত অনাহুত', যাদের রবীন্দ্রনাথরা চিনতেন না, এমন ব্যক্তিদেরও বোঝান হয়ে থাকতে পারে। বস্তুত আরো বিস্তৃত তথ্যের অভাবে এই ভাবে বিশ্লেষণ করে যাওয়া ছাড়া আমাদের উপায় নেই। তবে গঙ্গার ধারের 'বাগানে'র বা 'বাগান-বাড়ী'-র মালিক এই 'জমিদার'-টি যে নেহাৎ অল্পবয়স্ক ছিলেন না, তা রবীন্দ্রনাথের এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অতি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা থেকে বুঝতে আমাদের অসুবিধা হয় না—জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ব্যবহৃত 'একটু নিষ্ঠাবান্ হিন্দু' এবং রবীন্দ্রনাথের সংক্ষিপ্ত বাক্য 'তিনি নিষ্ঠাবান্ হিন্দু' শব্দগুলির মধ্য দিয়ে 'জমিদার'টি সম্বন্ধে উভয়েরই বেশ একটু সম্ভ্রমের ভাব ফুটে উঠেছে। এই 'জমিদার' ছাড়া ব্যক্তি-পরিচয়-হীন 'দুটি একটি সুবুদ্ধি লোক'-এর কথা (পৃঃ ১৫৩) রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জীবনস্মৃতি'তে উল্লেখ করেছেন। ['জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি'-তে এঁরা অনুপস্থিত। পক্ষান্তরে বারীন্দ্রকুমার ঘোষের 'বোমার যুগের কাহিনী'-তে একজন 'বুদ্ধিমান' ব্যক্তির উল্লেখ আছে, যিনি গুপ্তসভা 'ঘরটির কোণে...বসে থাকতেন, আর মাঝে মাঝে প্রত্যেক প্রস্তাবের উত্তেজনার মুখে বলতেন 'কিস্সু হবে না,' এবং যাঁর 'কথা' ফলেছিলো, 'জীবনের নাগর-দোলায় পাক খেতে খেতে কে কোথায় গেলেন, তার পাত্তা রইলো না', কিন্তু এই 'বুদ্ধিমান'-এরও কোন ব্যক্তি পরিচয় বারীন্দ্রকুমারও দেন নি। তবে এই অংশটির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ-লিখিত অংশের কিছু সাদৃশ্য আছে—'বুদ্ধিমান' শব্দটি রবীন্দ্রনাথের 'সুবুদ্ধি লোক' শব্দ দুটির এবং ঐ বুদ্ধিমানের ভবিষ্যদ্বাণী 'কিসসু হবে না' ইত্যাদি প্রসঙ্গের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ-কথিত 'সুবুদ্ধি লোক' দ্বারা 'জ্ঞানবৃক্ষের ফল' খাইয়ে গুপ্ত সভাটির ভেঙে যাওয়ার সংবাদের কিঞ্চিৎ মিল দেখে সন্দেহ হয় বারীন্দ্রকুমার ইতিপূর্বে, ১৩১৮-১৯ সালে 'প্রবাসী'-তে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত এবং পরে ১৯১২ খ্রীস্টাব্দে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত

'জীবনস্মৃতি' আন্দামানে অন্তরীণ অবস্থায় অথবা ১৯২১ সালে মুক্তি পাবার এবং 'বোমার যুগের কাহিনী' রচনার মধ্যবর্তী কালে পড়েছিলেন কিনা। তবে যেভাবে বারীন্দ্রকুমার জোরের সঙ্গে 'অন্ততঃ দুটি গুপ্ত সমিতির কথা আমিই জানি' বলে দাবী করেছেন এবং ঐ বুদ্ধিমানের মুখে 'কিস্সু হবে না' শব্দ ক'টি বসিয়েছেন, তাতে আমাদের বিশ্বাস যে সমস্ত ব্যাপারটি তিনি তাঁর 'দাদাবাবু' অর্থাৎ রাজনারায়ণ বসুর মুখেই শুনেছিলেন] এই সুবুদ্ধি লোকগুলি 'জ্ঞানবৃক্ষের ফল' খাইয়ে তাঁদের এই 'স্বর্গলোক' অর্থাৎ 'সঞ্জীবনী সভা'টিকে লোপ পাইয়ে দিয়েছিলেন। 'সুবুদ্ধি' এই পরিহাস-স্নিগ্ধ শব্দটি দিয়ে রবীন্দ্রনাথ পাকা-মাথা অর্থাৎ বৈষয়িক জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিদেরই বোঝাতে চেয়েছেন, সম্ভবতঃ যাঁরা সময়ের অপচয় ও অর্থের অপব্যয় না করতেই সেদিন কবিদের পরামর্শ দিয়েছিলেন। আর 'লোক' শব্দটির অভিধা অর্থ ধরলে বুঝতে অসুবিধা হয়না যে এঁরা বেশ পরিণত বয়স্কই ছিলেন, সে কারণে তাঁদের উপদেশ মেনে নিয়েই ছেলে-খেলা রূপ 'স্বর্গ লোক'টিকে ভেঙ্গে ফেলা হয়েছিল (বারীন্দ্রকুমার ঘোষ লিখিত 'বুদ্ধিমান' ব্যক্তি যিনি তটস্থ থেকে, সভ্যদের উচ্ছ্বাসের পরিণতি দেখতে পেয়ে তাদের উদ্দেশ্যে যেন সতর্ক-বাণী উচ্চারণ করতেন 'কিস্সু হবে না' বলে, তাঁকেও যথেষ্ট প্রবীণ ও ভূয়োদর্শী বলে মনে হয়)। যাই হোক, যথেষ্ট তথ্যের অভাবে এই ভাবে বিশ্লেষণ তথা অনুমানকে মুখ্য করে না তুললেও এটা খুবই স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে যে ঐ 'জমিদার' এবং ঐ 'দুটি একটি সুবুদ্ধি লোক' 'সঞ্জীবনী সভা'র নেপথ্যেই রয়ে গেছেন, পাদপীঠের সামনে এনে তাঁদের দাঁড় করানো হয় নি।

এই প্রকার সার্বিক বিশ্লেষণ থেকে একথাও স্পষ্টতঃই প্রমাণিত হয় যে একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ছাড়া 'সঞ্জীবনী সভা'য় তথাকথিত 'ছাত্র' আর কেউ ছিলেন না। পুনরপি, রবীন্দ্রনাথের বয়স অল্প হলেও তাঁকে ঠিক ঐ সময়ের কোন স্কুলের ছাত্র বলা যাবে কিনা, সে বিষয়েও সংশয় আছে। রবীন্দ্রনাথ নিজেকে কখনো কোন স্কুল-কলেজের সংকীর্ণ গণ্ডিতে দীর্ঘদিন আবদ্ধ করে রাখতে পারেননি, বিভিন্ন স্কুল থেকে 'নানা ছল' করে তিনি পালিয়ে বেড়িয়েছেন, যে কারণে 'আত্মপরিচয়' গ্রন্থে [চৈত্র, ১৩৫২, পৃঃ ৮৮] তিনি নিজেকে 'ইস্কুল পালানো ছেলে' বলে সপরিহাস উল্লেখ করেছেন। 'সঞ্জীবনী সভা'র আয়ুষ্কালে তিনি 'সম্ভবতঃ' কোন স্কুলেরই ছাত্র ছিলেন না।[৩৭] তাছাড়া

১৮৭৭ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে ('স্বর্গলোক' সদৃশ গুপ্ত সভাটি ভেঙে যাওয়ার মুখে অথবা ভেঙে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে) রবীন্দ্রনাথের আমেদাবাদ যাত্রার সংবাদ থেকে মনে হয় যে এর পূর্ববর্তী ছয়মাসের (অর্থাৎ 'গুপ্ত সভা'টির আয়ুষ্কালে) তিনি ঐ 'ইস্কুল পালানো ছেলে'-ই ছিলেন। তবে, মানুষতো সারা জীবনই শিক্ষার্থী, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব নাকি বলতেন 'যতদিন বাঁচি, ততদিন শিখি,' বিশ্বখ্যাত বৈজ্ঞানিক নিউটন তো শেষ পর্যন্ত জ্ঞান-সমুদ্রের ধারে নুড়ি কুড়িয়েই গেছেন, বৃদ্ধবয়সেও নাকি 'বিদ্যের জাহাজ' বিদ্যাসাগরের মুখে আক্ষেপ শোনা যেতো 'ইচ্ছে ছিল ভাল করে লেখাপড়া শিখি, তা আর হোল না।' - সেদিক থেকে ধরলে আলোচ্য সময়কালে রবীন্দ্রনাথকেও 'ছাত্র' বলে স্বীকার করতে হয়, তবে হয়ত বা ঐ সময়ে তিনি কোন স্কুলেরই নিয়মিত (regular) ছাত্র ছিলেন না।

প্রথম দফায় 'সঞ্জীবনীসভা'র সভ্যদের অবস্থা (status) সম্পর্কে এতক্ষণ আলোচনা করে আমরা যে তথ্য পেলাম, তা মনে রেখে বিপিনচন্দ্র পাল-কথিত উনিশ শতকের সত্তরের দশকে ছাত্রদের দ্বারা সৃষ্ট গুপ্ত সমিতির নিদর্শন হিসাবে 'সঞ্জীবনী সভা'কে অতঃপর আর গ্রহণ করা যাবে কি না, এই হোল আমাদের সংশয়ের প্রথম ভাগ।

এখন আমরা সংশয়ের দ্বিতীয়ভাগের প্রসঙ্গে আসছি। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িকে ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার নবজাগরণের প্রাণকেন্দ্র বললে অত্যুক্তি করা হয় না। শিক্ষায়-দীক্ষায়-রুচিতে-সঙ্গীতে-সাহিত্যে শিল্পকলায়, এককথায় জীবনচর্যার প্রায় সর্বক্ষেত্রেই এই পরিবারের মানুষগুলি প্রায়-নেতৃত্ব করে গেছেন বলা যায়। পরাধীন ভারতে স্বদেশোন্নয়নমূলক কাজ-কর্মের উৎস-সদৃশ ছিলেন এই পরিবারের প্রগতিশীল ব্যক্তিগুলি। এ ব্যাপারে এঁদের কুল-ললনারাও পশ্চাদ্বর্তী ছিলেন না। সুতরাং এই পরিবারের নানাবিধ কর্মপ্রয়াসের একটি বহিঃপ্রকাশ-রূপে এই 'সঞ্জীবনী সভা'-টির সৃষ্টিকে ধরা যায় কিনা, এই হল আমাদের সংশয় তথা প্রশ্নের দ্বিতীয় ভাগ। আরো সংক্ষিপ্ত করে প্রশ্নটিকে এইভাবে বলা যায় যে, 'সভা'টি কি ঠাকুরবাড়ির একটি পারিবারিক ব্যাপারমাত্র ছিল না? প্রশ্নটির সমাধান খুঁজতে হলে আমাদের এই সভাটির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ব্যক্তিদের দিকে আবার একবার তাকাতে হয়।

'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি'-তে 'যেদিন নূতন কোনও সভ্য' দীক্ষিত হওয়ার সূত্র ধরে রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি'-তে প্রাপ্ত বহিরাগত জনৈক-

'মধ্যবিত্ত জমিদার' (জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-কথিত 'জমিদার সভ্য')-এর প্রসঙ্গ, বিশেষ করে 'দুটি একটি সুবুদ্ধি লোক'-এর 'দলে' ভিড়ে পড়ার ব্যাপারটা সম্ভবতঃ সভাটির অন্তিম পর্বেই ঘটেছিল, রবীন্দ্রনাথের 'অবশেষে' শব্দটির ব্যবহার এরূপ অনুমানকেই সমর্থন করে। তবে এই 'জমিদার' ও 'সুবুদ্ধি লোক'-গুলির সম্বন্ধে কোন তথ্যই পাওয়া যায় না বলে অতঃপর এঁদের সম্পর্কে আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। সুতরাং এক্ষেত্রে সভাটির একজন প্রাচীন এবং একজন 'অর্বাচীন', অর্থাৎ ঠাকুর বাড়ির জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথ (রবীন্দ্রনাথ স্বয়ংই লিখেছেন 'আমার মতো অর্বাচীনও এই সভার সভ্য ছিল'। পৃঃ ১৭৮), এঁদের দুজনকে বাদ দিয়ে 'সভাপতি' রাজনারায়ণ বসুকে নিয়ে আলোচনা সুরু করা যেতে পারে। স্বয়ং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁর 'আত্মজীবনী'-তে রাজনারায়ণ বসু সম্বন্ধে লিখেছেন, 'আমি তাঁহাকে পরিবারের মধ্যেই গণ্য করিতাম। যখন আমি পরিবার লইয়া বেড়াইতে চলিলাম, তখন রাজনারায়ণ বাবুকে সঙ্গে লইলাম।'[৪০] রাজনারায়ণ সম্বন্ধে মহর্ষিদেবের এই মনোভাব তাঁর বংশধরদের মধ্যেও যে পূর্ণমাত্রায় বজায় ছিল, তা দৃষ্টান্ত সহযোগে প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না, ঐ পরিবারস্থ যেকোন একজনের স্মৃতিকথার পাত উল্টালেই তা দেখা যাবে। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সতীর্থ নবগোপাল মিত্রকেও ঠাকুর-পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না।[৪১] সত্যেন্দ্রনাথ পরিণত বয়সে যখন 'আমার বাল্য কথা' নামক স্মৃতিকথাটি রচনা করেন, তখন সেখানে নবগোপাল মিত্র সম্বন্ধে লিখেছেন, 'তিনি হিন্দু স্কুলে আমার সহাধ্যায়ী ছিলেন, স্কুল ছেড়ে আমাদের সহকর্মী হলেন, আমাদের প্রণয় ও ঘনিষ্ঠতা আরো বাড়ল, তিনি সর্বদা আমাদের বাড়ীতে যাওয়া আসা করতে লাগলেন।'[৪২] শুধু 'যাওয়া আসা' করাই নয়, নবগোপাল মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কাছে যে অচিরে পুত্রোপম হয়ে উঠেছিলেন, তা সামান্য কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ থেকেই বোঝা যায়—(১) ব্রাহ্ম-সমাজের প্রথম ভাঙনের মুখে কেশবচন্দ্র সেন 'মিরার' পত্রিকার সমস্ত কিছু হস্তগত করলে[৪৩] মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যুবক নবগোপালকে সম্পাদক করে ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই আগষ্ট থেকে সাপ্তাহিক 'National Paper' পত্রিকাটি চালু করেন; (২) ঠাকুর-বাড়ির প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায়, (রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'আমাদের বাড়ির সাহায্যে'[৪৪]) ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই এপ্রিল থেকে যে বাৎসরিক 'চৈত্র ('হিন্দু') মেলা'র সূত্রপাত হয়, তাতে গণেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সম্পাদক এবং নবগোপালকে

সহকারী সম্পাদক (পরে সম্পাদক) মনোনীত করা হয়; (৩) কেশবচন্দ্র সেন কর্তৃক 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' স্থাপন এবং নূতন বিবাহ বিধি [যা প্রচলিত কথায় 'তিনি আইনের বিবাহ'] প্রচলন করার বিরুদ্ধে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পক্ষে বা আদি-ব্রাহ্মসমাজের প্রধান মুখপাত্ররূপে নবগোপাল প্রবল প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে চেষ্টা করেছিলেন, (৪) ঠাকুর পরিবারের সম্মতিতেই নবগোপালকে আদি ব্রাহ্মসমাজের কার্য-নির্বাহক সমিতির সদস্য এবং 'ব্রাহ্মবোধিনী সভা'র যুগ্ম-সম্পাদক নিযুক্ত করা হয়েছিল, ইত্যাদি। ঠাকুর পরিবারের অনেকের লেখাতেই সেই পরিবারের সঙ্গে নবগোপালের অন্তরঙ্গতার অনেক প্রমাণ ইতস্তত: ছড়িয়ে আছে। নবগোপালের অভ্যন্তরস্থ স্বদেশপ্রেমের বীজটি ঐ পরিবারের অনুকূল জল হাওয়াতেই যে মহীরুহে পরিণত হতে পেরেছিল, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশমাত্র নেই। বস্তুতপক্ষে ঠাকুর-পরিবারের ছত্রচ্ছায়া না পেলে 'ন্যাশান্যাল নবগোপাল' কে আমরা ঠিক এরূপভাবে পেতাম কিনা সন্দেহ।

এই সভার পঞ্চম পুরুষ ব্রজনাথ দে ছিলেন বিদ্যাসাগরের 'মেট্রোপলিটান কলেজের সুপারিন্টেন্ডেন্ট' [৪৫] প্রশান্তকুমার পাল রচিত 'রবি জীবনী, ১ম খণ্ড' (১লা বৈশাখ, ১৩৮৯) গ্রন্থের ১৯২ পৃষ্ঠা থেকে জানা যায় যে ব্রজনাথ ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে মাসিক কুড়ি টাকা বেতনে ঠাকুর বাড়ির সোমেন্দ্রনাথ [এবং রবীন্দ্রনাথ] প্রভৃতি বালকদের 'গৃহশিক্ষক' পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। ব্রজনাথ ঐ পদে কত বৎসর কাজ করেছিলেন, তা এখনও সঠিক ভাবে জানতে পারি নি, প্রশান্তকুমার পাল-রচিত 'রবি জীবনী, ২য় খণ্ড' (২২শে শ্রাবণ, ১৩৯১) গ্রন্থে ব্রজনাথ দে সম্পর্কে কোন সংবাদ নেই। তবে তিনি যে 'সঞ্জীবনী সভা'টির আয়ুষ্কালে ঐ পদে ছিলেন, তা রবীন্দ্রনাথের 'জীবন স্মৃতি' গ্রন্থে পাওয়া যায়। ('জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন স্মৃতি' গ্রন্থের ১৭০ পৃষ্ঠায় কাপড়ের বদলে কলে-প্রস্তুত সামান্য 'গামছা' মাথায় বেঁধে 'ব্রজবাবু'র 'উন্মত্তের মত তাণ্ডব নৃত্য' ছাড়া আর কোন উল্লেখ নেই।) রবীন্দ্রনাথ 'জীবন স্মৃতি-তে লিখেছেন যে ব্রজনাথ 'কিছুকাল আমাদের ঘরের শিক্ষক ছিলেন' (পৃ: ১৫১)। 'কিছুকাল' শব্দটি অনির্দিষ্ট কালজ্ঞাপক—তবে গুপ্ত সভাটির পতনের পরেও যে কিছুদিন ব্রজনাথ ঐ পদে কর্মরত ছিলেন, রবীন্দ্রনাথের উক্তি থেকে এরূপ অনুমিত হয়। এরূপ অনুমানের পক্ষে একটি প্রমাণও আছে। সরলা দেবী তাঁর 'জীবনের ঝরাপাতা' (ফাল্গুন, ১৮৭৯ শকাব্দ) নামক স্মৃতিকথায় সংবাদ

দিয়েছেন যে তাঁর বড় মামা 'দ্বিজেন্দ্রনাথের ছেলেমেয়ে'-দের, তিনপুত্র (নীতীন্দ্রনাথ, সুধীন্দ্রনাথ ও কৃতীন্দ্রনাথ ও এক কন্যা উষাবতী)-র, গৃহশিক্ষক ছিলেন ব্রজনাথ (পৃঃ ১৪—১৫)। কৃতীন্দ্রনাথের জন্ম ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে। সুতরাং ব্রজনাথের কাছে পড়বার সময়ে কৃতীন্দ্রনাথের বয়স যদি পাচ-ছয় বৎসর হয়ে থাকে, তাহলে ঠাকুর বাড়িতে ব্রজনাথের গৃহশিক্ষকতার সময়কাল দু'তিন বছরের কম হবে না, তার বেশিও হতে পারে।

কিন্তু শুধু সময়ের নিক্তিতেই ঠাকুরবাড়ির মতো পরিবারের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে ওঠার ওজন করার দরকার দেখি না, কেননা অনেকদিন থেকেই সে-বাড়ির দরজা সকলের পক্ষেই ছিল অবারিত। ঠাকুর-বাড়ির সঙ্গে ব্রজনাথের ঘনিষ্ঠতার প্রমাণ উপস্থিত করবার পূর্বে আমরা ঠাকুর-বাড়ির ঐ সময়ের আর একজন 'গৃহশিক্ষকে'র কথাও প্রসঙ্গত উল্লেখ করছি, তা থেকে বাইরের মানুষকে আপন করে নেওয়ার ব্যাপারে ঠাকুর বাড়ির দ্বার এবং ঐ বাড়ির বাসিন্দাদের হৃদয়ের দ্বার যে কত অবারিত ছিল, তা বুঝতে সুবিধা হবে। প্রশান্তকুমার পাল তাঁর 'রবি জীবনী, ১ম খণ্ড' গ্রন্থে সংবাদ দিয়েছেন যে, ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে 'মেট্রোপলিটান স্কুলের শিক্ষক'' রামসর্ব্বস্ব বিদ্যাভূষণ [ভট্টাচার্য] সংস্কৃত পড়াবার কাজে নিযুক্ত হন।...অল্পদিনের মধ্যেই তিনি ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন।' এই 'ঘনিষ্ঠ'তার প্রমাণ স্বরূপ প্রশান্তবাবু 'রামসর্ব্বস্বের মারফৎ' বালকদের স্কুলের 'বেতন' প্রেরণ এবং 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে নাটকের প্রুফ-সংশোধনে সাহায্য' করার কথা বলেছেন (পৃঃ ২২৫)। রামসর্বস্বের চেয়েও ব্রজনাথ যে আরো বেশি পরিমাণে ঠাকুর-বাড়ির সঙ্গে 'ঘনিষ্ঠ' হয়ে উঠেছিলেন, তার প্রমাণ রবীন্দ্রনাথের 'জীবন স্মৃতি'তেই আছে, যেমন ঠাকুর বাড়ির জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির সঙ্গে অনুগমনকারী 'রবাহূত অনাহূত' অপরিচিত লোকের দলবল, শিকার-পর্ব্বান্তে ফেরার পথে কোন এক বাগানের কাছে এলে 'চুলে পাক ধরা' ব্রজনাথ কর্তৃক সেই বাগানের 'মালি'-কে বোকা বানিয়ে সকলকে ডাবের জল খাওয়ানো (পৃঃ ১৫১), আবার 'সঞ্জীবনী সভা'-র অর্থানুকূল্যে শেষাবধি কলে কাপড়ের বদলে গামছামাত্র প্রস্তুত হলে, সেই 'গামছার টুকরা' মাথায় বেঁধে 'জোড়াসাঁকোর বাড়িতে' বৃদ্ধ ব্রজনাথের 'তাণ্ডব নৃত্য' (পৃঃ ১৫৩), সেখানে পাওয়া যায়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর 'জীবনস্মৃতি'তে ব্রজনাথের এই তাণ্ডব-নৃত্যের সঙ্গে আর একটু বর্ণনা জুড়ে দিয়েছেন, 'একে একে সকল সভ্যই শেষে তাঁহার সঙ্গে নৃত্যে যোগ দিলেন' (পৃঃ ১৭০)। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-

বাড়িতে পরিচিত-অপরিচিত অসংখ্য লোকজনের সঙ্গে সম্ভবতঃ বাড়ির মেয়েরাও ঐ সময়ে উপস্থিত ছিলেন, এবং এঁদের সকলের সামনে 'চুলে পাক' ধরা প্রায়-বৃদ্ধ ব্রজনাথের এই প্রকার তাণ্ডব নৃত্য যে ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে তাঁর একান্ত ঘনিষ্ঠতার অভ্রান্ত পরিচয় দেয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

রবীন্দ্রনাথের উপরোক্ত বর্ণনা দুটিকে যদি ঠাকুর-বাড়ির বাহির মহলের ঘটনা বলে মনে করা হয়, তাহলে সে-বাড়ির অন্দর মহলে ব্রজনাথ কিভাবে গৃহীত হয়েছিলেন, তা দেখারও চেষ্টা করা যেতে পারে। সরলাদেবী সেই অন্দর-মহলের একটুখানি পর্দা তুলে ব্রজনাথকে যেটুকু দেখিয়েছেন, তার মধ্য দিয়েই বোঝা যায় ব্রজনাথ সে-পরিবারের সঙ্গে কতটা ঘনিষ্ঠ হয়ে গিয়েছিলেন। সরলাদেবী লিখেছেন, 'মেট্রপলিটনের হেডমাষ্টার ব্রজবাবু। অতি সরস, অতি সহাস্য, অতি মজাড়ে লোক। তাঁর কোনোই শাসন ছিল না, বরঞ্চ অহেতুক পুরস্কার ছিল। তাঁর শাসন প্রবৃত্তি মেট্রপলিটনের ছাত্রদের উপর দিয়েই নিঃশেষিত হ'ত। তাদের কাছ থেকে শাস্তিস্বরূপ বাজেয়াপ্ত করা ছুরি, রঙিন পেনসিল প্রভৃতি কিছু না কিছু পকেট থেকে ফস্ করে বাড়ির পড়ুয়াদের দেখিয়ে ও দিয়ে তিনি তাদের আনন্দে আনন্দ পেতেন।' সরলাদেবী ও তাঁর 'দাদা' [জ্যোৎস্নানাথ]-এর গৃহশিক্ষক ছিলেন যে 'পণ্ডিত মহাশয়' ['পণ্ডিত মশায়' কি রামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য ?], তাঁর ঘরে ব্রজনাথবাবু মাঝে মাঝে 'ভদ্রতার বিনিময়' করতে যেতেন। এই 'পণ্ডিত মশায়' একদিন সরলাদেবী ও তাঁর দাদাকে 'কোণে দাঁড়ানোর বদলে শাস্তি দিলেন পড়ার টেবিলের তলায় গিয়ে গুটিসুটি মেরে বসতে। আর হুকুম করলেন—'আজ ব্রজবাবু যখন আসবেন, আমার সঙ্গে গল্প-সল্প করবেন, তখন তোমরা ঐখান থেকে তাঁর পায়ে চিমটি কাটবে, তাঁর খুব আমোদ হবে'।[৪৭]

এই প্রকার বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে 'সঞ্জীবনী সভা'র সভাপতি সহ পাঁচজন সভ্যের মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে, বাকি তিন জন ব্যক্তি ঠাকুর পরিবারের প্রায়-অন্তর্ভুক্তই ছিলেন। এবং সেইভাবে ধরলে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে 'সঞ্জীবনী সভা'টি ঠাকুর বাড়ির ছাপমারা একটা সাময়িক সংস্থা ছাড়া আর কিছু নয়।

জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবারের [রবীন্দ্রনাথ-প্রোক্ত] 'স্বাদেশিকের সভা' বা 'গুপ্ত সভা'-টির আয়ুষ্কালে তার নাম 'সঞ্জীবনী সভা' বা 'হামচুপামুহাফ' ছিল কিনা, প্রবন্ধের প্রথম ভাগে এবিষয়ে আমাদের সংশয়ের ইঙ্গিতমাত্র করে প্রবন্ধের শেষভাগে বিষয়টি সম্পর্কে আরো কিছু বক্তব্য পেশ করার অঙ্গীকার আমরা

করেছি। সে বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা ও সন্ধান করে আমরা দেখেছি যে এই সংশয়োৎপত্তির মূল উৎস হল তিনটি—একটি মুখ্য, অপর দুটি গৌণ। আমরা প্রথমে গৌণ উৎস দুটি ধরে, অর্থাৎ বিশ্লেষণ করে মুখ্য উৎসে গিয়ে আমাদের বক্তব্যকে সম্পূর্ণতা দান করবো। সম্ভবতঃ তাতে পাঠকদেরও বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবনের পক্ষে কিঞ্চিৎ সুবিধা হবে।

এই গৌণ উৎস দুটির প্রথমটি হোল, সাপ্তাহিক 'বিজলী' পত্রিকার ১৩২৯ সালের ২৬শে শ্রাবণ (ইং ১১ই আগস্ট, ১৯২২) দ্বিতীয় বর্ষ, ঊনচল্লিশ সংখ্যার বারীন্দ্রকুমার ঘোষের প্রায়-ধারাবাহিকভাবে[৪৮] প্রকাশিত 'বোমার যুগের কাহিনী' রচনাটি। রচনাটির প্রাসঙ্গিক অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত করে রবীন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কথিত গুপ্ত সভার বর্ণনার সঙ্গে বারীন্দ্রকুমার কথিত গুপ্ত সভাটির বর্ণনার সামান্য সাদৃশ্যের কথা আমরা ইতিপূর্বে দেখাবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু এক্ষেত্রেও দুটি বিকল্প কল্পনার অবকাশ আছে। এক, তিনি রবীন্দ্রনাথ-জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থদ্বয় (তখনও আত্মপরিচয় প্রকাশিত হয়নি) পড়ে গুপ্তসভা সংক্রান্ত ব্যাপারটি জেনেছিলেন, এবং দুই, রাজনারায়ণ বসুর মুখে বিষয়টি শুনেছিলেন। আমরা যদি প্রথমটিকে গ্রহণ করি, তাহলে স্বাভাবিক প্রশ্ন হবে, 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি'-তে সভাটির নাম 'সঞ্জীবনী সভা', তথা তার সাংকেতিক নাম 'হাম্‌চুপামুহাফ' পাওয়া সত্ত্বেও বারীন্দ্রকুমার তার কোনটাকেই তাঁর রচনায় ব্যবহার করলেন না কেন? তাছাড়া এই দুটি 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থ-বহির্ভূত 'তলোয়ার ঝল্‌মল্' করতে বা 'ঘরটির কোণে' উপবিষ্ট 'একজন সভ্য'কেই বা তিনি কোথায় দেখেছেন এবং ঐ সভ্যের মুখে মাঝে মাঝে 'কিস্‌সু হবেনা' জাতীয় নৈরাশ্য-ব্যঞ্জক শব্দগুলিই বা তিনি কোথায় শুনেছেন? দ্বিতীয় বিকল্পটিকে গ্রহণ করলে সেক্ষেত্রেও প্রশ্ন দাঁড়াবে রাজনারায়ণ বসু তাঁর দৌহিত্র বারীন্দ্রকুমারকে সভার সভ্যদের নাম-ধাম সব বলেছিলেন (বারীন্দ্রকুমার তাঁর রচনায় ইচ্ছাকৃতভাবে[৪৯] সেসব নাম বলেন নি), সভাগৃহের বর্ণনা দিয়েছিলেন, সভার উপকরণাদির কথা বলেছিলেন, এমনকি 'কিস্‌সু হবে না' উচ্চারণ-রত 'ঘরটির কোণে' উপবিষ্ট 'একজন সভ্য'-এর ছবি আঁকতেও কসুর করেন নি, অথচ সভার কার্যবিবরণী যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-উদ্ভাবিত গুপ্তভাষায় লিখিত হোত, এবং সভাটির নাম যে 'সঞ্জীবনী সভা' ছিল এই সংবাদগুলি তিনি কি তাঁকে জানান নি? রাজনারায়ণ বসু অত্যন্ত রসিক ব্যক্তি ছিলেন, সর্ব বয়সের মানুষের সঙ্গেই হাস্য-পরিহাসের মাধ্যমে সহজেই অন্তরঙ্গ হয়ে উঠতে পারতেন।[৫০] সুতরাং বৃদ্ধ বয়সে দৌহিত্রের সামনে

স্মৃতিচারণ করতে বসে 'সঞ্জীবনী সভা'র সাংকেতিক নাম 'হামচুপামুহাফ্' নিয়েও হাস্যপরিহাসের অজস্রধারা প্রবাহিত করে দেবেন, এইরূপই প্রত্যাশিত ছিল, কিন্তু তিনি কি তা করেন নি? তিনি কি গুপ্ত-ভাষায় সভার কার্য-বিবরণাদি লেখার কথা, বা সভাটির দুটি নামের কথা জানতেন না? যদি জানতেন তবে কি তা বলেন নি? অথবা, যদি এমন মনে করা যায় যে সব জেনে-শুনেও তিনি সভার ঐ প্রসঙ্গগুলি বলেন নি, তাহলেও প্রশ্ন থাকে তাঁর এই না-বলার সঙ্গে তাঁর কি কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ জড়িত ছিল? পক্ষান্তরে আমরা মনে করতে পারি যে গুপ্ত-সভাটির আরো অনেক বিস্তৃত তথ্য খুঁটিনাটি বর্ণনাই তিনি বারীন্দ্রকুমারের সামনে দিয়েছিলেন (এবং সেটা স্বাভাবিক বলেই আমরা মনে করি), যার অনেকটাই সম্ভবতঃ বারীন্দ্রকুমার ভুলে গিয়েছিলেন[৫১] [বারীন্দ্রকুমারের লেখা অংশটুকু পড়ে যা সম্ভব নয় বলেই মনে হয়, বিশেষতঃ গুপ্ত-সমিতি গঠন করে আগ্নেয়-অস্ত্র নিয়ে দেশের মুক্তিসংগ্রামে প্রত্যক্ষভাবে যিনি অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তিনি মাতামহদের 'পোষার্কা' গুপ্ত সমিতির নাম পর্যন্ত যে ভুলে যাবেন এমন মনে হয় না], অথবা ইচ্ছাকৃত ভাবেই বলেন নি। এক্ষেত্রেও একই প্রশ্ন জাগবে এই সংবাদ না-জানানোর মধ্যে বারীন্দ্রকুমারের ব্যক্তিগত স্বার্থ, অর্থাৎ লাভ-লোকসানের কোন প্রশ্ন জড়িত ছিল কি? যিনি জোরের সঙ্গে (সগর্বে?) জানাচ্ছেন, 'দুটি গুপ্ত সমিতির কথা আমিই জানি' বলে, তিনি সভাটির দুটি নামের অন্ততঃ একটিকেও বলে, এবং গুপ্তভাষা দ্বারা সভার কার্যবিবরণী লেখার সংবাদ ইত্যাদি জানিয়ে [যেখানে পুলিশের ভয়ে ভীত হবার কোন কারণ ছিল না, কেননা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-রবীন্দ্রনাথের রচনায় সভাটির অনেক কথাই তখন প্রকাশিত হয়ে গেছে] সভাটি সম্পর্কে তিনি কতদূর পর্যন্ত 'জানেন', তার নিঃসংশয় প্রমাণ দিতে পারতেন, সেখানে জেনে-শুনেও সংবাদটিকে পরিপূর্ণ তথা পূর্ণাঙ্গ করার সুযোগটিকে যে তিনি হারাবেন, একথাই বা আমরা স্বীকার করি কি করে?

তাছাড়া এখানে আরো একটা বিষয় ভেবে দেখার আছে। আলোচ্য রচনাটি 'বিজলী'তে প্রকাশিত হবার অনেক আগেই যে তার তোড়জোড় সুরু হয়েছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় 'বিজলী'-র ১ম বর্ষ ৪৮ সংখ্যার (১১ই কার্তিক, ১৩২৮; ২৮শে অক্টোবর, ১৯২১) ৫নং পৃষ্ঠার শীর্ষদেশে বড় বড় অক্ষরে মুদ্রিত 'নতুন বছরের 'বিজলী'-তে 'বারীন্দ্রের বোমার কাহিনী' এই বিজ্ঞাপন থেকে। বিজ্ঞাপনদাতা 'বিজলী কর্মকর্তা' এই বিজ্ঞাপনে আগামী বছর থেকে বিজলীর 'সামান্য মূল্যবৃদ্ধি'-র কথা ঘোষণা করে জানিয়েছেন,

'দ্বিতীয় বছরের প্রথম সংখ্যা থেকে বিজলীতে আমরা বারীন্দ্রের বোমার কাহিনী ক্রমশঃ ছাপাবো। কি করে জেলায় জেলায় গুপ্ত সমিতি গড়া হয়, কি করে রেলের নীচে বোমা পাতা হোত, এই রকম কত রহস্যময় ব্যাপার. সেই কথিকাতে পাবেন, গল্পটি উপন্যাসের মতো মনোরঞ্জক হবে। তার জন্যে আশা করি বিজলীর পাঠকেরা সামান্য বেশি দিতে নারাজ হবেন না।' ২য় বর্ষ ১ম সংখ্যার (২রা অগ্রহায়ণ, ১৩২৮, ১৮ই নভেম্বর, ১৯২১) প্রথম পৃষ্ঠাতেই বড় বড় অক্ষরে মুদ্রিত হয়েছিল 'বোমার যুগের কথা'। তার নীচে লেখা হয়েছিল 'আগামী সংখ্যা থেকে বারীন্দ্রকুমার ঘোষের 'বোমার যুগের কথা'র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করা হবে।' কিন্তু কার্যতঃ তা হয় নি। তার পরিবর্তে পরের সংখ্যা, ২য় বর্ষ ২য় সংখ্যার (২৫শে নভেম্বর, ১৯২১) ১৫ পৃষ্ঠার উপরের দিকে 'বারীন্দ্রকুমার ঘোষ' স্বাক্ষরিত 'শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি' নামে এই পত্রটি প্রকাশিত হয় 'বোমার যুগের কথা' বিজলীতে প্রকাশ করবো বলে আমরা পাঠকদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, কিন্তু একাজের পথে অনেক অন্তরায়, সেসব বিঘ্ন সরিয়ে আমাদের প্রতিশ্রুতি পালন করতে হবে। পাঠকরা অধীর হবেন না, বিলম্বে হোক, কিন্তু ব্রত উদযাপন করা চাই। ইতি নিবেদক শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ।' এই পত্রটি পরের সংখ্যার (২রা ডিসেম্বর, ১৯২১) ১২-পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হয়েছে। তার পরের সংখ্যার (২য় বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, ৯ই ডিসেম্বর, ১৯২১) প্রথম পৃষ্ঠার একেবারে উপরের দিকে ডানদিকের কোণে এই বিজ্ঞপেনটি প্রকাশিত হয়, 'বিজলীর দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যা থেকেই 'বোমার কথা' নিয়মিত ভাবে বার হবার কথা ছিল। কিন্তু সম্মুখে বিশেষ একটি বাধা উপস্থিত হওয়ায় আমরা এখন ছাপতে পারলাম না। আগামী জানুয়ারী মাস থেকে 'বোমার কথা' পাঠক-পাঠিকাদের আমরা দিব। আশাকরি, সবাই আমাদের এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি মার্জনা করিবেন। ইতি বিনীত 'বিজলী'র কর্ম-কর্তা'। এখানে প্রথমতঃ লক্ষণীয় এই যে 'বিজলী'র ১মবর্ষ ৪৮-সংখ্যায় রচনাটির নাম দু'বার বলা হয়েছে 'বোমার কথা', ২য় বর্ষ ১ম সংখ্যায় প্রদত্ত বিজ্ঞাপনে রচনাটির নাম 'বোমার যুগের কথা'রূপে বিজ্ঞাপিত হয়েছে; ২য় বর্ষ ২য় সংখ্যায় 'শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি' পত্রে বারীন্দ্রকুমারও রচনাটির নাম 'বোমার যুগের কথা' বলে ঘোষণা করেছেন; ২য় বর্ষ ৪র্থ সংখ্যায় 'বিজলীর কর্মকর্তা' প্রদত্ত বিজ্ঞাপনে রচনাটিকে 'বোমার কথা' বলে দু'বার উল্লেখ করা হয়েছে, এবং পরবর্তী ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা দুটিতেও ওই একই বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ লক্ষণীয় এই যে, ২য় বর্ষ ৮ম সংখ্যায়

(২২শে পৌষ, ১৩২৮ , ৬ই জানুয়ারী, ১৯২২) রচনাটি 'দ্বীপান্তরের কথা' নামে প্রথম মুদ্রিত হয়, এবং তা অনিয়মিতভাবে (৪৮-সংখ্যক পাদটীকা দ্রষ্টব্য) প্রকাশিত হয়ে ২৭-সংখ্যায় (৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯ , ১৯শে মে, ১৯২২) 'দ্বীপান্তরের দুচার কথা', শীর্ষক অধ্যায়ে সমাপ্ত হয়। এরপর দুমাস বাদ দিয়ে ২য় বর্ষ ৩৬ সংখ্যা (৫ই শ্রাবণ, ১৩২৯ , ২১ জুলাই ১ ২২) থেকে 'দ্বীপান্তরের কথা' নামটির বদলে 'বোমাব যুগের কাহিনী, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, পূর্বপ্রকাশিতের পর' এই শব্দগুলির দ্বারা চিহ্নিত হয়ে রচনাটি প্রকাশিত হতে শুরু করে। সুতবাং রচনাটি প্রকাশের পশ্চাদ্‌বর্তী এই ইতিহাস এবং 'বিজলী'র ২য় বর্ষ ৩৯-সংখ্যা (২৬শে শ্রাবণ, ১৩২৯ ; ১১ই আগষ্ট, ১৯২২), যেখানে বারীন্দ্রকুমার 'গুপ্ত সমিতি'র কথা বলেছেন, তা মনে রাখলে দেখা যায় যে অন্তর্বর্তী প্রায় আটমাস কাল বচনাটি সম্পর্কে লেখককে অনেক চিন্তাভাবনাই করতে হয়েছিল। এই চিন্তা-ভাবনার প্রমাণ রয়ে গেছে বাবীন্দ্রকুমারের পূর্বোক্ত 'লেখকের কৈফিয়ৎ' বচনাটিতেও। সুতরাং রাজনারায়ণ বসু-প্রদত্ত বর্ণনাব অংশ তিনি ভুলে গিয়েছিলেন বা ইচ্ছাকৃত-ভাবে দেন নি, এদুটোর কোনটাই গ্রহণযোগ্য নয়। এবং এই প্রকার বিশ্লেষণ থেকে আমাদের এই ধারণাই ঘনীভূত হয় যে, রাজনাবায়ণ বসুও সম্ভবতঃ সভাটির আয়ুষ্কালে তাব নাম 'সঞ্জীবনী সভা' তথা হামচুপামুহাফ্' এবং গুপ্তভাষায় সভার কার্যবিবরণাদি লিখিত হওয়ার কথা জানতেন না, (সভার 'সভাপতি' রূপে যেগুলি তাঁরই বিশেষ ভাবে জানার কথা) এবং সেইকারণে দৌহিত্র বারীন্দ্রকুমারকেও এসকল কথা বলেন নি।

দ্বিতীয় গৌণ উৎসটি হোল, ১৩১৮ সালের মাঘ-সংখ্যা 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত জনৈক অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির 'সত্য, সুন্দর, মঙ্গল' শীর্ষক রচনাটি। এই রচনার একটি প্রাসঙ্গিক অংশ নিয়ে আমরা ইতিপূর্বেই সামান্য কিছু আলোচনা করেছি। পুনরায় বিশেষ কারণে রচনাটিকে একটু বিস্তৃত ভাবে বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। কিন্তু তার পূর্বে প্রাসঙ্গিক যে-সংবাদটি আমাদের মনে রাখা দরকার, তা হ'ল এই যে জ্যোতি-রিন্দ্রনাথের 'সত্য, সুন্দর, মঙ্গল' এই অনূদিত গ্রন্থটি প্রকাশের [২০শে ডিসেম্বর, ১৯১১, ৪ঠা পৌষ, ১৩১৮] মাস-খানেকের মধ্যেই, ১৩১৮ সালের মাঘ সংখ্যায় [১লা মাঘ, ১৩১৮, ১৫ই জানুয়ারী, ১৯২২][৫২] এই 'সত্য, সুন্দর, মঙ্গল' রচনাটি আত্মপ্রকাশ করে। এই তথ্য থেকে আমাদের

বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, প্রেসে যখন জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'সত্য,সুন্দর, মঙ্গল' গ্রন্থটির মুদ্রণকার্য চলছে বা দপ্তরির বাড়িতে বই বাঁধাই হচ্ছে, তখনই ঐ নামহীন লেখক গ্রন্থটির সমালোচনাপযোগী তথ্যাদি (মূলতঃ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের তৎকাল পর্যন্ত জীবনকথা সম্বন্ধীয় মাল মশলা] ঠাকুরবাড়ি থেকে সংগ্রহ করে প্রবন্ধটি রচনা সুরু করেছেন, বা তা শেষ করেছেন। এটি যে আমাদের নিছক অনুমান মাত্র নয়, তার প্রমাণ রচনাটির বহু স্থানে আছে। (পরে আলোচনা করছি)।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের দুটি ছবিসহ ছোট বড় মিলিয়ে ১৭টি অনুচ্ছেদে ছয় পৃষ্ঠায় [পৃষ্ঠা ৯৯০ থেকে ৯৯৫] 'সত্য, সুন্দর,মঙ্গল' রচনাটি সমাপ্ত প্রথম অনুচ্ছেদে উপস্থাপ্য বিষয়, অর্থাৎ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর এই গ্রন্থের দ্বারা 'জাতীয় সাহিত্য ভাণ্ডারে একটি অপূর্ব রত্ন উপহার' দিয়েছেন একথা বলা হয়েছে। 'বিদেশী সাহিত্য ভাণ্ডার হইতে রত্ন সংগ্রহ করিয়া জাতীয় সাহিত্য ভাণ্ডার পরিপুষ্ট' করার মহৎ কর্তব্য সাধনে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'কঠোর পরিশ্রম, গভীর অনুসন্ধিৎসা এবং প্রচ্ছন্ন স্বদেশ প্রীতির পরিচয়' কি ভাবে প্রকাশ পেয়েছে, তা দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে। তৃতীয় অনুচ্ছেদে দার্শনিক কুঁজ্যার 'রচনার বিশেষত্ব—প্রাঞ্জলতা, সুললিত রচনাবিন্যাস ও মনোরম তর্কপ্রণালী', জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 'অনাবশ্যক পাণ্ডিত্য প্রকাশ' না করেও কেমন চমৎকার ভাবে বজায় রেখেছেন, তা জানানো হয়েছে। চতুর্থ অনুচ্ছেদে সত্য, সুন্দর ও মঙ্গল এই তত্ত্বগুলি পর্যায়ক্রমে 'তিন খণ্ডে' আলোচনায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উক্ত গ্রন্থের প্রথম খণ্ড অপেক্ষা দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড তুলনামূলকভাবে যে অনেক বেশি সরস হয়েছে, যদিচ 'কুঁজ্যার ন্যায় একজন মৌলিক চিন্তাশীল মনীষীর মতবাদ সংক্ষিপ্তভাবে প্রকাশ করিতে আমরা অক্ষম', একথা জানানো হয়েছে। পঞ্চম অনুচ্ছেদে 'আত্মা ও বাহ্য জগৎ এই অসীম কারণদ্বয়ের পার্থক্য' এবং এই বিষয়ে দার্শনিক 'স্পাইনোজা (Spinoza)'-র সঙ্গে কুঁজ্যার মতের পার্থক্য সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। ষষ্ঠ অনুচ্ছেদে কুঁজ্যার 'মতের' সঙ্গে ভারতীয় 'উপনিষদোক্ত উপদেশ'-এর সাদৃশ্য সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে। এই ভাবে কিঞ্চিদূন দেড় পৃষ্ঠায় (পৃঃ ৯৯০-৯৯১) মধ্যে ছয়টি অনুচ্ছেদের বক্তব্য প্রকাশের পর সপ্তম অনুচ্ছেদে লেখক বলেছেন, 'জ্যোতিরিন্দ্রবাবু এই বিরাট যুক্তিতর্কপূর্ণ বিশাল গ্রন্থের অনুবাদ করিয়া বঙ্গ সাহিত্যানুরাগীব্যক্তি মাত্রেরই

কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন...এই অক্লান্ত সাহিত্যসেবী যে পরিমাণে বঙ্গ সাহিত্যের শ্রীবর্ধনে আপনার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিয়াছেন, তাহার যোগ্য সম্যক্ সমাদর বাঙ্গালী তাঁহাকে প্রদান করেন নাই' (পৃঃ ৯৯১)। এই আক্ষেপোক্তির পর 'অল্পকথায় তাঁহার (জ্যোতিরিন্দ্রনাথের) একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয়মাত্র' দিতে গিয়ে ছয় পৃষ্ঠা রচনার প্রায় সাড়ে চার পৃষ্ঠা ব্যাপী দশটি অনুচ্ছেদে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের তৎকাল-পর্যন্ত জীবনকথা তিনি যে লিপিবদ্ধ করতে চলেছেন (যার পাণ্ডুলিপি ইতিমধ্যেই তিনি প্রস্তুত করে ফেলেছেন), সে কথা মনে রেখে খানিকটা আত্মদোষস্খালনের জন্য (পূর্বাহ্ণে আত্মপক্ষসমর্থনের অভিপ্রায়ে) এই কথাগুলি তিনি বললেন, 'এই অবসরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন সম্বন্ধে মোটামুটি দু একটা কথা বলিলে বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।' বস্তুতপক্ষে সম্পূর্ণরূপে 'ধান ভানতে শিবের গীত'-এর মতো না হলেও, তা যে একটু 'অপ্রাসঙ্গিক' হচ্ছে, এবোধ লেখকেরও ছিল। আসলে লেখক ইতিমধ্যেই ঠাকুর পরিবার থেকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনীর বহু উপাদান সংগ্রহ করে ফেলেছিলেন। সেগুলিকে রচনাকারে প্রকাশ করবার একটা অবকাশ তিনি পেলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-অনূদিত 'সত্য, সুন্দর, মঙ্গল' গ্রন্থটির সমালোচনা উপলক্ষে। এবং তাঁর সেই সংগৃহীত তথ্য তথা সংবাদগুলিকে পরিবেশন করবার জন্যেই আত্মপক্ষসমর্থনের আশায় প্রাসঙ্গিক-অপ্রাসঙ্গিকের মধ্যে তিনি একটা বোঝাপড়া করে নিতে চেষ্টা করেছেন।

যাই হোক, রচনাটি কিন্তু নানা দিক দিয়েই মূল্যবান্। এটিকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'প্রথম' জীবনী বা জীবনীর খসড়ার মর্যাদা দেওয়া যেতে পারে।[৫৩] 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন সম্বন্ধে মোটামুটি দু একটা কথা' বলতে গিয়ে রচনা-লেখক প্রথমে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সাহিত্য-প্রতিভা ও সাহিত্য-সাধনার কথা বলেছেন, তারপর তাঁর পারিবারিক, অর্থাৎ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যে 'বিপত্নীক এবং নিঃসন্তান' সে সংবাদ দিয়েছেন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'চরিত্রের বিনয় ও অকপট সরলতা', 'সহৃদয়', 'মিষ্টভাষী', 'অত্যন্ত সাধাসিধা এ সকল বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন। দুটি অনুচ্ছেদে (অষ্টম ও নবম) এ সকল কথা বলার পর দশম অনুচ্ছেদ থেকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনকথা শুরু করেছেন এই বলে, 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ শৈশব হইতেই কলাবিদ্যার প্রতি অনুরাগী।' এবং এই সূত্রে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'পুরুবিক্রম' ('রজতগিরি'

বঙ্কিমচন্দ্র কর্তৃক প্রশংশিত হওয়ার কথাসহ) 'সরোজিনী', 'অশ্রুমতী' প্রভৃতি ('বঙ্গীয় নাট্য-সাহিত্যের অলঙ্কার স্বরূপ') নাটক, বঙ্গসাহিত্যের 'প্রথম ঐতিহাসিক নাটক' রচনা, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'অলীকবাবু', 'দায়েপড়ে দায়-গ্রহ' প্রভৃতি 'বিশেষ আদৃত' 'প্রহসন'-এর উল্লেখের পরেই প্রবন্ধ-লেখকের ঠাকুর বাড়ীতে গমনাগমন তথা ঘনিষ্ঠ-সান্নিধ্যের প্রমাণ স্বরূপ কি ভাবে তিনি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনকথা সংগ্রহ কবেছেন তার ইঙ্গিত দিয়েছেন,'শুনিয়াছি, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উৎসাহেই কবিবর রবীন্দ্রনাথ প্রথম সাহিত্য সেবায় উৎসাহিত হন।' রবীন্দ্রনাথের 'জীবন স্মৃতি' ১৩১৮ সালের ভাদ্র সংখ্যা থেকে 'প্রবাসী' পত্রিকায় তখন ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হচ্ছে এবং পৌষ, ১৩১৮ পর্যন্ত প্রকাশিত পাঁচটি সংখ্যায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কর্তৃক রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্য সেবায় উৎসাহিত' হয়ে ওঠার ইঙ্গিত মাত্রও কোথাও নেই। বিষয়টিকে স্পষ্ট করার জন্য এই পাঁচটি সংখ্যায় প্রকাশিত 'জীবন স্মৃতি-'র প্রাসঙ্গিক অংশ সমূহ বিশ্লেষণ করে দেওয়া হচ্ছে—১ম সংখ্যায় (ভাদ্র ১৩১৮) প্রকাশিত শীর্ষনামহীন অধ্যায় (ভূমিকা? তারিখহীন 'জ্যেষ্ঠ ১৩১৮' সালে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা পত্রে রবীন্দ্রনাথ সম্ভবতঃ 'জীবন স্মৃতি-'র এই অংশটিকে 'ভূমিকা' বলে উল্লেখ করতে চেয়েছিলেন, 'ভূমিকাটি আগাগোড়া বদলে দিয়েছি, বোধহয় দেখেছ।') 'শিক্ষারম্ভ' এবং 'ঘর ও বাহির', এই তিনটি অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথেরদাদাদের কোন উল্লেখ নেই। ২য় সংখ্যা(আশ্বিন, ১৩১৮)-তে প্রকাশিত চারটি অধ্যায় ('ভৃত্যরাজক তন্ত্র', 'নর্মাল স্কুল', 'কবিতা রচনারম্ভ', 'নানা বিদ্যার আয়োজন',)-এর মধ্যেও দাদা-দের উল্লেখ নেই। 'কবিতা রচনারম্ভ' অধ্যায়ে 'ভাগিনেয় জ্যোতিঃপ্রকাশ-'এর উৎসাহে রবীন্দ্রনাথের 'পদ্য' লেখায় হাতে-খড়ির কথা আছে। ৩য়সংখ্যায় (কার্তিক, ১৩১৮) প্রকাশিত অধ্যায় তিনটি ('বাহিরে যাত্রা', 'কাব্য রচনাচর্চা', 'শ্রীকণ্ঠবাবু')-র মধ্যে 'শ্রীকণ্ঠবাবু' অধ্যায়ে প্রথম 'দাদাদের' এই শব্দটির একবার মাত্র ব্যবহার আছে, 'এই বৃদ্ধটি আমার পিতার, তেমনি দাদাদের, তেমনি আমাদেরও বন্ধু ছিলেন'। ৪র্থ সংখ্যায় (অগ্রহায়ণ, ১৩১৮) প্রকাশিত দুটি অধ্যায় ('বাংলা শিক্ষার অবসান' ও 'পিতৃদেব')-এর মধ্যে 'বাংলা শিক্ষার অবসান' অধ্যায়ে 'দাদারা' এই শব্দটির একবার মাত্র ব্যবহার আছে, 'পলায়নের একটি সহায় পাইয়া ছিলাম। দাদারা এক জনের কাছে পার্শি পড়িতেন'। 'পিতৃদেব' অধ্যায়ে, ছেলেবেলার স্মৃতি উত্থাপন করে

"বড়োদাদা' কথাটি কবি একবার ব্যবহার করেছেন, 'আমার নিতান্ত শিশু কালে মূলাজোড়ে গঙ্গার ধারের বাগানে মেঘোদয়ে বড়োদাদা ছাদের উপরে একদিন মেঘদূত আওড়াইতে ছিলেন'। ৫ম সংখ্যা (পৌষ, ১৩১৮)-র একটি মাত্র অধ্যায়ে ['হিমালয় যাত্রা'] ইতঃপূর্বে অর্থাৎ আরো ছেলেবেলায় ('শ্রীকণ্ঠবাবু' অধ্যায়ে ঘটনাটি কবি সকৌতুক উল্লেখ করেছেন) শ্রীকণ্ঠবাবুর কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথ-রচিত 'দুইটি পারমার্থিক গান' শুনে পিতৃদেব দেবেন্দ্রনাথ হেসে ছিলেন,সেই হাসির 'শোধ' আরো 'বড়োবয়সে' 'একবার মাঘোৎসবে সকালে ও বিকালে' রবীন্দ্রনাথ 'অনেকগুলি গান তৈরি' করেছিলেন, এবং 'চুঁচুড়ায়' অবস্থানরত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে শুনিয়ে 'পাঁচশো টাকার চেক' 'পুরস্কার' পেয়েছিলেন, সেই [অনেক পরবর্তী কালের] কথা এই অধ্যায়ে টেনে এনেছেন, এবং সেই সময়ে তাঁর গানের সঙ্গে 'জ্যোতিদাদার' হারমোনিয়াম বাজানোর কথা বলেছেন, 'হার্মোনিয়মে জ্যোতিদাদাকে বসাইয়া আমাকে তিনি নূতন গান সব কটি একে একে গাহিতে বলিলেন।' এই ঘটনাটি বর্ণনায় রবীন্দ্রনাথ অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এই তিন কালকে একসূত্রে বেঁধে দিয়েছেন। 'জীবন স্মৃতি' গ্রন্থাকারে প্রকাশকালে রবীন্দ্রনাথ 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত 'জীবন স্মৃতি-'র যথেষ্ট পরিবর্তন, পরিবর্জন ও পরিবর্ধন করেছিলেন (পরে আলোচনা করা হয়েছে)। 'জীবন স্মৃতি' গ্রন্থের 'হিমালয় যাত্রা' অধ্যায়ে বর্ণিত 'বড়োদাদা মেজদাদার কাছ হইতে কোনো চিঠি' আসার প্রসঙ্গটি এরূপ একটি সংযোজন, অর্থাৎ পৌষ-সংখ্যায় প্রকাশিত 'হিমালয় যাত্রা' অধ্যায়ে এটি ছিল না। (এই অধ্যায়ের অন্যান্য সংযোজনের বিষয়ে যথা স্থানে উল্লেখ করা হবে]। 'প্রবাসী' পত্রিকায় 'জীবন স্মৃতি' যখন ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল, তখন রবীন্দ্রনাথ কলকাতা থেকে দূরে শান্তিনিকেতন ও শিলাইদহ অঞ্চলে ছিলেন (মাঝে মধ্যে অবশ্য কলকাতায় তিনি আসতেন),এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তার বহুপূর্ব থেকেই রাঁচি-বাসী। সুতরাং 'সত্য, সুন্দর, মঙ্গল' প্রবন্ধলেখক তাঁর রচনার দশম অনুচ্ছেদে 'শুনিয়াছি, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উৎসাহেই কবিবর রবীন্দ্রনাথ প্রথম সাহিত্য সেবায় উৎসাহিত হন', বলে যে-সংবাদ দিয়েছেন, সেই সংবাদের উৎস হোল জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ি। আবার, এর পরের বাক্যটিতেই তিনি লিখেছেন, 'ভারতী-সম্পাদিকা রচিত প্রথম উপন্যাস 'দীপনির্বাণ' জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উৎসাহেই রচিত বলিয়া শুনিয়াছি।' এই সংবাদের উৎস

নিঃসন্দেহে ঐ ঠাকুর-পরিবার। ঠাকুর-বাড়ির অন্দর মহলের সংবাদও যে তিনি খুব ভালো ভাবেই রাখেন, তার প্রমাণ পরবর্তী বাক্যটি, 'বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসাদি কিম্বা অন্য সদ্‌গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাহা গৃহের মহিলাগণের নিকট সাগ্রহে পাঠ করিয়া শুনাইয়া পরিবারে সাহিত্যানুরাগ সঞ্চারিত করিতেন।'

চিত্রাঙ্কন-বিদ্যায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'বিশেষ দক্ষতা'-র কথাও তিনি জানাতে ভোলেন নি এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-অঙ্কিত কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর ছবি ছাড়া বিহারিলালের 'অন্য চিত্র নাই', এ সংবাদও তিনি জানিয়েছেন রচনাটির একাদশ অনুচ্ছেদে। অতঃপর দ্বাদশ থেকে চতুর্দশ অনুচ্ছেদ তিনটিতে 'ভারতীয়' ও 'বৈদেশিক' সঙ্গীতে জোতিরিন্দ্রনাথের পারদর্শিতা', 'ভারতীয় সঙ্গীত সমাজ' প্রতিষ্ঠা, 'রবীন্দ্রনাথের গানগুলি'-তে জ্যোতিবিন্দ্রনাথ-কর্তৃক 'ইটালিয়ান ঝিঁঝিট' সুরারোপ, 'সাংকেতিক স্বরলিপি' প্রবর্তনে '৺ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী', 'রাজা শৌরিন্দ্র মোহন ঠাকুর', 'দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর' এঁদের অবদান-প্রসঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বিশেষত্ব 'সরল ও স্বরলিপি প্রথার সৃষ্টি' এবং 'শ্রীমতী প্রতিভা দেবী, শ্রীমতী সরলা দেবী ও শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী এবং পরে আরো অনেকেরই' সেই পদ্ধতির 'অনুসরণ' ইত্যাদি সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে, যার সম্পূর্ণ অংশই লেখক ঠাকুর-পরিবার থেকে সংগ্রহ করেছিলেন।

রচনাটির ষোড়শ অনুচ্ছেদে 'দেশের প্রায় প্রত্যেক সদনুষ্ঠানে' জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'অগ্রণী'-র ভূমিকা পালনের কথা বলতে গিয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কিভাবে 'স্বদেশী সভার প্রতিষ্ঠা করিয়া...আত্মীয় বন্ধু সমাজে স্বদেশানুরাগের বীজ অঙ্কুরিত করেন' সে কথার উল্লেখ করেছেন। তারপরেই তিনি লিখছেন, 'শুনিয়াছি, ভারতী-সম্পাদিকা রচিত 'স্নেহলতা' উপন্যাসে নব্য যুবকবৃন্দের পরিচালিত যে-সভার উল্লেখ আছে, সে-সভার চিত্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্বদেশী সভার আদর্শ অবলম্বনে রচিত।'

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-অনূদিত 'সত্য, সুন্দর, মঙ্গল' গ্রন্থটির সমালোচনার অবকাশে যেভাবে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বাল্যকাল থেকে মোটামুটিভাবে পরিণত বয়স পর্যন্ত ঘটনাবলীকে, খুব বিশদভাবে না হলেও, সূত্রাকারে বর্ণনা করেছেন, তাতে আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, দীর্ঘকাল ঠাকুর-বাড়ির সাহচর্যেই তিনি এই রচনার মাল-মশলা সংগ্রহ করেছিলেন এবং

তিনবার 'শুনিয়াছি' এই শব্দটির প্রয়োগ দ্বারা সে কথাই তিনি জানাতে চেয়েছেন। সুতরাং 'গুপ্ত সভা'টির আয়ুষ্কালে তার নাম 'সঞ্জীবনী সভা' বা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উদ্ভাবিত গুপ্ত ভাষায় সভার কার্য-বিবরণী লেখা এবং সভাটির 'হামচুপামূহাফ্‌' এই সাংকেতিক নাম প্রচলিত থাকলে (যা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উদ্ভাবনীশক্তির নিঃসংশয় প্রমাণ বহন করছে), এবং যা এতদিনে ('সত্য, সুন্দর, মঙ্গল' রচনাকালে) ঠাকুর-পরিবারে অজানা থাকার কথা নয় (কেননা স্বর্ণকুমারী দেবীর 'স্নেহলতা' উপন্যাস 'ভারতী' পত্রিকায় ১২৯৬-৯৮ সালে ধারাবাহিকভাবে এবং গ্রন্থাকারে ১২৯৬ ও ১২৯৯ সালে প্রকাশিত হওয়ায় উপন্যাসে অঙ্কিত চারু ও গুপ্ত সভা প্রসঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-রবীন্দ্রনাথ সম্পৃক্ত গুপ্ত সভাটির কথা ঠাকুর পরিবারে আলোচিত হয়েছে, এবং লেখকও সেখান থেকেই তথ্য সংগ্রহ ক'রে 'শুনিয়াছি, ভারতী সম্পাদিকা রচিত 'স্নেহলতা' উপন্যাসে নব্য যুবকবৃন্দের পরিচালিত যে সভার উল্লেখ আছে, সে সভার চিত্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্বদেশী সভার আদর্শ অবলম্বনে রচিত' বলে উল্লেখ করেছেন) সুতরাং সেসব কথা ঐ পরিবার থেকে 'শুনে' জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দান কালে, দুটি নামের অন্ততঃ একটি নামও উল্লেখ করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেন নি। তবে কি সব জেনে-শুনেও এ সকল কথা তিনি তাঁর রচনায় উহ্য রেখেছেন?

এই সূত্রে রচনাটির আর একটি বৈশিষ্ট্যের দিকেও পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে। রচনাটির ষোড়শ অনুচ্ছেদের যে-বাক্যে স্বর্ণকুমারী দেবী 'স্নেহলতা' উপন্যাসের অংশ বিশেষে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'স্বদেশী সভার আদর্শ' প্রতিফলিত হয়েছে বলে লেখক ইঙ্গিত করেছেন, তার ঠিক পূর্ববর্তী বাক্যটি হোল, 'স্বদেশী সভার প্রতিষ্ঠা করিয়া তিনি আত্মীয় বন্ধু সমাজে স্বদেশানুরাগের বীজ অঙ্কুরিত করেন।' পরপর দুটি বাক্যে ব্যবহৃত দুটি 'স্বদেশী সভা' যে এক-জাতীয় বা এক-আদর্শের নয়, এ বোধ লেখকের ছিল। যে 'স্বদেশী সভা' দ্বারা 'আত্মীয় বন্ধু সমাজে স্বদেশানুরাগের বীজ অঙ্কুরিত' করতে চেষ্টা করেছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, সেটি তাঁদের প্রতিষ্ঠিত 'গুপ্ত সভা' নয়, কেন না সেটি একটু 'গুপ্ত'ই ছিল, সেকালে অন্ততঃ সেটি ঠিক হাটের জিনিষ ছিল না— সভাটির দুজন 'সভ্য' রবীন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, তাঁদের স্মৃতি কথাদ্বয়ে সেইভাবেই আমাদের বিষয়টি বোঝাতে চেয়েছেন, (এখানে রবীন্দ্রনাথের

উক্তিটি পুনরায় স্মরণ করা যেতে পারে, 'আমরা মধ্যাহ্নে কোথায় কী করিতে যাইতেছি তাহা আমাদের আত্মীয়েরা জানিতেন না'।) সুতরাং রচনা-লেখক 'আত্মীয় বন্ধু সমাজে স্বদেশানুরাগের বীজ অঙ্কুরিত' করার জন্য গঠিত 'স্বদেশী সভা'র দ্বারা ঠাকুরপরিবারের 'বিদ্বজ্জন সমাগম' (১৮৭৪) বা 'সারস্বত সম্মিলন' (১৮৮২) জাতীয় সভাদির কথাই বোঝাতে চেয়েছেন। বস্তুতঃ পক্ষে দুটি 'স্বদেশ সভা'-র মধ্যে মৌল-পার্থক্য সম্পর্কে সচেতন ছিলেন বলেই লেখক পরবর্তী বাক্যে স্বর্ণকুমারী দেবীর 'স্নেহলতা' উপন্যাসের প্রসঙ্গ এনে দ্বিতীয় সভাটির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে পাঠককে সচেতন করতে চেষ্টা করেছেন।

সুতরাং যেখানে 'সত্য, সুন্দর, মঙ্গল' রচনার লেখক জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কর্মমুখর জীবন, তথা প্রতিভার পরিচয় দিতে বসেছেন, যার উপকরণ সঞ্চয়ের পিছনে তাঁর দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টা ও প্রস্তুতি ছিল বলে বোঝা যায়, সেখানে হাতের কাছে (অর্থাৎ ঠাকুর-পরিবারে প্রাপ্তব্য) সভাটির 'সঞ্জীবনী সভা' নাম, বিশেষ করে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উদ্ভাবনী-শক্তির নিদর্শন স্বরূপ গুপ্ত ভাষায় সভাটির কার্যাদির বিবরণ রচনা এবং সভাটির সাংকেতিক (এবং স্মরণীয়) নাম 'হামচুপামুহাফ্' পেলে তিনি তা অবশ্যই জানাতেন এবং তার দ্বারা দুটি 'স্বদেশী সভা'র পার্থক্য-জ্ঞাপনের কাজটি তাঁর পক্ষে অনেক বেশি সুবিধাজনকই হোত। কিন্তু লেখক তা করেন নি কেন? এ থেকে কি আমরা এরূপ বুঝবো যে সভাটির আয়ুষ্কালে তো নয়ই, পরন্তু লেখকের এই প্রবন্ধ রচনার সময় পর্যন্ত 'সঞ্জীবনী সভা', 'হামচুপামুহাফ্', এবং 'গুপ্তভাষা' সৃষ্টি-এসব তখনও পর্যন্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কল্পনাতেই থেকে গিয়েছিল, অন্ততঃ ঠাকুর পরিবারে এ সব কথা আদৌ জ্ঞাত বা প্রচলিত ছিল না।

'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত এই প্রবন্ধটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অবশ্যই পড়েছিলেন। এই প্রবন্ধটি প্রকাশের বৎসর দুই-আড়াইয়ের মধ্যে বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সামনে স্মৃতিচারণ করতে বসে সেই বয়সেও (জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বয়স তখন চৌষট্টি-পয়ষট্টি বৎসর) তাঁর উদ্ভাবনী-শক্তি যে কত সজীব ও সচল, তার নিদর্শন দিতে গিয়েই কি তিনি সভার নামকরণ, গুপ্তভাষার উদ্ভাবন ইত্যাদি প্রসঙ্গ এনেছিলেন? এই সূত্রে এখানে আরো একটি সামান্য বিষয়ের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন মনে করি। পূর্বেই বলা হয়েছে যে 'ভারতী' পত্রিকায় 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবার বৎসর পাঁচেক পরে, ১৩২৬ সালের ফাল্গুনে, তা গ্রন্থাকারে

প্রকাশিত হয়। বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় গ্রন্থের 'ভূমিকা' অংশে অন্যান্য প্রাসঙ্গিক কথার সঙ্গে একথাও জানিয়েছেন, 'শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া, 'জীবনস্মৃতি'র বহুল অংশকেই এই গ্রন্থ মধ্যে পরিবর্ধিত, পরিবর্জিত এবং পরিবর্তিত আকার দান করা হইয়াছে।' এই সংবাদের আলোকে ১৩২১ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'ভারতী'তে প্রকাশিত 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি'-র 'সঞ্জীবনী সভা'-সম্পৃক্ত গুপ্তভাষা উদ্ভাবনের বিষয়টির সঙ্গে গ্রন্থে-প্রকাশিত ওই অংশটি পাশাপাশি রেখে প্রায় পাঁচ বৎসরের ব্যবধানে এই বিশেষ অংশটি কি রূপ 'পরিবর্ধিত, পরিবর্জিত এবং পরিবর্তিত' হয়েছে, তা দেখা যেতে পারে। পত্রিকায় প্রকাশিত অংশটি এই, 'কার্যবিবরণী জ্যোতিবাবুর উদ্‌ভাবিত এক গুপ্তভাষায় লিখিত হইত। এই গুপ্ত ভাষায় 'সঞ্জীবনী সভা'-কে 'হাঞ্চুপামূহাফ' বলা হইত। ভাষাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা এই সাঙ্কেতিক ভাষার পাঠোদ্ধার করিতে যত্নবান্ হউন' (পৃ.৭৬২)। ১৩২৬ ফাল্গুনে প্রকাশিত 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে লিখিত হয়েছে, 'কার্যবিবরণী জ্যোতিবাবুর উদ্ভাবিত এক গুপ্ত ভাষায় * লিখিত হইত। এই গুপ্তভাষায় 'সঞ্জীবনী সভা'কে 'হাঞ্চুপামূহাফ' বলা হইত।' চিহ্নিত ফুট নোটটি হল এই, 'সঞ্জীবনী সভা কর্তৃক ব্যবহৃত সাঙ্কেতিকভাষার উদ্ধার কৌশল নিম্নে লিখিত হইল :—আকার স্থানে অকার, অকার স্থানে আকার, ই স্থানে উ, ঈ স্থানে ঊ, ঊ স্থানে ই, উ স্থানে ঈ, এ স্থানে ঐ, ঐ স্থানে এ, ও স্থানে ঔ, ঔ স্থানে ও। ক খ গ ঘ স্থানে যথাক্রমে গ ঘ ক খ, চ ছ জ ঝ স্থানে যথাক্রমে জ ঝ চ ছ, ট ঠ ড ঢ স্থানে যথাক্রমে ড ঢ ট ঠ, ত থ দ ধ স্থানে যথাক্রমে দ ট ত থ, প ফ ব ভ স্থানে যথাক্রমে ব ভ প ফ, শ ষ স স্থানে হ, হ স্থানে স, ব স্থানে ল, ল স্থানে র, ম স্থানে ন, ন স্থানে ম। যথা :

স ন্ জী ব নী স ভা,

হা ম্ চু পা মূ হা ফ্। (পৃঃ ১৬৭)'। পত্রিকায় প্রকাশিত অংশে দেখা যাচ্ছে যে 'সঞ্জীবনীসভা'য় ব্যবহৃত সাংকেতিক ভাষার নমুনা তখনও পর্যন্ত দেওয়া হয় নি, যদিচ 'ভাষাতত্ত্ববিদ পণ্ডিত'দের প্রতি সপরিহাস টিপ্পনী কাটা হয়েছে। অংশটি কোটেশন-চিহ্ন বিহীন, অর্থাৎ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'মুখের কথা অবিকল' নয়, বসন্তকুমারের রচনা, অবশ্য বসন্তকুমারের জবানীতে তা জ্যোতিরিন্দ্রনাথেরই বক্তব্য বটে। এই ভাষার নমুনা, যা বৎসর পাঁচেক পরে গ্রন্থে দেওয়া হয়েছে, তা কি তখন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বসন্তকুমারকে দেন নি, না বসন্তকুমার লিখতে ভুলে

গিয়েছিলেন, নাকি নমুনাটি তখনও পর্যন্ত প্রস্তুত করা হয়ে ওঠে নি—এই সব প্রাসঙ্গিক প্রশ্নের মীমাংসার এখন আর উপায় নেই।) তবে কি আমাদের এরূপ ধারণা করতে হবে যে রচনাটির পরিবর্ধন, পরিবর্জন ও পরিবর্তন সূত্রে পাঁচ বৎসর সময় কালের মধ্যে উদ্ভাবন-শক্তির নিদর্শনরূপে গুপ্ত-ভাষা সৃষ্টি করে গ্রন্থে এক অভিনব 'সংযোজন' করে দিয়েছেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ!

অতঃপর আমরা সংশয়োৎপত্তির মূল উৎস রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি' নিয়ে আমাদের বক্তব্য শুরু করছি। এখন পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ-কৃত 'জীবনস্মৃতি'-র তিনটি পাণ্ডুলিপির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে, এবং তৃতীয় বা শেষ পাণ্ডুলিপি, যেটি 'প্রবাসী' পত্রিকার সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে প্রেরিত হয়েছিল, তাই থেকে 'প্রবাসী'তে ধারাবাহিকভাবে ১৩১৮ সালের ভাদ্র সংখ্যা থেকে ১৩১৯ সালের শ্রাবণ পর্যন্ত বারটি কিস্তিতে সমগ্র 'জীবনস্মৃতি' মুদ্রিত হয়। রচনাটি যে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত যত্নসহকারে লিখেছিলেন তার প্রমাণ 'জীবনস্মৃতি' লিখতে লিখতেই ১৯১১ সালের ৮ই নভেম্বর তারিখে মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা তাঁর এক পত্রে পাওয়া যায়, 'আমি ওটা খুব যত্ন করে লিখছি'। প্রায় এই সময়েই রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-কে লেখা কয়েকটি পত্রে দেখা যায় যে 'জীবনস্মৃতি' রচনাটি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ কি পরিমাণ সতর্ক ও সচেতন। এরূপ কয়েকটি পত্রাংশ-মাত্র এখানে সঙ্কলন করে দেওয়া হল:

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লেখা—'আমি ঐ লেখাটার ফাঁক ভরাইয়া আবার একটু সংশোধন করিয়া লইতেছি' (৯ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৮), 'জীবনস্মৃতির' অনেকটা পরিবর্ধিত ও পরিবর্তিত হইতেছে—সমস্ত আবার নূতন করিয়া লিখিতে হইতেছে' (১৩ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৮), 'বাল জ্ঞানের হাত দিয়া আমার 'জীবনস্মৃতি'-র কাপি আপনার কাছে পাঠাইয়াছি বোধহয় পাইয়াছেন।...যে পর্যন্ত পাঠাইয়াছি ইহার পরেও আরো খানিকটা লেখা আছে। তাহাতে ক্রমশঃ অধিক করিয়া আমার রচনার কথা আসিয়া পড়িয়াছে। আর একবার সংশোধন করিয়া লিখিয়া তাহার পর বিবেচনা করা যাইবে সে অংশটা বাহির করা চলিবে কি না।' (শিলাইদহ, ১৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৮)।

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা—'জীবনস্মৃতি তোমাদের হাতে পূর্বেই সমর্পণ করেছি। ভূমিকাটি আগাগোড়া বদলে দিয়েছে বোধহয় দেখেছ। জিনিষটাকে সাধারণের সুখপাঠ্য করবার চেষ্টা করেছি' (জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৮। পত্রটি সম্ভবতঃ ১৮ই জ্যৈষ্ঠ তারিখের পরে লেখা—রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে ঐ তারিখের লেখা পত্রটি

পড়লে এরূপ মনে হয়।) ; 'জীবনস্মৃতিটা নিয়ে পড়েছি—ওটাও সাফসোফ করে দিচ্ছি—খুব মনোযোগ করে দেখলুম, এ রচনাটা সাহিত্যে চলবার মতো হয়েছে, নইলে কিছুতেই আমি দিতুম না।' ('পোষ্টমার্ক'—শিলাইদহ, ১৪ই জুলাই, ১৯১১)।

এই পত্রগুলি থেকে বোঝা যায়, 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশের অব্যবহিত পূর্বপর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ রচনাটি সম্পর্কে শুধুমাত্র সচেতনই ছিলেন না, তাকে সময় ও সুযোগমতো 'সাফসোফ' করে দিতেও কার্পণ্য করেন নি। 'প্রবাসী'-তে 'জীবন-স্মৃতির' শেষ কিস্তি প্রকাশিত হয় ১৩১৯ সালের শ্রাবণ সংখ্যায় 'Bengal Library Catalogue' অনুযায়ী এই সংখ্যাটির প্রকাশ তারিখ হোল ১৬ই জুলাই, ১৯১২।[৫৪] জীবনস্মৃতি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় 'Bengal Library Catalogue' অনুযায়ী ১৯১২ খ্রীস্টাব্দের ২৫ জুলাই।[৫৫] সুতরাং দেখা যাচ্ছে পত্রিকায় শেষ কিস্তি প্রকাশের ৮ দিন পরে 'জীবন স্মৃতি গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে। 'জীবনস্মৃতি' মুদ্রণের জন্য কবি কবে প্রেসে দিয়েছিলেন জানি না, তবে ঐ একই প্রেসে তাঁর 'ছিন্ন-পত্র' ও 'অচলায়তন' নামক গ্রন্থ দুটি একই সঙ্গে মুদ্রিত হচ্ছিল দেখা যায়।[৫৬] 'জীবন-স্মৃতি' প্রেসে ছাপাতে ও বাঁধাই হয়ে বাজারে বেরুতে যদি ন্যূনপক্ষে একমাস মাত্রও সময় লেগে থাকে বলে ধরি, তাহলে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত 'জীবনস্মৃতি' এবং পত্রিকায় প্রকাশিত 'জীবনস্মৃতি-'র মধ্যে কবিকৃত সংযোজন, সংশোধন ও পরিবর্জন কিরূপ হয়েছে, তা পাশাপাশি মিলিয়ে দেখতে বুঝতে পারবো 'জীবনস্মৃতি' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত কি পরিমাণ সজাগ ও সতর্ক ছিলেন। সমগ্র 'জীবনস্মৃতি-'কে অবশ্য এই ভাবে মিলিয়ে না দেখে আমাদের প্রয়োজন মেটাবার পক্ষে রবীন্দ্রনাথ বর্ণিত 'স্বাদেশিকের সভা' অংশটি পর্যন্ত দেখলেই চলবে।

সেক্ষেত্রে দেখা যায় প্রথম সংখ্যা-[ভাদ্র, ১৩১৮]-তে প্রকাশিত শীর্ষ-নাম-হীন অধ্যায় [? ভূমিকা], 'শিক্ষারম্ভ', 'ঘর বাহির', এই তিনটি অধ্যায়ের মধ্যে 'ঘর ও বাহির' অধ্যায়ের শেষ তিনটি অনুচ্ছেদ [১৮ থেকে ২০, 'ছেলে-বেলার দিকে যখন তাকানো যায়......কেবল এটা জানেন আর কেহ নয়'] পত্রিকা-বহির্ভূত, অর্থাৎ গ্রন্থ মুদ্রণ কালে কবি কর্তৃক সংযোজিত। দ্বিতীয় সংখ্যায় [১৩১৮ আশ্বিন] প্রকাশিত চারটি অধ্যায় ['ভৃত্যরাজকতন্ত্র,' 'নর্মাল স্কুল,' 'কবিতা রচনারম্ভ,' 'নানা বিদ্যার আয়োজন']-এর 'ভৃত্য রাজক তন্ত্র' অধ্যায়ের পঞ্চম অনুচ্ছেদে 'ঈশ্বর' ভৃত্য প্রসঙ্গে তৃতীয় ছত্রের 'পৃথিবীতে তাহার' থেকে একুশ ছত্রের 'তাহার গাম্ভীর্য ছিল' পর্যন্ত অংশটি রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থ মুদ্রণ

-কালে সংযোজন করেছেন। তৃতীয় সংখ্যায় [কার্তিক, ১৩১৮] 'বাহিরে যাত্রা,' 'কাব্যরচনা চর্চা', 'শ্রীকণ্ঠবাবু' অধ্যায় তিনটি গ্রন্থে অবিকল গৃহীত হয়েছে। চতুর্থ সংখ্যায় [অগ্রহায়ণ, ১৩১৮] প্রকাশিত 'বাংলা শিক্ষার অবসান' ও 'পিতৃদেব' অধ্যায় দুটির মধ্যে 'বাংলা শিক্ষার অবসান' অধ্যায়ের দশম অনুচ্ছেদের তৃতীয়-চতুর্থ ছত্রের কিছু ভাষা গত সংশোধন করা হয়েছে, যেমন পত্রিকায় প্রকাশিত 'শিক্ষকগণ তাহাদের ব্যবহারে যখন অত্যন্ত' এই শব্দগুলির পরিবর্তে গ্রন্থে 'যদি আমাদের কেহ তাহাদের ব্যবহারে' এই শব্দগুলি বসান হয়েছে; এবং এই অনুচ্ছেদশেষে পত্রিকায় প্রকাশিত দুটি ছত্র ['তাই শিক্ষক মহাশয়ের সঙ্গে শাস্তি সম্বন্ধেও আমার মতের মিল হয় না এবং আশঙ্কাতেও আমাকে একেবারে অভিভূত করিয়া দেয় না'] গ্রন্থে বর্জিত হয়েছে। আবার একাদশ অনুচ্ছেদের শেষে পত্রিকায় প্রকাশিত 'কিন্তু শাস্তির ভার বড়দেরই হাতে এবং শাস্তি দিবার প্রবৃত্তিই একটা ভয়ানক জিনিষ' বাক্যটিও গ্রন্থে স্থান পায় নি। পঞ্চম সংখ্যায় [পৌষ, ১৩১৮] প্রকাশিত একটি মাত্র অধ্যায় 'হিমালয় যাত্রা'-র ২৩ সংখ্যক সম্পূর্ণ অনুচ্ছেদটি ['একবার পিতা গুরুদববারের ·· ফেলিতে পারিত না'] পত্রিকা-বহির্ভূত; আবার ৪৮ থেকে ৫০ পর্যন্ত তিনটি অনুচ্ছেদ এবং ৫২ ও ৫৩ সংখ্যক অনুচ্ছেদ-দুটিও পত্রিকা-বহির্ভূত, অর্থাৎ গ্রন্থ মুদ্রণ কালে কবি এই ছয়টি অনুচ্ছেদ যোজনা করে দিয়েছেন। ৫৪-সংখ্যক অনুচ্ছেদের প্রথম শব্দ 'তিনিও' গ্রন্থে হয়েছে 'তিনি'। ষষ্ঠ সংখ্যা [মাঘ, ১৩১৮]-য় প্রকাশিত পাঁচটি অধ্যায় ['প্রত্যাবর্তন,' 'ঘরের পড়া,' 'বাড়ির আবহাওয়া,' 'অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী,' 'গীতাচর্চা']-এর মধ্যে 'প্রত্যাবর্তন' অধ্যারের শেষ অনুচ্ছেদ দুটি [১৬ ও ১৭ সংখ্যক-'সেণ্ট জেবিয়ার্সের একটি পবিত্র স্মৃতি' থেকে 'তাহাই নীরদ' পর্যন্ত] পত্রিকা-বহির্ভূত, অর্থাৎ গ্রন্থ মুদ্রণ কালে সংযোজিত। 'ঘরের পড়া' অধ্যায়ের দ্বিতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায় চারটিও গ্রন্থ-মুদ্রণ কালে কবি কর্তৃক সংযোজিত। 'বাড়ির আবহাওয়া' অধ্যায়ের চতুর্থ অনুচ্ছেদটি পত্রিকা-বহির্ভূত, গ্রন্থ-মুদ্রণ কালে সংযোজিত। 'গীতাচর্চা' অধ্যায়ের শেষে পত্রিকায় প্রকাশিত পঞ্চম, ষষ্ঠ সপ্তম অনুচ্ছেদ তিনটি গ্রন্থ-মুদ্রণ কালে কবি বর্জন করেছেন অর্থাৎ গ্রন্থে ঐ তিনটি অনুচ্ছেদ স্থান পায় নি। সপ্তম সংখ্যায় [ফাল্গুন, ১৩১৮] প্রকাশিত চারটি অধ্যায় ['সাহিত্যের সঙ্গী,' 'রচনাপ্রকাশ,' 'ভানুসিংহের কবিতা' ও 'স্বাদেশিকতা']-এর মধ্যে 'ভানুসিংহের কবিতা' অধ্যায়ের প্রথম

অনুচ্ছেদটি ['পূর্বেই লিখিয়াছি…পাইয়া বসিয়াছিল'] পত্রিকা-বহির্ভূত, গ্রন্থ-মুদ্রণ কালে সংযোজিত ; দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের প্রথম তিনটি বাক্য 'ইতিপূর্বে অক্ষয়বাবুর কাছে…সরগরম করিয়া তুলিয়াছিল,' কবি কর্তৃক নূতন ভাবে লিখিত [পত্রিকায় প্রকাশিত অংশটি ছিল 'অল্প বয়সে কবিতা লিখিতে আরম্ভ করিলে তাহার গৌরব কবিও ভুলিতে পারে না এবং তাহার চারি দিকের লোকও ভুলিতে দেয় না। এইরূপ অবস্থায় অক্ষয়বাবুর মুখে বালক কবি চ্যাটার্টনের বিবরণ শুনিলাম'।], তৃতীয় অনুচ্ছেদের প্রথম দুটি বাক্য ['একদিন মধ্যাহ্নে…কুসুমকুঞ্জ মাঝে']ও কবি একটু সংশোধন করে দিয়েছেন [পত্রিকায় প্রকাশিত অংশটি ছিল এইরূপ, 'একদিন মেঘলা দিনের মধ্যাহ্নে বাড়ির ভিতরের এক ঘরে খাটের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া একটা শ্লেট লইয়া লিখিলাম, 'গহন কুসুম কুঞ্জ মাঝে'] 'স্বাদেশিকতা' অধ্যায়টির প্রথম তিনটি অনুচ্ছেদ পত্রিকা থেকে হুবহু গৃহীত হয়েছে, অর্থাৎ কোনরূপ পরিবর্তন করা হয় নি। কিন্তু চতুর্থ অনুচ্ছেদের তৃতীয় ছত্র বা দ্বিতীয় সংক্ষিপ্ত-বাক্যটি ['ইহা স্বাদেশিকের সভা']-র পরবর্তী ছয়টি বাক্য ['কলিকাতার এক গলির মধ্যে' থেকে 'প্রয়োজন ছিল না' পর্যন্ত] পত্রিকা বহির্ভূত, অর্থাৎ গ্রন্থ-মুদ্রণ কালে কবি কর্তৃক সংযোজিত। [অধ্যায়টির পরবর্তী আটটি অনুচ্ছেদ 'ভারতবর্ষের একটা সর্বজনীন' থেকে 'তাহাতে সন্দেহ নাই' পর্যন্ত কোনরূপ সংশোধন ব্যতীতই গৃহীত] দেখা যাচ্ছে, পত্রিকায় মুদ্রিত 'ইহা স্বাদেশিকের সভা' পর্যন্ত দেখে কবি থমকে দাঁড়িয়েছেন, এবং আবার একবার পিছনে ফেলে আসা দিনগুলোতে ফিরে গিয়েছেন, তাঁরই ভাষায় আবার একবার 'ছবির ঘরে খবর' নিতে গিয়েছেন। এবং তার ফলে সেই 'চিত্রশালা' থেকে গুপ্ত সভাগৃহ, তার পরিবেশ ও আবহাওয়া নিয়ে একটা সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে এনেছেন, যা বাংলা-সাহিত্যে বাঙ্গালীদের দ্বারা সৃষ্ট গুপ্ত সভার চিত্র হিসাবে নিঃসন্দেহে একটা মর্যাদাপূর্ণ স্থানের অধিকার দাবী করতে পারে।

'প্রবাসী' পত্রিকার ১৩১৮ সালের ফাল্গুন সংখ্যা [এই সংখ্যায় 'স্বাদেশিকতা' অধ্যায়ে 'স্বাদেশিকের সভা' তথা গুপ্ত সভাটির প্রসঙ্গ আছে] ১লা ফাল্গুন প্রকাশিত হয়। সুতরাং ১৩১৮ সালের ১লা ফাল্গুন বা ইংরেজি ১৯১২ খৃষ্টাব্দের ১৩ই ফেব্রুয়ারী থেকে, 'জীবনস্মৃতি' মুদ্রণার্থে প্রেসে অর্পণের মধ্যে যদি মাস চারেক সময় ধরি [আমরা ইতিপূর্বে গ্রন্থমুদ্রণ ও বাঁধাই

ইত্যাদি বাবদ ন্যূনপক্ষে এক মাস কাল সময় ধরেছি, সেই এক মাস কাল সময় বাদ দিয়ে], তাহলে এই সময় কালের মধ্যে 'জীবনস্মৃতি' সম্পর্কে অত্যন্ত সতর্ক ও সচেতন কবি [আমরা পূর্বে এটি বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছি], যিনি আর একবার বিশেষ কারণে 'ছবির ঘরে খবর' নিতে গিয়েছিলেন বলে আমরা একটু আগেই দেখলাম, সেই রবীন্দ্রনাথের 'স্বাদেশিকের সভা'-টির নাম যে 'সঞ্জীবনী সভা', তা মনে পড়লো না। মনে পড়লো না তাঁর প্রিয় জ্যোতিদাদার অদ্ভুত উদ্ভাবনী শক্তিতে উদ্ভাবিত সাংকেতিক ভাষায় গুপ্ত সভার কার্য বিবরণী লেখার কথা। মনে পড়লো না 'স্বাদেশিকের সভা'টির এমন একটা মজার নাম 'হাম্‌চুপামুহাফ্‌' শব্দটির কথা। পক্ষান্তরে তাঁর কিন্তু মনে পড়ে গেলো 'কলিকাতার গলির মধ্যে এক পোড়োবাড়ি'র কথা, যে-বাড়ির 'দ্বাররুদ্ধ', 'ঘর…অন্ধকার', যেখানে কথা· চুপি চুপি', এবং 'দীক্ষা · ঋক্‌ মন্ত্রে' হোত। এবং সব মিলিয়ে সেখানে যে কেমনভাবে 'সকলের রোমহর্ষণ হইত', এতদূর পর্যন্ত তাঁর মনে পড়ে গেল। এসব কি কম আশ্চর্যের কথা॥

'জীবন স্মৃতি' রচনার এক যুগ আগে, ১৩০৬ সালের মাস সংখ্যা 'প্রদীপ' পত্রিকায় প্রকাশিত 'কাদম্বরী চিত্র' প্রবন্ধে মহাকবি বাণভট্টের 'কাদম্বরী' রচনাটিকে একটি 'চিত্রশালা' বলে উল্লেখ করে বাণভট্টের চিত্রাঙ্কণ প্রতিভার প্রশস্তি জ্ঞাপনার্থে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন 'রং ফলাইতে কবির কী আনন্দ! 'জীবনস্মৃতি' রচনাটি পাঠ করলে আমরা দেখতে পাই রবীন্দ্রনাথ সেখানে রংয়ের বন্যার চেয়ে রসের জোয়ার ছুটিয়েছেন অনেক বেশি। সামান্য সামান্য ক্ষুদ্র বিষয়কে নিয়ে কি অসামান্য আশ্চর্য কৌতুকের ইন্দ্রজালই না রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টি করেছেন। একইসঙ্গে কবির সহানুভূতি ও পরিহাস বোধকে আকর্ষণ করে কত আপাততুচ্ছ জিনিষই না শাশ্বত সৌন্দর্যের দ্যুতিতে ঝলমলিয়ে উঠেছে। এমনকি গুপ্ত সভাটির সভ্যদের নিয়েও কত যে মধুর পরিহাস তিনি করেছেন, যে-পরিহাস থেকে কবি নিজেকেও রেহাই দেন নি। এরূপ একটি উদাহরণ হোল—এই সভাতে সভ্যরা যে 'বীরত্বের প্রহসন মাত্র অভিনয়' করতেন, সে বীরত্বের ভাব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'আমরা সভা করিয়া, কল্পনা করিয়া, বাক্যালাপ করিয়া, গান গাহিয়া, সেই ধাক্কাটা সামলাইবার চেষ্টা করিয়াছি', বাক্যটির শেষাংশে এই 'ধাক্কাটি সামলাইবার চেষ্টা করিয়াছি', পড়তে পড়তে দুর্দমনীয় হাস্যের ধাক্কা আমাদেরও সামলানোর

চেষ্টা করতে হয়। একই বিষয়ের বর্ণনায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বাচনভঙ্গীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের রচনার পার্থক্য দেখলে শিল্পীর মুন্সিয়ানাতে আমরা বিস্মিত পুলকিত না হয়ে পারি না। জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে খাটো করবার জন্যে নয়, বিশেষ প্রয়োজনে এইরূপ কিছু অংশ আমরা এখানে সঙ্কলন করছি। জমিদারের বাগানবাড়িতে 'প্রীতিভোজ'-এর পর গঙ্গার ধারে অপরাহ্নে ঝড়ের মধ্যে বৃদ্ধ রাজনারায়ণের অঙ্গভঙ্গী সহকারে গলাছেড়ে গানের বর্ণনা করছেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, 'রাজনারায়ণবাবু সেই সময় গঙ্গার ঘাটে দাঁড়াইয়া, চিৎকার করিয়া 'আজি উন্মদ পবনে—' বলিয়া রবীন্দ্রনাথের নব রচিত একটি গান আরম্ভ করিয়াদিলেন। ক্রমে ক্রমে সকল সভ্যই তাঁহার সঙ্গে বিচিত্র অঙ্গভঙ্গী সহকারে, দারুণ উৎসাহ ভরে সেই গানে যোগ দিলেন। জলঝড়ের মাতামাতির চেয়ে আমাদের মাতামাতিই তখন বেশী ছিল', (পৃঃ ১১০); বিষয়টি রবীন্দ্রনাথের বর্ণনায় এইভাবে পাই, 'অপরাহ্নে বিষম ঝড়। সেই ঝড়ে আমরা গঙ্গার ঘাটে দাঁড়াইয়া চীৎকার শব্দে গান জুড়িয়া দিলাম। রাজনারায়ণবাবুর কণ্ঠে সাতটা সুর যে বেশ বিশুদ্ধ ভাবে খেলিত তাহা নহে, কিন্তু তিনিও গলা ছাড়িয়া দিলেন, এবং সূত্রের চেয়ে ভাষ্য যেমন অনেক বেশি হয়, তেমনি তাঁহার উৎসাহের তুমুল হাত নাড়া তাঁহার ক্ষীণ কণ্ঠকে বহু দূরে ছাড়াইয়া গেল; তালের ঝোঁকে মাথা নাড়িতে লাগিলেন এবং তাঁহার পাকা দাড়ির মধ্যে ঝড়ের হাওয়া মাতামাতি করিতে লাগিল' (পৃঃ ৫২)। বহু খরচ করে সভার প্রচেষ্টায় কয়েক বাক্স স্বদেশী-'দেশালাই' প্রস্তুত হলে তার গুণাগুণ তথা উপযোগিতা সম্বন্ধে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মন্তব্য হোল, 'কিন্তু এ পদার্থ সাধারণের পক্ষে ক্রয় সাধ্য বা ব্যবহারের মোটেই উপযোগী হইল না। একেত খরচ খুব বেশী পড়িত, তাহা ব্যতীত দেশে কাঠির অভাব, সেজন্য যে-সে কাঠের কাঠি ব্যবহৃত হওয়াতে দিয়াশলাই শীঘ্র জলিত না। এইজন্য লোকে এই দিয়াশলাই পছন্দ করিত না' (পৃঃ ১৬৯)। বিষয়টি রবীন্দ্রনাথের হাতে রূপ পেয়েছে এই ভাবে, 'দেশালাই তৈরি করিতে হইবে, তাহার কাঠি পাওয়া শক্ত। সকলেই জানেন আমাদের দেশে উপযুক্ত হাতে খেংরাকাঠির মধ্য দিয়া সস্তায় প্রচুর পরিমাণে তেজ প্রকাশ পায়, কিন্তু সে তেজে যাহা জলে তাহা দেশালাই নহে। অনেক পরীক্ষার পর বাক্স কয়েক দেশালাই তৈরি হইল। ভারত সন্তানদের উৎসাহের নিদর্শন বলিয়াই যে তাহারা

মূল্যবান তাহা নহে—আমাদের এক বাক্সে যে খরচ পড়িতে লাগিল তাহাতে একটা পল্লীর সম্বৎসরের চুলো ধরানো চলিত। আরো একটু সামান্য অসুবিধা এই হইয়াছিল যে, নিকটে অগ্নিশিখা না থাকিলে তাহাদিগকে জ্বালাইয়া তোলা সহজ ছিল না। দেশের প্রতি জ্বলন্ত অনুরাগ যদি তাহাদের জ্বলনশীলতা বাড়াইতে পারিত, তবে আজ পর্যন্ত তাহারা বাজারে চলিত' (পৃঃ ১৫২-১৫৩)। পুনরপি, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 'অসাধারণ উদ্ভাবনী শক্তি' দ্বারা যে 'সর্বজনীন পরিচ্ছদ' প্রস্তুত করালেন, সেটি সম্বন্ধে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বলছেন, 'কিন্তু এ অভিনব পোষাক পরিয়া প্রথমে পথে বাহির হইবে কে? আমিই প্রথম বাহির হইব। একদিন মধ্যাহ্নের প্রখর আলোকে সার্বজনিক ঐক্য সাধক এই পোষাক পরিয়া, আমি কলিকাতা সহর ঘুরিয়া আসিলাম। লোকে এ পোষাকের অন্তর্গূঢ় হিতকর উদ্দেশ্য বুঝিল না কেবল পরিহাস বিদ্রূপই করিল, কিন্তু আমি সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করিলাম না' (পৃঃ ১৬৮-১৬৯)। বিষয়টি রবীন্দ্রনাথের লেখনীতে এইভাবে রূপ পেয়েছে, 'এইরূপ সর্বজনীন পোষাকের নমুনা সর্বজনে গ্রহণ করিবার পূর্বেই একলা নিজে গ্রহণ করিতে পারা যে-সে লোকের সাধ্য নহে। জ্যোতিদাদা অম্লান বদনে এই কাপড় পরিয়া মধ্যাহ্নের প্রখর আলোকে গাড়িতে গিয়া উঠিতেন—আত্মীয় এবং বান্ধব, দ্বারী এবং সারথি সকলেই অবাক হইয়া তাকাইত, তিনি ভ্রূক্ষেপ-মাত্র করিতেন না। দেশের জন্য অকাতরে প্রাণ দিতে পারে এমন বীর-পুরুষ অনেক থাকিতে পারে কিন্তু দেশের মঙ্গলের জন্য সর্বজনীন পোষাক পরিয়া গাড়ি করিয়া কলিকাতার রাস্তা দিয়া যাইতে পারে এমন লোক নিশ্চয়ই বিরল' (পৃঃ ১৫০)। বলা বাহুল্য এই প্রকার তুলনা দ্বারা জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে হেয় প্রতিপন্ন করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, আমাদের উদ্দেশ্য হল কত ক্ষুদ্র-তুচ্ছ বিষয়কে অবলম্বন করে রবীন্দ্রনাথের অসামান্য রচনাশক্তি কিভাবে আত্ম-প্রকাশ করেছে, তার কিছু পরিচয় নেওয়া। পরিশেষে, সমাপ্তি পর্বে, সভাটির বিলুপ্ত হবার কারণ-রূপে 'দুটি একটি সুবুদ্ধি লোক' কর্তৃক 'জ্ঞানবৃক্ষের ফল' খাইয়ে 'স্বর্গ লোক'টি ভেঙে যাওয়ার যে সংবাদ তিনি পরিবেশন করেছেন, সেই পরিবেশনের ভঙ্গির মধ্যে অনাস্বাদিত কৌতুকের সঙ্গে যে আশ্চর্য করুণ মনোবেদনার সুর 'অবশেষে' শব্দটির সঙ্গে জড়িয়ে গেছে, তার বোধকরি তুলনা হয় না।

এমন সংবেদনশীল জ্ঞেন-চক্ষু শিল্পী, অতি ক্ষুদ্র-তুচ্ছ বস্তুও যাঁর চোখ

এড়িয়ে যেতে পারে নি দেখা যায়, এবং যাঁর স্মৃতি-শক্তি আশি বৎসর বয়স-কালেও সমান উজ্জ্বল ছিল, তিনি তাঁর দুটি রচনায় ('জীবনস্মৃতি' ও 'আত্মপরিচয়'] মধ্যে সভাটির নাম একবারও করলেন না, এমন কি 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি'তে 'সঞ্জীবনী সভা' তথা 'হাম্‌চুপামুহাফ্‌' পাওয়া সত্ত্বেও ['আত্মপরিচয়' গ্রন্থোক্ত 'ঋক্‌ বেদের পুঁথি মড়ার মাথার খুলি'-র কথা 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি' এবং 'খোলা তলোয়ার' বারীন্দ্র-কুমার ঘোষের 'বিজলী'-তে প্রকাশিত 'বোমার যুগের কাহিনী' পাঠান্তে[৫৭], অথবা পুরাতন স্মৃতি-রোমন্থনের সূত্রে তাঁর লেখনির মুখে প্রকাশ পেয়েছে এরূপ যদি আমরা ধরেও নি, তাহলেও], 'জীবন স্মৃতি'-র পরবর্তী কোন সংস্করণে[৫৮] তার উল্লেখমাত্রও কবি করলেন না কেন, তা আমাদের কাছে একটা দুর্বোধ্য রহস্যবৎ হয়ে আছে। বিশেষ করে সভাটির এমন একটি মজাদার নামকে নিয়ে পরিহাস জমিয়ে তোলার প্রচুর অবকাশ সত্ত্বেও (সামান্য দেশালাই কাঠিকে নিয়ে তাঁর অপূর্ব পরিহাসের[৫৯] কথা স্মরণ করেই একথা বলা হচ্ছে) কবি সে-পথই বা মাড়ালেন না কেন ? বস্তুতঃ এই প্রশ্নের উত্তরের মধ্যেই 'সঞ্জীবনী সভা' এই নামকরণ কবে হয়েছিল, বা সভাটির আয়ুষ্কালে আদৌ হয়েছিল কি না, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-উদ্ভাবিত গুপ্ত ভাষায় সভার কার্য-বিবরণী প্রকৃতই লেখা হোত কি না, বা সভাটির সাংকেতিক নাম 'হাম্‌চুপামুহাফ্‌' ঐ সময়ে সভ্যদের মধ্যে সত্য সতাই চালু ছিল কি না, ইত্যাকার সংশয় তথা প্রশ্নেরও উত্তর পাওয়া যেত। কিন্তু এখন আর সে-সব উত্তর পাওয়া যাবে কি ?

বিপিনচন্দ্র পাল সজীব অস্তিত্ব নিয়ে যে সময়ে শহর কলকাতায় স্বয়ং বিরাজিত, এবং যিনি পরিণত বয়সে ঐতিহাসিক বিশ্বস্ততা নিয়ে স্বকালের ছাত্রদের মানসিক প্রবণতার আলেখ্য অঙ্কন প্রসঙ্গে গুপ্ত-সমিতি সৃষ্টির বিষয় উল্লেখ করেছেন, যে প্রবণতা গড়ে উঠেছিল মূলতঃ সুরেন্দ্রনাথের ম্যাট্‌সিনি গ্যারিবল্ডী, ইয়ং ইতালী, শিখযুদ্ধ প্রভৃতি বিষয়ে ছাত্রদের সামনে দিনের পর দিন উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতায়, বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শনে'র পাতায় পাতায় পরাধীন দেশের দুর্দশার চিত্র উন্মোচনে, যোগেন্দ্রনাথের 'আর্যদর্শন'' পত্রিকায় ম্যাট্‌সিনি ও নব্য ইতালী,' 'সুপ্রসিদ্ধ প্রথম ফরাসী বিদ্রোহ,' 'সিপাহী বিদ্রোহ,' 'ভারতের একতা' প্রভৃতি দেশপ্রেম-উদ্বোধক নানা প্রবন্ধের প্রকাশে[৬০] 'সোমপ্রকাশ,' 'সহচর', 'সাধারণী,' 'অমৃতবাজার পত্রিকা' প্রভৃতি পত্রিকায়

ইংরেজদের অত্যাচারসহ নানা কঠোর সমালোচনায়, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র ও অন্যান্য অসংখ্য কবির স্বদেশানুরাগ-মূলক কবিতা ও 'জাতীয় সঙ্গীত' প্রভৃতির প্রচলনে, সাধারণ রঙ্গমঞ্চে ইংরেজ শাসন ও শোষণের নগ্ন দিক উদ্‌ঘাটক নানা নাটকের ক্রমান্বয় উপস্থাপনায়, চতুষ্পার্শ্বস্থ সামাজিক জীবনে ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত নানা অরুচিকর ঘটনা, কুৎসিত ক্রিয়াকলাপ ও ততোধিক আপত্তিকর নানা চিত্রদর্শনে [৬১] এবং সঙ্গে-সঙ্গে দেশে দীর্ঘকালব্যাপী ইংরেজদের নিষ্ঠুর অত্যাচার, শোষণ ও অপমানের বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত বেদনা, হতাশা, আত্মগ্লানি ও ক্রোধ থেকে, ঠিক সেই জাতীয় মানসিক প্রবণতা ঠাকুরবাড়ির সন্তানদের বা ঐ পরিবারের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কারুর ছিল না। 'আর্য দর্শন 'পত্রিকার গ্রাহক জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রমুখ সঞ্জীবনী সভার সভ্যরা সম্ভবত: ঐ পত্রিকা থেকে ম্যাটসিনি গ্যারিবল্ডীর কীর্তিকলাপ অবগত হয়েছিলেন। বিলাত প্রত্যাগত আই, সি, এস সত্যেন্দ্রনাথের মুখ থেকে ও এবিষয়ে কিছু শুনে থাকতে পারেন।[৬২] শ্রীপ্রশান্তকুমার পাল ঠাকুরপরিবারের পুরান ক্যাশবই ঘেঁটে সম্প্রতি এই সংবাদ উদ্ধার করে দিয়েছেন যে ঠাকুর বাড়ির সোমেন্দ্রনাথ প্রভৃতি বালকেরা সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতা শুনতে যেতেন।[৬৩] সুতরাং সুরেন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ বক্তৃতা শুনেও গুপ্তসভার সভ্যদের কেউ কেউ বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত হয়ে থাকতে পারেন।[৬৪] সমকালীন কোন-কোন পত্রিকায় ইতালীর প্রত্যক্ষ মুক্তি সংগ্রামের (কেন না এই মুক্তি সংগ্রাম তখন শেষ হয়ে গিয়েছিল) নাহলেও গ্যারিবল্ডী সম্পর্কে দুএকটা ছোট খাট সংবাদ প্রকাশিত হোত (গ্যারিবল্ডী এই সময়ে ক্যাপ্রেরা দ্বীপে অবসর জীবনযাপন করছিলেন) যেমন' 'The Indian Mirror' পত্রিকায় ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ২রা নভেম্বর তারিখে 'Literary' অংশের এই সংবাদ, 'General Garibaldi has just published a book entitled' 'The 'Thousand' and giving his expedition to Sicily,' (p. 5)। এখানে একটি বিশেষ বিষয় সম্পর্কে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন মনে করি। রবীন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ এদের স্মৃতিকথাগুলিতে 'সঞ্জীবনীসভা' সম্পর্কে বা ঐ সভার দীক্ষাদান পদ্ধতি সম্পৃক্ত উপকরণগুলির মধ্যে যে পার্থক্য আছে, তা আমরা পূর্বেই দেখে এসেছি। তিনজনের বর্ণনার মধ্যে পার্থক্যগুলি স্বীকার করে নিলেও একটা প্রশ্ন থেকে যায় যে উপকরণগুলি [মড়ার মাথা, তলোয়ার প্রভৃতি] বা দীক্ষার প্রক্রিয়া—এ সকল কি রাজনারায়ণ বা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মৌলিক

উদ্ভাবন, না বহিরাগত কোন সূত্রের দ্বারা অনুপ্রাণিত? বিষয়টি সম্পর্কে এখনও পর্যন্ত কেউ কিছু চিন্তা করেছেন বলে জানিনা। বিষয়টি আমাদের কাছেও যথেষ্ট স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি প্রধানতঃ যথেষ্ট তথ্যের অভাবে। তবে বিষয়টি বাইরের কোন সূত্রের দ্বারা কিছু অনুপ্রাণিত হয়েছিল, এমন সম্ভাবনাকেও যে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না, এরূপ একটি সংবাদ এখানে পরিবেশন করছি। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই এপ্রিল তারিখের 'The Indian Mirror' পত্রিকার 'Our Note book' অংশে এই সংবাদটি প্রকাশিত হয়, 'Garibaldi is a free Masan, and Free Masonry, according to Catholics, is in Italy a violent political and religious creed. The great Italian patriot is reported to have performed a dreadful ceremony at Palermo. He has been initiated into the order of Kadosch Knights and the ceremony to be performed on the occasion is the following, 'There are two skulls respectively crowned with a tiara, and a crown, representing the power of the Pope and the King. The candidate for the order has to take up a poniand and give a symbolic blow to the two skulls, indicating that he records an everlasting vow of 'death and hatred to all religions and political despotism'. The Catholics in general have so little love for Garibaldi, that we must hesitate to accept the statement thus made by them. Despotism in every shape is an evil, but there are other emblems than the Crown and the tiara. that represent the evil. Is it to be supposed then that at least one mystery of Free Masonry has transipired? (p. 1) সংবাদটির দ্বিতীয় অংশে পত্রিকা-সম্পাদকের মন্তব্য আমাদের পক্ষে আশু প্রয়োজনীয় নয়, কিন্তু উক্ত অনুষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত উপকরণ, রাজশক্তি ও পোপশক্তির (যে দুটির বিরুদ্ধে মুখ্যতঃ ইতালীয় মুক্তি সংগ্রাম) প্রতীক স্বরূপ দুটি মড়ার মাথা ও poniard (তরবারি)-এর প্রসঙ্গ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 'মিরার' পত্রিকা ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ অর্থাৎ কেশবসেনের দলের মুখপত্র হলেও আদি ব্রাহ্মসমাজের রাজনারায়ণ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, নবগোপাল মিত্র প্রভৃতি প্রগতিশীল ব্যক্তি যে একেবারেই পড়তেন না, তা নয়। সুতরাং সেক্ষেত্রে কি এরূপ অনুমান করাও

অসঙ্গত হবে যে 'সঞ্জীবনী সভা'র মড়ার মাথা, তলোয়ার প্রভৃতি উপকরণ বিষয়ে তাঁরা এখান থেকেই ইঙ্গিত গ্রহণ ক'রে, তার উপরে খানিকটা ভারতীয়ত্বের পোষাক পরিয়ে দেবার জন্য ঋকবেদের পুঁথি ও বৈদিক মন্ত্র-গান সংযোজন করেছিলেন ?

'সঞ্জীবনী সভা'র প্রতিষ্ঠাতাদের রাশিয়ার বিপ্লব সমিতি দ্বারা উদ্বুদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনার কথা ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার বলেছেন।[৬৫] এ বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করে মন্তব্যটির সত্যতা নিরূপণ করা যেতে পারে। উনিশ শতকের প্রায় প্রথম থেকেই নেপোনিয়ান-বিজয়ী রুশ জাতির কথা প্রধানতঃ পত্র-পত্রিকা মারফৎ বাঙ্গালীচিত্তে স্থান দখল করে এবং প্রায় এই সময় থেকেই ভারতীয়দের মনে 'রুশ জুজু'র ভয়[৬৬] জাগিয়ে তোলার জন্যে ইংরেজরা সুপরিকল্পিতভাবে চেষ্টা চালাতে শুরু করে। তত্রাচ বিশপ হিবার, পাদ্রী রেভারেণ্ড লং প্রভৃতির দৌলতে রাশিয়ার প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে বাঙ্গালিরা উত্তরোত্তর ওয়াকিবহাল হতে থাকে এবং 'Bengal Social Science Association'-এর মাধ্যমে লং সাহেবের সঙ্গে প্যারিচাঁদ মিত্র, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি বুদ্ধিজীবীর সহযোগিতায় এদেশে রীতিমতো 'সাংগঠনিকভাবে রুশ চর্চা' সুরু হয়।[৬৭] লণ্ডনে অবস্থানরত রুশ-নেতা লেনিন সিপাহী যুদ্ধ চলাকালীন সময়েই, ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের 'Tribune', 'New York Daily' প্রভৃতি পত্রিকায় ভারতে ইংরেজ শাসনের অত্যাচার তথা নগ্নরূপ উদ্‌ঘাটন করে যে প্রবন্ধগুলি প্রকাশ করেন, সেসব প্রবন্ধও সম্ভবতঃ অনতিবিলম্বে প্রগতিশীল বাঙ্গালিদের কাছে পৌঁছিয়ে ছিল। ফলতঃ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে রুশ সম্রাট পিটার, রাজ্ঞী ক্যাথারিণ প্রভৃতি সম্বন্ধে বাঙ্গালিদের মনে যে একটা শ্রদ্ধামিশ্রিত বিস্ময়বোধ জেগে উঠেছিল, এখন এই প্রকার রীতিমতো রুশ-চর্চার ফলে ও অন্যান্য কারণে ক্রমেই 'রুশরাজাদের চেয়ে রুশরাজদ্রোহীদের প্রতি বাঙ্গালী সাধারণের কৌতূহল অপেক্ষাকৃত বেশি মাত্রায়'[৬৮] প্রকাশ পেতে থাকে। এই সময়ে রাশিয়ার সম্রাট দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের রাজত্বকালে (১৮৫৫—১৮৮১) সেখানে 'নিহিলিষ্ট'-আন্দোলনের সূত্রপাত হয়, এবং 'নারদনায়া ভোলিয়ার' নামক সন্ত্রাসবাদী গুপ্ত সমিতি বিশেষভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠে। বিভিন্ন সূত্রেই রাশিয়ার এই সব আভ্যন্তরীণ সংবাদ কলকাতার শিক্ষিত বাঙ্গালী-সমাজে যথাকালে পৌঁছতে শুরু করে। সুতরাং রাজনারায়ণ, জ্যোতিরিন্দ্র-

নাথ প্রমুখ প্রগতিশীল মানুষের রাশিয়ার গুপ্ত-সমিতির সংবাদাদির দ্বারা অনুপ্রাণিত হওয়ার যে সম্ভাবনার কথা ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার উত্থাপন করেছেন, তা একেবারে অযৌক্তিক নয়।

আরো একটি উৎস থেকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রভৃতির এই 'গুপ্ত সভা' স্থাপনে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠার সম্ভাবনা ছিল বলে মনে হয়। বিষয়টি সম্পর্কে বিশেষ কোন আলোচনা[৬৯] হয় নি বলে এখানে একটু বিস্তৃতভাবে তা উপস্থাপিত করতে হচ্ছে।

১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে অক্টোবর বিখ্যাত ইংরেজ বক্তা[৭০] John Bright (১৮১১—৮৯) তাঁর কোন ভাষণের একস্থানে একটি দেশের অবস্থা সম্বন্ধে মন্তব্য করেছিলেন, 'It is a country from which thousands of families have been driven by the will of the land-owners and power of law. It is a country where have existed, to a great extent, those dread tribunals known by the name of common secret societies, by which there have been committed crimes of appalling guilt in the eye of the whole world.'[৭১] এই দেশটি হোল আয়ারল্যাণ্ড এবং এরই রাজধানী Dublin-এ Bright-সাহেবকে আইরিশরা যে প্রকাশ্য সম্বর্ধনা জানায়, তারই উত্তরে তাঁর এই বক্তৃতা। সমস্ত পৃথিবীর চোখ দিয়ে না দেখলেও এই বক্তৃতার প্রায় অর্ধশত বৎসর পূর্বেই যুগ-পুরুষ রামমোহনের চোখ দিয়ে ইংরেজ শাসিত-শোষিত ও ক্ষত-বিক্ষত আয়ারল্যাণ্ডকে আমরা প্রথম দেখতে পাই। (পরে আলোচনা করছি)। রামমোহনের বক্তব্যের বৎসর খানেকের মধ্যেই, ১৮২৪ সালে ফরাসী রাজনীতিবিদ্ ও পর্যটক Gustave de Beaumont জগতের চোখের সামনে ইংরেজ শাসনাধীন ভারতবর্ষ ও আয়ারল্যাণ্ডের দুর্দশার চিত্র তুলনার মধ্য দিয়ে খুলে দেখালেন।[৭২] সংখ্যা গণনার অতীত প্রত্যুষে দুটি দেশের মধ্যে যে সম্পর্ক ছিল,[৭৩] তা বৈজ্ঞানিক যুগে রামমোহনের হাতেই উদ্ধার-প্রাপ্ত হ'ল।

কয়েক শতাব্দীব্যাপী অবিরাম চেষ্টার ফলে ষোড়শ শতাব্দীতে রাণী এলিজাবেথের রাজত্বকালে অমানুষিক অত্যাচার দ্বারা খণ্ড-বিচ্ছিন্ন আয়ারল্যাণ্ডে ইংরেজদের একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।[৭৪] এর পর থেকে ইংরেজদের নিষ্ঠুর শোষণ ও অসহনীয় অত্যাচারে ব্যতিব্যস্ত (আয়ার-

ল্যাণ্ডের তিন-চতুর্থাংশ ছিল ক্যাথলিক[৭৫]) আয়ারল্যাণ্ডের শিল্প-বাণিজ্য একদিনে যেমন দ্রুত ধ্বংস হতে থাকে, অন্যদিকে তেমনি ক্রমান্বয় দুর্ভিক্ষে লক্ষ লক্ষ আইরিশের মৃত্যু হতে থাকে এবং হাজার হাজার আইরিশ প্রাণ বাঁচাতে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে, বিশেষভাবে আমেরিকায় গিয়ে আশ্রয় নিতে থাকে। আমেরিকায় উপনিবিষ্ট এই আইরিশরাই কালক্রমে 'Irish-American' নামে পরিচিত হয়।[৭৬] যুদ্ধবিদ্যায় শিক্ষাপ্রাপ্ত এই Irish American সৈন্যরাই[৭৭] (১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দের) আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামে ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রবলভাবে যুদ্ধ করেছিল। আয়ারল্যাণ্ডে বসবাসকারী আইরিশদের অপেক্ষা এই Irish American-দের ইংরেজদের উপর আক্রোশ অনেক বেশি ছিল,[৭৮] যেহেতু তারা কখনোই ভুলতে পারতো না যে ইংরেজ-দের অত্যাচারেই তারা জন্মভূমির কোল ছেড়ে বিদেশে বাস করতে বাধ্য হয়েছে। একথা আয়ারল্যাণ্ডের একদা মুক্তি সংগ্রামী[৭৯] আইরিশ ঐতিহাসিক Justin McCarthy[৮০] তাঁর পাঁচ খণ্ডে রচিত 'A History of our own times' (London, 1908) গ্রন্থের ৪র্থ খণ্ডের ১৩১ পৃষ্ঠায় বলেছেন।

আঠার শতকের আশির দশকে Henry Grattan, Henry Flood প্রমুখ আইরিশ নেতা নিয়মতান্ত্রিক পথে আয়ারল্যাণ্ডের মুক্তির জন্য প্রভূত চেষ্টা করেন। আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম, বিশেষতঃ ফরাসী বিপ্লবের আদর্শে উদ্বুদ্ধ[৮১] হয়ে আইরিশরা ১৭৯২ খ্রীস্টাব্দে 'United Irishmen' সমিতি গঠন করে এবং Wolfetone, Fitzerald প্রভৃতির নেতৃত্বে ১৭৯৮ খ্রীস্টাব্দে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। বিদ্রোহ অবিলম্বে দমিত হয়, বহু নেতার ফাঁসী হয় এবং প্রবল প্রতিবাদও প্রতিরোধ সত্ত্বেও আয়ারল্যাণ্ডের স্বাতন্ত্র্য মুছে দিয়ে তাকে সম্পূর্ণ গ্রাস করার জন্য ১৮০০ খ্রীস্টাব্দে 'Act of Union' বিধিবদ্ধ হয়।

এদিকে পলাশীর যুদ্ধের পর অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যেই ক্রমান্বয়ে রোহিলাযুদ্ধ মহীশূর যুদ্ধ, প্রথম মারাঠা যুদ্ধ প্রভৃতির দ্বারা ইংরেজরা কামধেনুবৎ বিশাল ভারতসাম্রাজ্য গড়ে তোলে, যার প্রাণ-কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায় কলকাতা। এই সময়ের মধ্যে ইংরেজ ছাড়া ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে বহু ভাগ্যান্বেষী মানুষ কলকাতায় সমবেত হয়েছিল। এই সব বহিরাগতের, বিশেষ করে হঠাৎ আঙুল ফুলে কলাগাছ শাসক ইংরেজদের মধ্যে সেদিন জালজুয়াচুরি, উৎকোচ অত্যাচার, ব্যভিচারের প্রবল স্রোত বইতে থাকে।[৮২] অসম্ভব উচ্চ বেতন[৮৩] সত্ত্বেও উৎকোচ গ্রহণ ও অসাধু ব্যবসা দ্বারা অর্জিত বিপুল অর্থসম্পদের

মালিক ইংরেজ কর্মচারীদের কেউ কেউ একশদশ জন পর্যন্ত ভৃত্য রেখে,[৮৪] হুঁকো খেয়ে, জুয়া খেলে, থিয়েটার দেখে, 'বল-ড্যান্স' করে,[৮৫] মেমসাহেব নিয়ে 'ডুয়েল' লড়ে এবং নানা কেলেঙ্কারী ও ব্যাভিচার করে নবাবী চালে দিন কাটাতো এবং শেষাবিধি বিপুল অর্থ নিয়ে বিলেতে ফিরে গিয়েও নবাবী[৮৬] করতো।

বিদেশীদের চিত্ত-বিনোদনের জন্য এই সময়ে কলকাতায় একের পর এক গজিয়ে ওঠা 'Old Play House', 'Calcutta Theatre', 'Wheler Place Theatre' প্রভৃতি রঙ্গমঞ্চে[৮৭] অভিনীত নাটকের মধ্যে আইরিশদের জীবনযাত্রা নিয়ে রচিত 'The Irish Widow,' 'An Irishman in London' প্রভৃতি নাটকের অভিনয় কলকাতায় বেশকিছু আইরিশদের উপস্থিতির সাক্ষ্য দেয়। ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার বিচারপতি William Jones, John Hyde এবং Robert Chambers-এর এজলাসে 'পিটার কার্লি' নামক জনৈক আইরিশ অপরাধীর বিচার-প্রহসনের চিত্র William Hickey (ইনিও জাতিতে আইরিশ ছিলেন) সাহেবের স্মৃতিকথায় ('Memoirs') পাওয়া যায়।[৮৮] আবার, সত্তরের দশক থেকে কলকাতায় একে একে 'India Gazette', 'Bengal Gazette', 'Oriental Magazine or Calcutta Amusements', নামে যে সংবাদপত্রগুলি প্রকাশিত হতে থাকে, তার মধ্যে 'Bengal Gazette' পত্রিকায় গভর্ণর-জেনারেল থেকে সুরু করে সাধারণ ইংরেজদের, এমনকি ইংরেজকুমারীদেরও জীবন-যাত্রা, আচার-আচরণ সম্পর্কে নানা সমালোচনা ও কুৎসা প্রচার করা হোত। এই পত্রিকার সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী James Augustus Hickey ছিলেন জাতে সেই শ্রেণীর আইরিশ, যাঁদের সম্পর্কে McCarthy ও Bright বলেছেন ইংরেজদের জাত-শত্রু। ফলে হিকিসাহেবকে একবার হত্যা-করার চেষ্টা করা হয় এবং একাধিকবার তাঁর অর্থ ও কারাদণ্ড হয়।[৮৯] অনুরূপ কারণে 'Colonel Duane' ও 'Dr Maclean' নামক দুই ব্যক্তিকে ইংরেজসরকার কর্তৃক ভারতবর্ষ থেকে বহিষ্কারের সংবাদ পাওয়া যায় W. H. Carey সাহেবের গ্রন্থে।[৯০] 'William Duane' নামক এই 'Irish-American' ভদ্রলোক ১৭৯৪ সালে প্রকাশিত তাঁর 'Indian World' পত্রিকায় 'Contempt' (ইংরেজ বিদ্বেষ) প্রচার করার জন্যে ঐ বছরের ডিসেম্বরের শেষদিকে ভারতবর্ষ থেকে বিতাড়িত হন।[৯১]

প্রায় এই সময়েই রামমোহন রায় ইংরেজি শিখতে শুরু করেন এবং অর্থোপার্জনের আশায় কলকাতায় যাওয়া-আসা সূত্রে বিদেশীদের সংস্পর্শে আসতে থাকেন। অসাধারণ বুদ্ধিমান রামমোহনের কানে Duane সাহেব সংক্রান্ত ঘটনা পৌঁছেছিল বলে মনে হয়। যাই হোক, উনিশ শতকের প্রথম দিক থেকে কলকাতার যেমন দ্রুত রূপান্তর ঘটতে থাকে, তেমনি রামমোহনের জীবনও দ্রুত তালে এগিয়েছে—সম্পত্তি করা ও সম্পত্তি রক্ষা করা, 'তুহ্‌ফাতুল মুহাদিনের প্রকাশ, পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার জেল, John Digby-র সঙ্গে পরিচয় ও তাঁর অধীনে চাকুরি গ্রহণ, পিতার মৃত্যু ও পারিবারিক অশান্তি, রংপুরে দেওয়ান'-গিরি, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যু ও তৎপত্নীর সহমরণ গমন, দৌত্য কর্মে ভুটানে অবস্থান, গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষা শিক্ষা, বিদেশীদের ক্রমবর্ধমান সাহচর্য লাভ, পত্র-পত্রিকাদির মধ্য দিয়ে ইউরোপের রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন, Napolean সম্বন্ধে তাঁর প্রথম দিকের উৎসাহের বিরাগে পরিণতি—এ সকলের মধ্য দিয়ে ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি হিসাবে কলকাতায় স্থায়ীভাবে তাঁর বসবাস শুরু হয়। অচিরে তাঁর বাড়ি বিদেশীদের বিশেষ আকর্ষণের স্থানে পরিণত হয়।[২২] এই সময়ে দেশে যেমন বিভিন্ন সমাজ-সংস্কার মূলক আন্দোলনের সঙ্গে তিনি জড়িয়ে পড়তে থাকেন, অন্যদিকে তেমনি ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের শিক্ষিত সমাজেও বিশেষভাবে পরিচিত হয়ে উঠতে থাকেন। মধ্যযুগীয় কুসংস্কারের নাগপাশ থেকে দেশবাসীকে বৈজ্ঞানিক যুগের আবহাওয়ায় মুক্তি দেবার জন্যে রামমোহন বাংলা সাপ্তাহিক 'সংবাদ কৌমুদী' (৪ঠা ডিসেম্বর, ১৮২১) ও ফার্সী সাপ্তাহিক 'মিরাৎ-উল্‌-আখ্‌বার' (১২ই এপ্রিল, ১৮২২) পত্রিকাদ্বয়ের সূত্রপাত করেন। 'মিরাৎ-উল-আখ্‌বারে' রাশিয়া, চীন, অটোম্যান সাম্রাজ্য ইত্যাদি দেশের নানা সংবাদ পরিবেশন ও প্রসঙ্গ-আলোচনায় আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে রামমোহনের বিশেষ জ্ঞানের পরিচয় প্রকাশ পায়। এই পত্রিকার ১১ই অক্টোবর, ১৮২২ তারিখের 'On Ireland: the Causes of its Distress and Discontent' প্রবন্ধে আয়ারল্যাণ্ডের অসহনীয় দুর্দশার মূল-কারণ যে ইংরেজদের শাসন ও শোষণ, সেকথা রামমোহন স্পষ্টভাবেই ঘোষণা করেন এবং সেখান কার দুর্ভিক্ষে সাহায্য দাতা ইউরোপীয় ও ভারতীয়দের নাম প্রকাশ করেন।[২৩] এ প্রসঙ্গে রামামোহন জীবনীকার সোফিয়া ডবসন কলেট মন্তব্য করেছেন যে আয়ারল্যাণ্ডের অধিবাসীরা নিশ্চয়ই তাদের দেশের প্রতি ভারতীয়

জাতীয়তাবাদের জনকের এই সম্মান ও সহানুভূতির কথা শীঘ্র ভুলে যাবে না।[৯৪]

১৮২৩ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে ভারতের প্রতিক্রিয়াশীল গভর্নর-জেনারেল John Adams দেশীয় সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করার চেষ্টা সুরু করেন এবং রামমোহনের বন্ধুস্থানীয় 'Calcutta Journal' পত্রিকার সম্পাদক James Silk Buckingham (1786 1855) ও তদীয় সহকর্মী Standfort Arnot-কে ভারত থেকে বহিষ্কার করেন। সংবাদপত্রের স্বাধীনতাহরণের বিরুদ্ধে রামমোহন দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রভৃতি ছয় জনের স্বাক্ষরিত একটি স্মারকলিপি Supreme Court-এ উপস্থাপিত হয়। এটিকে শ্রীমতী কলেট 'Aeropagatica of Indian history' বলেছেন।[৯৫]) এটি অগ্রাহ্য করে ৫ই এপ্রিল (১৮২৩) 'Press Regulation' জারী করা হলে তার প্রতিবাদে রামমোহন তাঁর দুটি পত্রিকারই প্রকাশ বন্ধ করে দেন এবং ইংলণ্ডেশ্বরের উদ্দেশ্যে বহুব্যক্তির স্বাক্ষরিত একটি দীর্ঘ আবেদনপত্র বিলাতগামী Buckingham সাহেবের মারফৎ প্রেরণ করেন। ঐ আবেদনপত্রের ৩১-সংখ্যক অনুচ্ছেদে সংবাদপত্রের স্বাধীনতাহরণ যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিপ্লবের কারণ তা স্পষ্টভাবেই উল্লিখিত হয়েছিল।[৯৬] বারে-বারে ব্যক্তি-স্বাধীনতা হরণ করতে 'Habeas Corpus Act' প্রত্যাহার করে নিয়ে এবং ক্রমান্বয়ে নানা দমন-মূলক 'Coercion Act' চালু করেও [৯৭]আয়ারল্যাণ্ডের বিদ্রোহ দমন করা যাচ্ছে না, এই বাস্তব সত্যের দিকেই এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে। ১৮২৭ খ্রীস্টাব্দে 'Jury Act' দ্বারা ভারতীয়দের নানা অসুবিধার মধ্যে ঠেলে দিয়ে খ্রীষ্টানদের অর্থাৎ ইংরেজদের যেমন নিরঙ্কুশ যথেচ্ছারের সুযোগ করে দেওয়া হয়েছিল, তেমনি নানা Coercion Act-এর দৌলতে আয়ারল্যাণ্ডের ক্যাথলিক স্বার্থকে বলি দিয়ে প্রধানতঃ প্রোটেস্ট্যান্ট ইংরেজদের নিরঙ্কুশ সুবিধা দান করা হচ্ছিল—দু দেশের অবস্থা সম্পর্কে সচেতন রামমোহন ১৮২৮ খ্রীস্টাব্দের ২৮শে আগষ্ট John Crawford-কে পত্রে এ বিষয় উল্লেখ করে লিখেছেন যে ইংল্যাণ্ডের পার্শ্ববর্তী আয়ারল্যাণ্ডে সৈন্য পাঠিয়ে আইরিশদের শায়েস্তা করা সহজ, কিন্তু একশ বছর পরে ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নত ভারতীয়দের এত সহজে দমন করা যাবে না।[৯৮] (রামমোহনের এই ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয়েছে।) বিদেশী পত্র-পত্রিকা থেকে আয়ারল্যাণ্ডের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে রামমোহনের যে অভ্রান্ত ধারণা এই সময়েই গড়ে উঠেছিল, তা থেকে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে ঐ

সময়ে আয়ারল্যাণ্ডের 'মুকুটহীন রাজা'[৯৯] Daniel O' Connell (1775-1847) সাহেবের কীর্তিকলাপ রামমোহন সংবাদপত্রাদির মারফত জ্ঞাত হয়েছিলেন।[১০০]

ইতিমধ্যে ১৮২২-২৩ সাল থেকে Richard Lalor Shiel (1791-1841) -এর সহযোগিতায় O'Connell যে প্রবল আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন তাতে অনিবার্য বিপ্লব ও গৃহযুদ্ধ ঠেকাতে প্রধানমন্ত্রী Duke of Wellington প্রবল বিরুদ্ধতার মধ্যে ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের মার্চে Catholic Emancipation Bill পাশ করাতে বাধ্য হলেন[১০১]। কিন্তু তাঁর মন্ত্রিসভার পতন হোল (১৮৩০)। এর কিছু পরেই রামমোহন দিল্লীর বাদশাহ্-প্রদত্ত 'নবাব' খেতাব নিয়ে ইংল্যাণ্ড যাত্রা করেন এবং ১৮৩১ সালের এপ্রিল মাসে লিভারপুল ঘুরে লণ্ডনে গিয়ে উপস্থিত হন। ইতিমধ্যেই রামমোহনের খ্যাতি সেখানে পৌচেছিল[১০২] এবং তাঁর উপস্থিতি সেখানে রীতিমত চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। Wilam Roscoe, Jeremy Bentham-এর মতো বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তিরা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ-পরিচয়ে আনন্দিত হয়েছেন, ৬ই জুন ১৮৩১ আয়ারল্যাণ্ডের 'জাতীয়কবি'[১০৩] [সম্ভবতঃ সেখানের বিখ্যাত Holland House-এ[১০৪]] একটি ভোজসভায় মিলিত হয়ে রামমোহনের পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়েছেন,[১০৫] অথচ Norwhich-এর বিখ্যাত বিশপ Edward Stanley (1779-1849) রামমোহনের বিশাল ব্যক্তিত্বকে উপলব্ধি করেও ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁকে বিচার করতে গিয়ে বিভ্রান্ত হয়েছেন[১০৬]।

জনসাধারণকে অধিকতর নির্বাচনের অধিকার দিয়ে House of Commons-কে খানিকটা গণতান্ত্রিক রূপ দেবার জন্যে ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চমাসে Parliament-এ যে 'Reform Bill' উপস্থাপিত করা হয়েছিল, তা ইংল্যাণ্ডের সর্বশ্রেণীর মানুষের মধ্যে প্রবল আলোচনা ও উত্তেজনার বস্তু হয়ে দাঁড়ায়।[১০৭] এই সঙ্গে প্রায় সদৃশ কারণেই 'Irish Reform Bill' এবং 'Scottish Reform Bill' দুটিও আনা হয়েছিল। ইউরোপীয় রাজনীতিতে অভিজ্ঞ রামমোহন English Reform Billটির গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন এবং বিভিন্ন ব্যক্তিকে এই সময়ে লেখা একাধিক পত্রে বিলটির উপর পৃথিবীর মঙ্গল নির্ভর করছে এরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন[১০৮]। লণ্ডনে অবস্থিতি কালে সেখানের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা '(more distinguished men in the country') দলে দলে রামমোহনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসতেন, রামমোহন তাঁদের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা রাজনীতি বিষয়ে আলোচনা করতে করতে অসুস্থ হয়ে পড়েন, এমনকি তাঁর চিকিৎসক শেষাবধি

রামমোহনের দারোয়ান ('foot man')-কে দর্শনার্থীদের পথরোধ করবার জন্য নির্দেশ দিতে বাধ্য হন।[১০৯] এই বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে এই সময়ে বিখ্যাত এবং 'বিতর্কিত' পুরুষ Daniel O' Connell[১১০] এবং উচ্চাভিলাষী তরুণ লেখক Benjamin Disraeli[১১১] ছিলেন বলে মনে হয়।

ইংল্যাণ্ডের রাজদরবারে রামমোহন বিদেশী রাষ্ট্রদূতের সমান মর্যাদা লাভ করেন, রাজকীয় অনুষ্ঠানগুলিতেও বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হন।[১১২] Reform Bill-এর সঙ্গে ভারতের East India Company-কে পুনর্বার নতুন সনদ (charter) দেওয়ার প্রশ্নটিও এই সময়ে পার্লামেণ্টে বিবেচিত হচ্ছিল। এ বিষয়ে পার্লামেণ্ট কর্তৃক গঠিত 'Select Committee-র সামনে ভারতের ভূমি, রাজস্ব, আইন ইত্যাদি সংক্রান্ত নানা প্রশ্নের লিখিত যে উত্তরগুলি রামমোহন দাখিল করেন, তা ১৮৩১ সালের (সম্ভবতঃ প্রথম দিকেই) লণ্ডনের Smith Elder & Co দ্বারা প্রকাশিত হয়। সম্ভবতঃ এ সকল থেকে তথ্য সংগ্রহ করেই Daniel O' Connell ভাবতে East India Company-র অমানবিক শাসনের বিরুদ্ধে পার্লামেণ্টে দিনের পর দিন বাক্‌যুদ্ধ চালিয়ে যান[১১৩]। 'Reform Bill' পরপর দুবার House of Lords কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হলে ইংল্যাণ্ডের বহুস্থানে দাঙ্গা ঘটে, এবং গৃহযুদ্ধ বাধার উপক্রম হয়[১১৪]। শেষাবধি ৭ই জুন (১৮৩২) Reform Biil গৃহীত হয়। এদিকে ভারতের রক্ষণশীল সমাজ কর্তৃক সতীদাহ নিবারণ আইনের বিরুদ্ধে প্রেরিত আবেদন-পত্রটিও এর কিছু পরেই Privy Council কর্তৃক বিবেচিত হয়ে পরিত্যক্ত হয়। নিশ্চিন্ত হয়ে রামমোহন ১৮৩২ সালের শরৎকালে কয়েকমাসের জন্য ফ্রান্সে যান এবং সেখানে ফরাসী সম্রাট Louis Phillip ও ফ্রান্সের পণ্ডিতবর্গের দ্বারা সাদর-অভ্যর্থনা লাভ করেন। ১৮৩৩ সালের জানুয়ারী মাসে তিনি লণ্ডনে ফিরে আসেন। ইতিমধ্যে রামমোহন আয়ারল্যাণ্ডেও বিশেষ পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন—রাজধানী Dublin ছাড়া Cork, Belfast প্রভৃতি নগর থেকে তিনি অভিনন্দনপত্র পেয়েছেন, তাঁকে সম্বর্ধনা জানানোর জন্যে আয়ারল্যাণ্ডে পদার্পণের অনুরোধ জানাতে Dublin থেকে জনৈক ব্যক্তি এসেছেন এবং রামমোহনও সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করে আয়ারল্যাণ্ডে যেতে উৎসুক হয়েছিলেন[১১৫]। কিন্তু তাঁর সে ইচ্ছা আর পূর্ণ হয়নি, সামান্য রোগভোগের পর ১৮৩৩ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর তিনি পরলোকগমন করেন।

যাবে না।৯খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে Lord Brougham, Sir Charles Forbes, পত্রিকা থেকেvford, William Adam প্রভৃতির সহযোগিতায় লণ্ডনে গড়ে ওঠা ধারণা এই স

British India Society দ্বারা ভারত সম্পর্কিত নানা তথ্য জনসমাজে প্রচারিত হতে থাকে। সমিতির সভ্যেরা ইংল্যাণ্ডের নানা স্থানে ভারত সম্পর্কে যে বক্তৃতাগুলি দিতেন, তা মুদ্রিত হয়ে জনসমাজে বিতরিত হোত। এই সঙ্গে William Adam-এর সম্পাদনায় সমিতির মুখপাত্র 'British Indian Advocate'ও প্রকাশিত হতে থাকে।[১১৬] দ্বারকানাথ ঠাকুর ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে প্রথমবার লণ্ডনে যান এবং আয়ারল্যাণ্ডের দুর্ভিক্ষে তিনি সাহায্য প্রেরণ করেন।[১১৭] রামমোহনের পর আয়ারল্যাণ্ডের প্রতি দ্বারকানাথের এই সহানুভূতি আইরিশ মুক্তি-সংগ্রামীদের ভারতবর্ষ সম্পর্কে শ্রদ্ধাবান করে তুলেছিল বলে মনে করা যায়।

এদিকে ত্রিশের দশকের প্রথম থেকে 'Act of Union' প্রত্যাহারের দাবীতে Daniel O' Connell, Richard Lalor Shiel প্রভৃতি প্রবল আন্দোলন শুরু করে ছিলেন। আলু-ই ছিল আইরিশদের প্রধান, বলা যায় একমাত্র খাদ্য।[১১৮] কিন্তু আলুগাছে ব্যাপকভাবে পোকা (blight) লাগায় ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর-নভেম্বর থেকে আয়ারল্যাণ্ডে দুর্ভিক্ষ দেখা দিতে শুরু করে। ১৮৪৫ সালের মার্চ মাসে দ্বারকানাথ দ্বিতীয়বার বিলাত-যাত্রা করেন এবং শরৎকালে (autumn), সম্ভবতঃ সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে, কিছুদিনের জন্য আয়ারল্যাণ্ডে যান। নানা কারণে এই সময়ে O'Connell-এর দলে ভাঙ্গন দেখা দিয়েছিল।[১২০] সদ্য-জেল প্রত্যাগত ও দেহে-মনে বিধ্বস্ত[১২১] সত্তর-বৎসর বয়স্ক Daniel O'Connell স্বাস্থ্যোদ্ধারের আশায় এবং পার্টির সাংগঠনিক কাজে এই সময়ে আয়ারল্যাণ্ডে ছিলেন। তাঁর সঙ্গে দ্বারকানাথের সাক্ষাৎকার ঘটে, আয়ারল্যাণ্ডের অনেকগুলি স্থানে উভয়ে পরিভ্রমণ করেন এবং ইংরেজ শাসিত-শোষিত আয়ারল্যাণ্ড ও ভারতবর্ষের অবস্থা সম্পর্কে তাদের মধ্যে মত-বিনিময় হয়।[১২২]

১৮৪৫ থেকে ১৮৪৭ সালের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে আয়ারল্যাণ্ডের লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু ঘটে এবং লক্ষ লক্ষ মানুষ আয়ারল্যাণ্ড ছেড়ে পালিয়ে প্রাণ বাঁচায়।[১২৩] এই দুর্ভিক্ষে আয়ারল্যাণ্ডের একচতুর্থাংশ অর্থাৎ কুড়ি লক্ষ লোক কমে যায়।[১২৪] ইংরেজ সরকার দুর্ভিক্ষ প্রশমনের কোন চেষ্টা তো করলই না, পরন্তু আয়ারল্যাণ্ড থেকে অধিকপরিমাণে শস্য ইংল্যাণ্ডে রপ্তানী করতে সুরু করলো,[১২৫] কোন কোন সদাশয় বিশিষ্ট ইংরেজ এই সময়ে আইরিশদের ঘাস খেতে পরামর্শ দিল[১২৬] এবং সম্ভাব্য বিদ্রোহ প্রতিরোধের জন্য প্রচণ্ড দমনমূলক Coercion Act জারী করতে উঠে-পড়ে লাগলো[১২৭]। এই অবস্থায় ১৮৪৭ সালে O'Connell-এর মৃত্যু ঘটে এবং ১৮৪৮ সালে আয়ারল্যাণ্ডে বিদ্রোহ দেখা দেয়। পূর্ব থেকে সতর্ক ইংরেজ-

সরকার কড়াহাতে দ্রুত বিদ্রোহ দমন করলো—বহু বিদ্রোহীর প্রাণদণ্ড হোল, অসংখ্য আইরিশকে উৎখাত করা হোল। ফলে ১৮৫৭ সালের মধ্যে আয়ারল্যাণ্ডের লোক সংখ্যা আবো দশ লক্ষ কমে গেল। ব্যাপার দেখে Times পত্রিকা এই সময়ে মন্তব্য করেছিল যে Manhattan থেকে Red-Indian-রা যেমন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, তেমনি কয়েক বছরের মধ্যে আয়ারল্যাণ্ড থেকে আইরিশবাও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।[১২৮] 'Young Ireland' ধ্বংস হলে ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে তার স্থানে 'Phoenix' সমিতি গড়ে উঠলো।[১২৯]

ইতিমধ্যে কলকাতায় যেমন British Indian Association গড়ে উঠেছে (এপ্রিল, ১৮৫৩), তেমনি লণ্ডনেও Cobden, Bright প্রভৃতিব সহযোগিতায় 'Indian Reform Society গড়ে উঠেছে এবং পার্লামেন্টের সদস্য Delvy Symur ভারতের অবস্থা সরেজমিনে দেখে গিয়েছেন[১৩০]। এই সময়ে East India Company-ব ভারত-শাসনেব নূতন সনদ (Charter)গ্রহণ সময় উপস্থিত হয়। লণ্ডনে অবস্থান-রত Karl Marx ভারতে ইংরেজ অপশাসনেব রূপ উদঘাটন করে New York Daily Tribune পত্রিকায় ১৮৫৩ সালে অনেকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশ কবেন। বোম্বাইয়ের প্রাক্তন বিচারপতি Sir Thomas Erskine Perry লণ্ডনে পৌছে 'Hadji' ছদ্মনামে ১৮৫৩ সালেব প্রথম দিকে Times পত্রিকায় ভাবতে কোম্পানীর শাসন-ব্যবস্থা লোপেব জন্য অনেকগুলি পত্র-প্রবন্ধ প্রকাশ কবেন,[১৩১] পার্লামেন্টে কোম্পানীর শাসনব্যবস্থার পক্ষে Charles Wood দ্বাবা উপস্থাপিত প্রস্তাবাদিব বিরুদ্ধে প্রতিবাদেব ঝড তোলেন John Bright।[১৩২]

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ভাবতে অনুষ্ঠিত 'সিপাহী বিদ্রোহ' যে ইংবেজ কুশাসনেব ফল, তা ইংল্যাণ্ডের বিচক্ষণ ব্যক্তিদেব বুঝতে দেবী হয় নি।[১৩৩] Karl Marx-এর এই সময়কার লিখিত প্রবন্ধাদিতেও সে কথাই ঘোষিত হযেছিল। সিপাহী বিদ্রোহকালে ইংরাজ-পক্ষে যোগদানকারী বহু আইরিশ সেনা স্বদেশে ফিবে গিয়ে Francis Meaghar-এব 'Irish Brigade'-এ যোগদান করে।[১৩৪] আয়ারল্যাণ্ডের 'মুক্তিদাতা' Daniell O' Connell ইংরেজ শাসিত-শোষিত ভাবতবর্ষ ও আয়ারল্যাণ্ডের মধ্যে ইতিপূর্বে যে সাদৃশ্য দেখিয়েছিলেন[১৩৫], সে সম্পর্কে আইরিশ নেতৃবৃন্দ এই সময়ে অধিকতর সচেতন হয়ে ওঠেন বলে মনে হয়। পৃথিবীব্যাপী ইংবেজ উপনিবেশগুলি থেকে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধাচরণ তথা উচ্ছেদের জন্য James Stepens, O' Donovan Rossa, John O' Mahony

প্রমুখ আইরিশ নেতা ১৮৫৮ সালে আমেরিকায় 'Fenion Society' বা 'Irish Revolutionary (Republican) Brotherhood' [দুটি নামকে মিলিয়ে সাধারণভাবে 'Fenion Brotherhood' বলা হয় [১৩৬]] নামে বিপ্লবী সমিতি গড়ে তোলেন। New York-এর নিকটবর্তী Union Square অঞ্চলে গঠিত এঁদের অস্থায়ী সরকার [১৩৭] প্রচুর অর্থ ও লোকবলের সহায়তায় পৃথিবীর অনেক স্থানে শাখা সমিতি স্থাপন করেছিল।[১৩৮] ভারতবর্ষে এরূপ কোন শাখা-সমিতি গঠিত হয়েছিল কিনা সে সন্ধান এখনও পাইনি, তবে বাঙ্গালী নেতাদের বক্তৃতা ও দেশীয় সংবাদপত্রাদির ভাষা যে আইরিশ-আন্দোলনের দ্বারা উদ্বুদ্ধ, একথা জানিয়ে আশির দশকে প্রতিক্রিয়াশীল 'বড়লাট' Lord Dufferin বিলাতে 'ভারত সচিব' Lord Cross-কে যে পত্র লিখেছিলেন [১৩৯] সে কথা আমরা স্মরণ করতে পারি।

নানা কারণে [১৪০] ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময়ে ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকার মধ্যে যুদ্ধ বাধার উপক্রম হলে আমেরিকার উপনিবিষ্ট আইরিশরা দলে দলে আয়ারল্যাণ্ডে ক্রমে উপস্থিত হতে থাকে এবং ১৮৬৬ সালের মে মাসে কানাডায় ও ১৮৬৭ সালে মার্চে আয়ারল্যাণ্ডে সশস্ত্র-অভ্যুত্থান ঘটে। বিদ্রোহ অচিরে দমন ক'রে কয়েকজন বিদ্রোহীসহ নেতা Colonel Burke-কে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হলে ইংল্যাণ্ড ও আয়ারল্যাণ্ডে বিশেষ আন্দোলন দেখা দেয়, সংবাদ-পত্রাদিতে বিদ্রোহীদের নির্ভীক দেশপ্রেমের প্রশংসা প্রকাশিত হতে থাকে, লণ্ডনের St James Hall-এর জনাকীর্ণ বিশাল সভায় বিখ্যাত James Stuart Mill আবেগপূর্ণ ভাষায় বিদ্রোহীদের ক্ষমা করার জন্যে ইংরেজদের মানবতাবোধের কাছে আবেদন জানান।[১৪১] কিছুদিন পরেই রক্ষীকে খুন করে দুজন বিদ্রোহীকে পুলিশের গাড়ি থেকে ছিনিয়ে নেওয়ার অপরাধে ধৃত পাঁচজন আসামীর মধ্যে 'Manchester Martyr'-রূপে প্রসিদ্ধ Allen, Larkin এবং O Brien-এর ফাঁসী হয় (২৩ শে নভেম্বর, ১৮৬৭)। এঁদের ক্ষমা করা ও এঁদের অনুকূলে জনমত সৃষ্টি করার জন্য John Bright ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করেছিলেন, কবি Swinburne কবিতা রচনা করেছিলেন।[১৪২] এই ফাঁসীর প্রতিশোধ নেবার জন্য কুড়িদিন পরে (১৩ই ডিসেম্বর, ১৮৬৭) লণ্ডনের Clarkenwell জেলখানা উড়িয়ে দেবার চেষ্টা হয়—প্রচণ্ড বিস্ফোরণে সমস্ত লণ্ডন শহর কেঁপে ওঠে, জেলখানার ৬০ ফুট পাঁচিল উড়ে যায় এবং নিকটবর্তী বাড়ি-ঘর ভেঙে প্রায় দু'শ নরনারী হত ও আহত হয়।[১৪৩]

ভারতীয়দের ন্যায্য কতকগুলি সুবিধা আদায়ের জন্য লণ্ডন-বাসী দাদাভাই

নৌরজী ও উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে সেখানে 'India Society' নামে যে সমিতিটি স্থাপন করেছিলেন, সেটি পার্লামেণ্টের কয়েকজন ইংরেজ সদস্য ও ভারত থেকে অবসরপ্রাপ্ত কিছু উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারী দ্বারা ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত 'East India Association'-এর সঙ্গে মিশে যায়। নবগঠিত সংস্থার সম্পাদক হন নৌরজী। সমিতির ত্রৈমাসিক মুখপত্রে ভারত সম্পর্কিত নানা তথ্য পরিবেশিত হোত। এক বছরের মধ্যে সমিতিটির 'Life member'ও 'Ordinary member'-এর সংখ্যা যথাক্রমে ৬৪ ও ৫৩০ হয়ে ওঠা, সমিতিটির জনপ্রিয়তায় সাক্ষ্য দেয়[১৪৪]। এই সভ্যসংখ্যার মধ্যে আইরিশ নেতৃবৃন্দের কারুর কারুর থাকা সম্ভব. কেননা ১৮৫৮ সাল থেকেই পৃথিবীব্যাপী ইংরেজশাসনের উৎখাতের জন্য Fenian Brotherhood-এর কর্মতৎপরতা সুরু হয়েছিল।

ইতিমধ্যে, ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে বিলাতের মাটিতে দাঁড়িয়ে কেশবচন্দ্র ভারতে ইংরেজশাসনের অবসান কামনা করেছেন, ১৮৭২ সালে Scottish Church College Debating Society-র সভায় আনন্দমোহন ভারতে ইংরেজ-শাসনের ব্যর্থতা প্রকাশ করেছেন, ভারতে ইংরেজ কুশাসনের নগ্নরূপ-প্রকাশক Anstey সাহেবের বক্তৃতা 'The Great Wahabi Case' পুস্তিকা, ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে কুকা-বিদ্রোহ দমনের নামে ইংরেজদের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের সংবাদ ইংল্যাণ্ডে পৌঁচেছে। এই সময়কালে আনন্দমোহন, সুরেন্দ্রনাথ, প্রমথনাথ মিত্র, মন্মথচন্দ্র মল্লিক প্রমুখ ব্যক্তি ইংল্যাণ্ডে ছিলেন, এঁদের পরবর্তীকালের কার্যকলাপ থেকে বোঝা যায় ইতালী, আয়ারল্যাণ্ডের মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে এঁদের কিছু পরিচয় ঐ সময়েই ঘটেছিল।[১৪৫] আয়ারল্যাণ্ডে 'Home Rule' প্রবর্তনের যে দাবী Issac Butt-এর নেতৃত্বে ১৮৭৩-৭৪ সালে প্রবল আকার ধারণ করে, তা সঙ্গে সঙ্গেই ভারতেও প্রতিধ্বনিত হয়। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দেই 'Hindoo Patriot' পত্রিকায় কৃষ্টদাস পাল জানালেন, 'Home Rule for India ought to be our cry, and ought to be based upon the same constitutional basis that is recognisd in the colonies'।[১৪৬] ইতিমধ্যে পৃথিবীব্যাপী ইংরেজ উপনিবেশের সর্বত্র স্বায়ত্ত-শাসনের দাবী জানাতে আইরিশ নেতারা 'Constitutional Reform Association' গড়ে তুলেছিলেন। ভারতবর্ষের কথাটাও যে তাঁরা ভোলেননি, তার প্রমাণ হোল ১৮৭৪ সালে ঐ সমিতির অন্যতম নেতা Frank Hugh O' Donnell এব্যাপারে ভারতের রাজনৈতিক নেতাদের সহযোগিতা আহ্বানের প্রস্তাব করেছিলেন।[১৪৭]

বিষয়টি কতদূর কার্যকরী হয়েছিল সে সংবাদ আমরা অবশ্য এখনও পাইনি। [এই O' Donnellসাহেবকেই রবীন্দ্রনাথ ১৮৭৯ সালের মে-জুন মাসে ভারতের নানা প্রসঙ্গ নিয়ে House of Commons-এ বক্তৃতা করতে দেখেছিলেন।]

আইরিশ মুক্তি-আন্দোলনে রামমোহনের নৈতিক সমর্থন ও সেখানের দুর্ভিক্ষে সাহায্য প্রেরণ, Mary Carpenter এর 'The Last Days in England of the Rajah Rammohun Ray' (প্রথম প্রকাশ ১৮৬৬ খ্রীঃ) গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রামমোহনের প্রতি আইরিশদের শ্রদ্ধা, আয়ারল্যাণ্ডের দুর্ভিক্ষে দ্বারকনাথের সাহায্য দান ও Daniel O' Connell-এর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকার ও আলোচনা, ইত্যাকার সংবাদ ঠাকুর পরিবারের অবশ্যই অজ্ঞাত ছিল না। স্যার দেবপ্রসাদের 'স্মৃতিরেখা গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে আয়ারল্যাণ্ডের মুক্তি সংগ্রামের সংবাদ কলকাতার সাধারণ ছাত্র-সমাজে সত্তরের দশকেই পৌঁচেছিল (পৃঃ ১৬৪)। ইতিমধ্যে আয়ারল্যাণ্ডের জাতীয় কবি Moore-এর 'Irish Melodies' ঠাকুর বাড়িতে এসে পৌঁচেছে এবং 'সঞ্জীবনী সভা' গড়ে ওঠার পূর্বেই কিশোর রবীন্দ্রনাথ তা সযত্নে পড়েছেন [১৪৮], কলকাতার সংবাদপত্রে এক আধটা আয়ারল্যাণ্ডের সংবাদও প্রকাশিত হয়েছে।[১৪৯] ফলতঃ কয়েকশত বৎসরব্যাপী আয়ারল্যাণ্ডের তীব্র মুক্তি সংগ্রাম, বিভিন্ন সময়ে গড়ে-ওঠা বিভিন্ন গুপ্ত-সমিতির মাধ্যমে সহস্র-সহস্র আইরিশের আত্মাহুতিসহ বারংবার ব্যর্থ-অভ্যুত্থান প্রয়াস, Home Rule আন্দোলন ইত্যাদি নানা জাতীয় উত্তেজক সংবাদ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রমুখের চিত্ততটে প্রহত হয়েছিল বলে মনে হয়।

এই সকলের সমবেত অনুপ্রেরণার সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতায় পাগল-প্রায় ছাত্রের দল শহরের এদিকে-ওদিকে গুপ্ত-সমিতি স্থাপন করছে, এ সংবাদও অবশ্যই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রমুখের কাছে পৌঁচেছিল। সুতরাং সব মিলিয়ে, অর্থাৎ খানিকটা বাইরের অনুপ্রেরণায়, কিছুটা নতুন কিছু করার প্রবণতা থেকে বা খানিকটা নিছক কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে মূলতঃ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উৎসাহে ঠনঠনের কোন একটা পোড়ো-বাড়িতে 'সঞ্জীবনী সভা'র পত্তন হয়েছিল, যেখানে রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি 'উত্তেজনার আগুন' পুইয়ে কয়েক মাস 'বীরত্বের প্রহসনমাত্র অভিনয়' করেছিলেন।

বিপিনচন্দ্র পাল ও দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী তাঁদের স্মৃতিকথাগুলিতে উনিশ শতকের সত্তরের দশকে কলকাতার সাধারণ ছাত্রদের সৃষ্ট অসংখ্য গুপ্ত-সমিতির উল্লেখ করেছেন, যা প্রকৃতই ইতিহাস ('হিন্দুস্থান ইউনিয়ন' দ্বারা প্রমাণিত),

অথচ তার নিদর্শন হিসাবে ছাত্র-স্বষ্ট এরূপ কোন গুপ্তসমিতির হদিশ না পেয়ে 'নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল' এই আপ্ত-বাক্যকেমান্য করে 'সঞ্জীবনী সভা'কে এতদিন দেখানো হয়ে আসছিল। বস্তুতঃ ছাত্র-স্বষ্ট গুপ্তসমিতির সঙ্গে 'সঞ্জীবনী সভা'র যে মৌলপার্থক্য আছে (যা আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করে দেখিয়েছি), তা আন্দাজ করে কেউ কেউ যে একটু ইতস্ততঃ করেছেন, তা আমরা পূর্বে বলেছি। তবে সে পার্থক্যটিকে এত খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করে দেখার চেষ্টা সম্ভবতঃ করা হয়নি বলেই তা অনেকের বিভ্রান্তির কারণ হয়েছে।

স্বতরাং 'সঞ্জীবনী সভা' সম্পর্কে আমাদের এখন পর্যন্ত শেষ ধারণা হোল— উনিশ শতকের সত্তরের দশকের ছাত্রদের গুপ্ত-সমিতির নিদর্শন হিসাবে 'সঞ্জীবনী সভা'কে গ্রহণ করা যায় না, এবং ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনের ইতিহাস রচনা কালে ঠাকুর পরিবারের এই প্রচেষ্টাকে একটু ভিন্ন প্রেক্ষিত থেকে দেখা বা বিচার করা প্রয়োজন।

পাদটীকা

১) 'আমি যখন প্রথম কলিকাতায় আসিলাম তাহার কিছুদিন পূর্ব হইতেই নানা কারণে কেশবচন্দ্রের প্রতিষ্ঠা একটু একটু করিয়া হ্রাস পাইতে আরম্ভ করে।' 'সত্তর বৎসর' (জুলাই, ১৯৬২) বিপিনচন্দ্র পাল (পৃঃ ১৮৭)

২) 'I knew of one such society, though I was not myself a member of it, whose initiatory rites were almost Masonic in some aspects. Every member of this society had to sign the pledge of membership with his own blood drawn at the point of a sword from his breast 'Memories of my Life nd Times,' (1932) Bipin Chandra Pal, p. 248.

(৩) ঐ (পৃঃ ৩১৭-৩১৮)

(৪ 'আত্মচরিত' [আশ্বিন ১৩৫৯] শিবনাথ শাস্ত্রী। (পৃঃ ১৯২)

(৫) '... we organised under Shivanath's leadership a society of our own that differed from the political societies organised under Surendranath's inspiration '—'Memories of my Life and Times' (1932) B. C Pal, p. 311.

(৬) ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ২রা এপ্রিল 'উত্তর পাড়া হিতকরী সভা'য় সুরেন্দ্রনাথ 'Joseph Mazzini' নামে যে বক্তৃতাটি করেন, তার একস্থানে অবশ্য, শুধু কলকাতাতেই নয়, ভারতের কোথাও গুপ্ত-সমিতি জাতীয় কোন প্রতিষ্ঠান নেই বলে তিনি উল্লেখ করেছেন, 'I need hardly remind you, Gentlemen, that there are no secret associations in India ; and it is indeed not necessary that we should have any We are not rebels ; we are not treasonably affected towards the Government. We are loyal subjects of Her Maje stythe Queen'. 'Speeches of Babu Surendra-nath Banerjea, 1876—86' (1880) Edited by Ramchandra Palit, p. 79.

(৭) ১ম অধ্যায়ের ২নং পাদটীকা (পৃঃ ৭৭) দ্রষ্টব্য।

(৮) ১৩৩৩ সালের মাঘ সংখ্যা থেকে 'প্রবাসী'-তে বিপিনচন্দ্র পালের 'সত্তর

বৎসর' রচনাটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবার বৎসর চারেক আগে সাপ্তাহিক 'বিজলী' পত্রিকার ২২শে পৌষ, ১৩২৯ (৬ই জানুয়ারী ১৯২২) থেকে সদ্য আন্দামান-প্রত্যাগত বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষের 'দ্বীপান্তরের কথা' রচনাটি প্রকাশিত হতে শুরু করে। ৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯ (১৯শে মে, ১৯২২) সংখ্যায় 'দ্বীপান্তরের দুচার কথা' নামে রচনাটির শেষ অংশ প্রকাশিত হবার পর আট সপ্তাহ রচনাটির প্রকাশ বন্ধ ছিল। পরে ৫ই শ্রাবণ, ১৩২৯ (২১শে জুলাই, ১৯২২) 'পূর্ব-বিজ্ঞাপিত (২৩শে অগ্রহায়ণ, ১৩২৮, ইংরেজি ৮ই ডিসেম্বর, ১৯২১) 'বোমার কথা'র বদলে 'বোমার যুগের কাহিনী, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, 'পূর্ব প্রকাশিতের পর' এইরূপে প্রকাশিত হতে শুরু করে এবং বিপ্লবীদের নাম গোপন করে 'য-দা' [যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়], 'অবি' [অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য] ইত্যাদি ব্যবহৃত হতে থাকে। ১লা ভাদ্র, ১৩২৯ [১৮ই আগষ্ট, ১৯২২] সংখ্যায় প্রকাশিত 'চতুর্থ পরিচ্ছেদ—১০৮ নং আপার সারকুলার রোড' অংশে বারীন্দ্রকুমার লিখেছেন, 'যিনি প্রেসিডেণ্ট ছিলেন, তিনি হচ্ছেন তখনকার একজন লব্ধকামা ব্যারিষ্টার, এখন দেহ রক্ষা করেছেন তাই তাঁর কথা বলতে গিয়ে পুলিশ-শূন্য পরলোকের ভরসাতেই এতটা ইঙ্গিত দিলাম। দুনিয়ার এ তল্লাটের কোন অংশে থাকলে আর তাঁর কথা বলাই হ'তো না। তবু নামটা নলচে আড়াল দেওয়া থাক, ভদ্দর লোকের সন্তান-সন্ততি তো আছে, বাপের দোষে ছেলের ঘাড় ভাঙ্গা ব্যাঘ্রাদির অনভ্যেসের মধ্যে তো নয়'। আবার, 'পুলিশ সুপারি ঠন্‌ঠন্ সাহেবের অনুমতি নিয়ে' সুকিয়াস ষ্ট্রীটের পুলিশ থানার পিছনের পুকুরে সাঁতার শেখার ব্যাপারে সাহায্যকারিনী জনৈকা সহানুভূতি-সম্পন্না ইংরাজ মহিলার নাম গোপন করে বারীন্দ্রকুমার লিখেছেন, 'একজন ইংরেজ মেয়ে আমাদের সংকল্পের সহায় ছিলেন, তাঁরও নাম গোপন রাখলাম, বেঁচে থাকলে পাঁচ দশ বছর পর প্রকাশ করবো। তখন অতদিন পর পুলিশ, প্রজার যমের পরিবর্তে প্রজার সেবক রূপ ধরলেও ধরতে পারে, কারণ উজান স্রোতে দিন দিন এ জাতির জীবননদী কুলপ্লাবীই তো করে আনছে। সেই তেজস্বী মেয়ে তার ২।৩ শ' বই আমাদের পড়তে দিয়েছিলেন, সেইটি ছিল আমাদের পলিটিক্যাল লাইব্রেরী' (পৃঃ ৫)। বারীন্দ্রকুমারের এই স্বীকারোক্তির পর আমাদের আর সন্দেহ থাকে না যে পুলিশের ভয়েই বিপিনচন্দ্র অর্ধ-শত বৎসর

অতীত হলেও কোন গুপ্তসমিতির নাম-ঠিকানা তাঁর রচনায় প্রকাশ করেন নি।

(৯) 'In his irrepressible zeal for promoting the cause of motherland, Jyotirindranath took the initiative in establishing about 1877 what may be considered as the first secret society in Bengal.'—'Freedom Movement in Bengal, 1818-1904, Who's Who' (1968) Complier and Editor, Nirmal Sinha, M A p 381

(১০ 'Rabindranath has left a well-known account of the secret society game as played by the young Tagore's in the 1870's with Jyotirindranath as leader and Rajnarain Basu, the principal source of inspirtion ; while Surendranath's lectures on Mazzini seem to have led to some attempts to imitate the carbonari among the students of Calcutta'—'The Swadeshi Movement in Bengal, 1903-1908' (March, 1977) Sumit Sarkar, p. 468.

(১১) (ক) 'Secret Societies of amateurish type existed in Calcutta during the seventh decade of the 19th century. In addition to those formed in imitation of the carbonari of Italy, mentioned above, we hear of another started by Rajnarain Bose which initiated young Rabindranath and his elder brother into the vow of achieving India's freedom'—'History of the Freedom Movement in India, Vol-1' Second Revised Edition, (1971) R. C. Mazumder. p 396

(খ) '...স্বাধীনতাকামী যুবসমাজ প্রেরণা লাভ করিয়া বিপ্লবী মাৎসিনীর 'কার্বোনারি'র অনুকরণে দেশের স্থানে স্থানে গুপ্ত সভার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ১৮৭৭ সনে (?) যুবক জ্যোতিরিন্দ্রনাথও ঠনঠনের এক পোড়োবাড়িতে হামচুপামুহাফ্ বা সঞ্জীবনী সভা নামে এই ধরণের একটি গুপ্তসভা স্থাপন করেন। ইহার সভাপতি ছিলেন—স্বদেশপ্রেমিক বৃদ্ধ

রাজনারায়ণ বসু'। 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর' (তৃতীয় মুদ্রণ, বৈশাখ, ১৩৮৪) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (পৃঃ ৩০-৩১)।

(১২) 'বিপিনচন্দ্র পাল তাঁর ইংরেজি আত্মজীবনীতে একটি 'সমিতি'-র কথা উল্লেখ করেছেন, যার সভ্যগণ তরবারির অগ্রভাগ দ্বারা বক্ষঃস্থল ছিন্ন করে রক্ত বার করতেন ও সেই রক্তে অঙ্গীকার পত্রে নিজ নিজ নাম স্বাক্ষর করতেন। তাঁর বর্ণনা থেকে মনে হয় তিনি সঞ্জীবনী সভার কথাই বলেছেন'।—'রবীন্দ্র সাহিত্যের আদিপর্ব' (১৯৭৮) সংঘমিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায়। পৃঃ ২৬২

(১৩) 'Bengal Library Catalogue, Third Quarter ending 30th September, 1912' (p 4)

(১৪) 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন স্মৃতি' রচনাটি 'ভারতী' পত্রিকার ১৩২১ সালের বৈশাখ থেকে ফাল্গুন পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়, এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'পরামর্শ' অনুসারে প্রকাশিত ১১টি কিস্তি রচনার 'বহুল অংশ' 'পরিবর্ধিত, পরিবর্জিত এবং পরিবর্তিত' হয়ে ১৩২৮ সালের ফাল্গুন মাসে 'শ্রী বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত' 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি' গ্রন্থ নামে প্রকাশিত হয়। 'ভারতী' পত্রিকার প্রথম কিস্তিতেই রচনাটির পাদটীকায় জানানো হয়েছিল, 'এই প্রবন্ধে যাহা লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নিকট হইতে কথা প্রসঙ্গে সংগৃহীত। অনেক স্থলে কোটেশন চিহ্ন দ্বারা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মুখের কথা অবিকল উদ্ধৃত করা হইয়াছে'।

(১৫) 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি' ধারাবাহিকভাবে 'ভারতী'তে প্রকাশিত হবার চার-পাঁচ বৎসর পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশকালে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কর্তৃক রচনাটির আদ্যোপান্ত দেখা এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শাদি দেওয়ার পরেও বাক্য-ত্রুটির গ্রন্থ-মধ্যে ঠিক ওই ভাবে, অর্থাৎ 'কোটেশন চিহ্ন' বিহীন অবস্থায় হুবহু ব্যবহারে [পৃঃ ১৬৬ দ্রষ্টব্য] জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সম্মতি জ্ঞাপন করে। পত্রিকায় প্রকাশিত রচনাগুলির সঙ্গে গ্রন্থের যে প্রধান পার্থক্য চোখে পড়ে তা হল, পত্রিকায় প্রকাশিত ক্রমিক সংখ্যার [অর্থাৎ ১, ২, ৩ ইত্যাদির] বদলে গ্রন্থে প্রত্যেক পরিচ্ছেদের বিষয়বস্তু-জ্ঞাপক শীর্ষ নাম দেওয়া হয়েছে। পত্রিকার ১৩২১ অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত '৮নং' রচনাটির নাম গ্রন্থে হয়েছে 'শিল্প-বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ, 'ভারতী' ও 'বালক' এবং 'সারস্বত-সম্মিলনী'।

(১৬) সাপ্তাহিক 'বিজলী' পত্রিকার ২৩শে অগ্রহায়ণ ১৩২৮ (৯ই ডিসেম্বর, ১৯২১) সংখ্যায় বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষের 'বোমার কথা' নামক একটি রচনা 'বিজলী'র দ্বিতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যা থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবার বিজ্ঞাপন দেওয়া হলেও 'বোমার কথা' নামের বদলে 'দ্বীপান্তরের পথে' নামে রচনাটি নির্দিষ্ট সংখ্যায় প্রকাশিত না হয়ে কিছু পরে ২২শে পৌষ, ১৩২৮ (৬ই জানুয়ারী, ১৯২২) সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। অতঃপর ৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯ (১৯শে মে ১৯২২) সংখ্যায় 'দ্বীপান্তরের দুচার কথা' প্রকাশিত হবার পর পরবর্তী আটটি সংখ্যায় রচনাটি আর প্রকাশিত হয় নি। দু মাস বাদ দিয়ে রচনাটি 'বোমার যুগের কাহিনী, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ' রূপে ৫ই শ্রাবণ, ১৩২৯ (২১শে জুলাই, ১৯২২) সংখ্যা থেকে পুনরায় প্রকাশিত হতে থাকে। তবে পরবর্তী সংখ্যাগুলিতেও তা নিয়মিত প্রকাশিত হয় নি, যেমন ১লা ভাদ্র, ১৩২৯ এর পর ৮ই ভাদ্র, ১৩২৯ সংখ্যায় তা প্রকাশিত হয় নি, ইত্যাদি।

(১৭) 'জীবন স্মৃতি' (চৈত্র, ১৩৫২) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (পৃঃ ১৩৩)

(১৮) ঐ, (পৃঃ ২০৭)

(১৯) ঐ, (পৃঃ ১৪৮)

(২০) স্বর্ণকুমারী দেবীর এই উপন্যাস 'স্নেহলতা' নামে 'ভারতী ও বালক' পত্রিকায় ১২৯৬ সালের বৈশাখ মাস থেকে ১২৯৬ সালের ফাল্গুন মাস পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। এক মাস (চৈত্র, ১২৯৬) বাদ দিয়ে উপন্যাসটির বাকি অংশ 'পালিতা' নামে ১২৯৭ সালের বৈশাখ থেকে ১২৯৮ সালের জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। পরে 'স্নেহলতা' নামে দুই খণ্ডে উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৮৯২ ও ১৮৯৩ সালে।

(২১) 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর' (বৈশাখ ১৩ ৪) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (পৃঃ ৩৬-৩৭)

(২২) ফরাসী দার্শনিক Victor Cousin (1792-1867) রচিত গ্রন্থটির নাম 'du vrai, du beau et du bien' (1836)। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর 'পিতৃদেব সম্বন্ধে আমার জীবনস্মৃতি' রচনায় এটিকে 'Le vrai, le beau, le bien' রূপে উল্লেখ করেছেন। গ্রন্থটির নাম জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-সম্পর্কিত জীবনী-গ্রন্থগুলিতে [মন্মথনাথ ঘোষের 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ', বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি,' ব্রজেন্দ্রনাথ

বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ', সুশীলরায়ের 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ'], এমনকি 'ভাবতী' পত্রিকার ১৩১৮ মাঘ সংখ্যায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-অনূদিত গ্রন্থটির সমালোচনা কালেও নামহীন সমালোচক কর্তৃক উল্লিখিত হয়নি। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর উক্ত রচনায় গ্রন্থটির অনুবাদের পিছনে যে একটি ইতিহাস আছে, তা উল্লেখ করেছেন এই ভাবে : 'কোন সময়ে পিতৃদেব সাহেবগঞ্জে গঙ্গাবক্ষে বজরায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। কোন বিষয়কর্ম উপলক্ষে সেই সময়ে তাঁহার সহিত আমি সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। বজরার মধ্যে গিয়া দেখি, টেবিলের উপর দুই-চারি খানা বাঁধান ফরাসী গ্রন্থ, আর একখানি ফরাসি-ইংরাজি অভিধান রহিয়াছে। ঐ গ্রন্থগুলি Victor Cousin-র প্রসিদ্ধ গ্রন্থ Le vrai, le beau, le bien'—অর্থাৎ 'সত্য সুন্দর, মঙ্গল'। উহার ইংরাজি অনুবাদ পাঠ করিয়া তাঁহার এতই ভাল লাগিয়াছিল যে ফরাসী মূল-গ্রন্থ পড়িবার জন্য তিনি উৎসুক হইয়াছিলেন। তাই তিনি কয়েক কাপ বিলাত হইতে আনাইয়াছিলেন।...আমি যখন গেলাম, তখন তিনি ইংরাজি অনুবাদের সহিত মিলাইয়া, অভিধানের সাহায্যে ঐ গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতেছিলেন। মধ্যে মধ্যে যে অংশ বুঝিতে পারিতেছিলেন না, আমাকে তাহার অর্থ ব্যাখ্যা করিতে বলিলেন। কারণ, তিনি জানিতেন, আমি অল্প-স্বল্প ফরাসী জানি।......ঐ গ্রন্থ পাঠ করিবার জন্য আমার ঔৎসুক্য হইলেও সে সময়ে আমি পাঠ করিবার অবসর পাই নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর [দেবেন্দ্রনাথের মৃত্যু—১৯শে জানুয়ারী, ১৯০৫] ঐ কীটদষ্ট গ্রন্থ বোলপুরের লাইব্রেরী হইতে আনাইয়া পাঠ করি ও অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হই।' (প্রবাসী, মাঘ, ১৩১৮, পৃঃ ৩৮৭)

(২৩) 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি' (ফাল্গুন, ১৩২৬) বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। (পৃঃ ১৬৭)

(২৪) 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি'-তে 'গুপ্তসভা'গৃহের 'ভাঙ্গা ছোট টেবিল একখানি, কয়েকখানি ভাঙ্গা চেয়ার ও আধখানা ছোট টানা পাখা—তারও আবার একদিকে ঝুলিয়া পড়িয়াছে', বলে যে বর্ণনা পাই, তা রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি' বা 'আত্মপরিচয়' গ্রন্থদ্বয়ে নেই। আবার 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি'তে প্রাপ্তব্য 'লাল রেশমে জড়ান বেদমন্ত্রের একখানা পুঁথি...... টেবিলের দুই পাশে দুইটি মড়ার মাথা......তাহার দুইটি চক্ষু কোটরে

মোমবাতি বসান···সভার প্রারম্ভে বেদমন্ত্র······'সংগচ্ছধ্বম্ সংবদধ্বম্'। সকলে সমস্বরে এই বেদমন্ত্র গান করার পর তবে তবে সভার কার্য······ আরম্ভ হইত'। রবীন্দ্রনাথের দুটি গ্রন্থের কোনটিতেই এসবের কিছুই পাওয়া যায় না। তাঁর 'আত্মপরিচয়' গ্রন্থে 'ঋগ্‌বেদের পুঁথি মড়ার মাথার খুলি'-র উল্লেখ থাকলেও সঙ্গে সঙ্গে সেখানে যে 'খোলা তলোয়ার'-এর প্রসঙ্গ আছে, তা 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি'-তে নেই। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথের 'জীবন স্মৃতি'-তে 'শিকারী দলের' মানিকতলার 'পোড়োবাগানে' ঢুকে 'পুকুরের বাঁধানো ঘাটে' বসে 'মুহূর্তের মধ্যে' 'বৌঠাকুরানী' কর্তৃক প্রস্তুত 'রাশীকৃত লুচি-তরকারি' নিঃশেষ করে যে তাঁরা শিকারান্তে 'ফিরিবার পথে' একটা বাগানের 'মালি'-কে ধোঁকা দিয়ে 'ব্রহ্মবাবু'-র সকলকে ডাবের জল খাওয়ানোর যে বর্ণনা পাই, তা 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি'-তে অনুপস্থিত। কাপড়ের কলে পোষাবিধি কাপড়ের বদলে 'গামছা' উৎপন্নের কথা উভয়ত্র উল্লিখিত হলেও রবীন্দ্রনাথ-কথিত 'অল্প বয়স্ক বালক'-এর সন্ধান আমরা 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি'-তে পাই না। অপরাহ্নে ঝড়ের মধ্যে বৃদ্ধ রাজনারায়ণের কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের 'আজি উন্মদপবনে' গানের যে কথাগুলি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বসিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথের 'জীবন স্মৃতি'-তে তাঁর এই গানের ইঙ্গিত মাত্রও নেই।

(২৫) পরিণত বয়সে স্মৃতি চারণ প্রসঙ্গে পরিহাসের সঙ্গে বললেও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যে সত্যকথাই বলেছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, 'আমার অসাধারণ উদ্ভাবনী শক্তির প্রশংসায় সভা গৃহে তুমুল কোলাহল উত্থিত হইল'— 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি' (ফাল্গুন, ১৩২৬), পৃঃ ১৬৮।

(২৬) সংবাদটি 'রবি-জীবনী' লেখক প্রশান্তকুমার পালের অবশ্যই জানা আছে বলে মনে করি, তবে তিনি মূল উৎসের বদলে 'বসুমতী সং' শব্দ দুটি ব্যবহার করায় একধরণের অস্পষ্টতার সৃষ্টি হয়েছে।

(২৭) 'আর্য দর্শন' পত্রিকায় মাঝে মাঝে পত্রিকাটির গ্রাহকদের নামের তালিকা প্রকাশিত হোত। ১২৮২ সালের কার্তিক সংখ্যার একেবারে শেষে এইরূপ মুদ্রিত তালিকা '১২৮২ সালের ভাদ্র হইতে কার্তিক পর্যন্তের মূল্য প্রাপ্তি' অংশে 'দং ১২৮১ সাল'-এর গ্রাহক তালিকায় ৬ষ্ঠ নামটি হোল 'বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কলিকাতা—৪॥, অর্থাৎ সাড়ে চার টাকা লেখা আছে। 'আর্যদর্শন'-এর বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ছিল তিনটাকা। সুতরাং

এখানে দেখা যাচ্ছে দ্বিজেন্দ্রনাথ একসঙ্গে দেড় বৎসরের [১২৮১ সালের ভাদ্র থেকে ১২৮২ সালের মাঘ পর্যন্ত] গ্রাহক মূল্য জমা দিয়েছিলেন। আবার, ১২৮৫ সালের পৌষ সংখ্যার শেষে 'মূল্য প্রাপ্তি স্বীকার' অংশে '১২৮৫ সাল'-এর যে গ্রাহক তালিকা মুদ্রিত হয়েছে, তাতে 'বাবু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর—৩১' 'অর্থাৎ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কর্তৃক এক বৎসরের গ্রাহক মূল্য জমা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এমন কি কর্ম-সূত্রে ভিন্ন প্রদেশবাসী হলেও সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরও যে পত্রিকাটির নিযমিত গ্রাহক ছিলেন, তার প্রমাণও এই প্রকার গ্রাহক-তালিকা থেকে পাওয়া যায়। যেমন—১২৮৩ সালের বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত গ্রাহক-তালিকা 'দং ১২৮১ সাল'-এর গ্রাহক-তালিকায় 'শ্রীযুক্ত বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর বম্বে—৩।৶.' ; 'দং সন ১২৮২ সাল'-এর তালিকায় 'শ্রীযুক্ত বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বোম্বে—৩।৶.' ; 'দং ১২৮৩ সাল'-এর তালিকায় 'শ্রীযুক্ত বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বোম্বে—৩।৶.'। বার্ষিক তিন টাকার উপর ছয় আনাটি হোল 'ডাক মাশুল', অর্থাৎ ডাকে পাঠাবার খরচ, যেটি গ্রাহককে অগ্রিম দিতে হোত। এই সঙ্গে আমরা আরো মনে রাখতে পারি যে, কিশোর কবি রবীন্দ্রনাথের 'ফুলবালা' 'গীতিকা'র কিয়দংশ 'আর্যদর্শন' পত্রিকার ১২৮৩ সালের চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

(২৮) প্রশান্তকুমার পাল তাঁর 'রবি জীবনী, প্রথম খণ্ড,' (১লা বৈশাখ, ১৩৮৯) গ্রন্থের ৩০২ পৃষ্ঠায় যে সংবাদ দিয়েছেন, 'যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ ভাদ্র, ১২৮২ (Aug-Sept, 1876) থেকে 'আর্যদর্শন' পত্রিকায় 'জোসেফ ম্যাটসিনি ও নব্য ইতালী' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করেন', এই সংবাদের মধ্যে দুটি ভুল আছে। প্রথমতঃ, যোগেন্দ্রনাথের এই রচনাটি ঠিক 'ধারাবাহিক ভাবে' প্রকাশিত হয় নি। ১২৮২ সালের ভাদ্র সংখ্যায় 'জোসেফ ম্যাট সিনি ও নব্য ইতালী' নামে রচনাটির প্রথম কিস্তি প্রকাশিত হবার পর আশ্বিন মাসে এটি প্রকাশিত হয়নি, অর্থাৎ রচনাটির দ্বিতীয় কিস্তি প্রকাশিত হয় কার্তিক মাসে। এবং এই প্রকার অনিয়মিত ভাবে কুড়িটি সংখ্যায় রচনাটির দ্বাদশটি অধ্যায়ের প্রকাশ সম্পূর্ণ হয় ১২৮৪ সালের চৈত্র সংখ্যায়। ঐ সংখ্যায় রচনাটির শেষে 'প্রথম খণ্ড সমাপ্ত' বলে ঘোষণা করা হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ, রচনাটি 'জোসেফ ম্যাট্‌সিনি ও নব্য ইতালী' এই শীর্ষনাম নিয়ে আগাগোড়া প্রকাশিত হয় নি, অর্থাৎ প্রথম সংখ্যার (ভাদ্র, ১২৮২)

পরবর্তী ১২৮৪ সালের চৈত্র পর্যন্ত সমস্ত সংখ্যায় 'জোসেফ' শব্দটি বাদ দিয়ে 'ম্যাট্‌সিনি ও নব্য ইতালী' নামে প্রকাশিত হয়েছে। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে রচনাটি যখন প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়, তখন গ্রন্থটির নাম ছিল 'ইতালীর ইতিবৃত্ত সম্বলিত ম্যাটসিনির জীবনবৃত্ত'। [ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'সাহিত্য সাধক চরিত মালা'-ন্তর্গত 'যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ (ভাদ্র, ১৩৬৮) পুস্তিকার ১৬ পৃষ্ঠায় এটিকে 'ম্যাট্‌সিনির জীবনবৃত্ত' বলে উল্লেখ করেছেন।] যোগেন্দ্রনাথের মৃত্যুর [১২ই জুন, ১৯০৪] পূর্বে গ্রন্থটির আর কোন সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল কিনা তা অনুসন্ধান করেও আমরা জানতে পারিনি (যোগেন্দ্রনাথের জীবিত পৌত্র শ্রীযুক্ত নীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও এ বিষয়ে আমাদের কোন সংবাদ দিতে পারেন নি), তবে যোগেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর বাংলা ১৩১৪ সালে 'কলিকাতা ধন্বন্তরি ষ্টীম মেসিন প্রেসে শ্রী নীরদবরণদাস দাস দ্বারা মুদ্রিত' হয়ে গ্রন্থটির যে সংস্করণ প্রকাশিত হয়, তার নাম 'জোসেফ ম্যাট্‌সিনি ও নব্য ইতালী'। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর পূর্বোক্ত পুস্তিকার ১৯-পৃষ্ঠায় 'যোগেন্দ্র গ্রন্থাবলী, ১৩১৫ সাল'-এর তলায় 'হিতবাদী কার্যালয়' লিখে যা বলতে চেয়েছেন, অর্থাৎ 'হিতবাদী কার্যালয়' থেকে 'যোগেন্দ্র গ্রন্থাবলী' প্রকাশিত হয়েছিল বলে যে-সংবাদ দিতে চেয়েছেন, সে সংবাদটি ভুল। 'হিতবাদী কার্যালয়' থেকে যোগেন্দ্র গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হয় নি। যা হয়েছিল তা গ্রন্থাবলীটির আখ্যাপত্রেই প্রকাশিত—'যোগেন্দ্র গ্রন্থাবলী। কলিকাতা হিতবাদীর ইলেকট্রিক যন্ত্রে শ্রীনীরদবরণ দাস দাস দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সন ১৩১৫ সাল।' মজার ব্যাপার হোল এই যে, এই গ্রন্থাবলীতে সঙ্কলিত যোগেন্দ্রনাথের সকল রচনাই হিতবাদীর ইলেকট্রিক যন্ত্রে যেমন মুদ্রিত হয় নি, তেমনি ১৩১৫ সালেও মুদ্রিত হয়নি। এই গ্রন্থাবলীর দ্বিতীয় রচনা 'জোসেফ ম্যাট্‌ সিনি ও নব্য ইতালী' পূর্ববৎসর, অর্থাৎ ১৩১৪ সালে 'ধন্বন্তরি ষ্টীম মেসিন প্রেসে শ্রীনীরদবরণ দাস দাস দ্বারা মুদ্রিত' হলেও সেই অংশটি এই গ্রন্থাবলীর মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে।

(২৯) ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ২রা এপ্রিল 'উত্তরপাড়া হিতকরী সভা'য় 'Joseph Mazzini' সম্পর্কে বক্তৃতা প্রসঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সেভোনা দুর্গে বন্দী ম্যাট্‌সিনির অবস্থা বর্ণনা করেছেন এই ভাবে, 'Mazzini was confined in the top most storey of the fortress Before

him lay the the illimitable expanse of the occean, above him was the vaulted canopy of heaven. With these dread symbols of eternity before him, Mazzini lay brooding in his prison-cell over the misfortunes of his country'. —'Speeches of Babu Surendranath Banerjea, 1876-80' (1880) Ed. by R. C. Palit, p. 80

(৩০) 'It appears to have been established during the reactionary Government of Lord Lytton about the year 1876' —'Indian Political Associations and Reforms of Legislature 1818-1917' (Nov, 1965) B. B. Majumder, p 95.

(৩১) লীটনের কার্যকে প্রশংসা করে ইংরেজশাসন-বিদ্বেষী 'Amrita Bazar Patrika' ১৮৭৬ সালের ২৭শে জুলাই তারিখে লিখেছিল, 'Lord Lytton has surprised the Indian world by his generosity ......he has condemned the action of a Magistrate who let off a homicide with a nominal fine'. ১৮৭৬ সালের ২৪শে জুলাই বোম্বাইয়ের 'Indu Prakash' পত্রিকা লিখেছিল, 'A praiseworthy attempt of Lord Lytton to preserve the good name of British justice' ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে জুলাই গুজরাটি পত্রিকা 'Swadesh Mitra' বলেছিল, 'A voice from the Heavens'

[উদ্ধৃতি তিনটি শ্রীমতী উমা দাশগুপ্তের 'Rise of an Indian Public' [October, 1977) গ্রন্থের ২৫৭ পৃষ্ঠা থেকে সঙ্কলিত ।]

(৩২) (ক) 'Speeches of Babu Surendranath Banerjea, 1880-84, Vol-II'. 2nd ed, 1891, Ed. by R. C. Palit, p 100.

(খ) 'Hundred years of the University of Calcutta' (January, 1957), pp 107-108.

(৩৩) 'Frightened by the success of the Civil Service agitation, a full-fledged reactionary Government was in action'. 'History of the Indian Association' (? 1953) Joges Chandra Bagal, p.32.

(৩৪) 'জীবনস্মৃতি' (পুনর্মুদ্রণ, চৈত্র, ১৩৪৪)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (পৃঃ ১৫৩)

(৩৫) ঐ, (পৃঃ ঐ)

(৩৬) 'Freedom Movement in Bengal, 1818-1904. Who's Who' (1968), Compiler & Editor, Nirmal Sinha, p 280.

(৩৭) 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি' (ফাল্গুন, ১৩২৬) বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত (পৃঃ ১৬৬)

(৩৮) জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বলেছেন, 'সরোজিনী প্রকাশের (প্রকাশকাল : ৩০শে নভেম্বর, ১৮৭৫) পর হইতেই, আমরা রবিকে প্রমোশন দিয়া আমাদের সমশ্রেণীতে উঠাইলাম'। 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি'। পৃঃ ১৫১)

(৩৯) 'সম্ভবতঃ' শব্দটি ব্যবহারের কারণ গেল সাম্প্রতিককালে রবীন্দ্রজীবনের বিস্তৃত ইতিহাস নিয়ে প্রকাশিত প্রশান্তকুমার পাল মহাশয়ের 'রবিজীবনী, ১ম খণ্ড' (১লা বৈশাখ ১৩৮৯) গ্রন্থেও রবীন্দ্রনাথ ঐ সময়ে কোনো স্কুলের ছাত্র ছিলেন কিনা, সে সংবাদ পাওয়া যায় নি : তবে, আমাদের অনুমানের পক্ষে 'গুপ্ত সভা'টি প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথেরই একটি উক্তি উদ্ধার করছি, 'আমরা মধ্যাহ্নে কোথায় কী করিতে যাইতেছি তাহা আমাদের আত্মীয়েরা জানিতেন না' (পৃঃ ১৪৮)। যে-সময়টিকে আমরা 'গুপ্ত সভা'টির আয়ুষ্কাল [মোটামুটি ১৮৭৬-এর শেষ থেকে ১৮৭৭-এর মে-জুন] বলে গ্রহণ করেছি, সেই সময়-কালটিতে বড়দিন, সরস্বতী পূজা, দোল, চৈত্রসংক্রান্তি ইত্যাদি দুচার দিনের ছুটিছাটা বাদ দিলে কলকাতার স্কুল-কলেজগুলি পুরোদমেই চালু ছিল। এমন অবস্থায় প্রায়ই বা প্রতিদিন (রবীন্দ্রনাথ-ব্যবহৃত 'যাইতেছি' শব্দটি লক্ষণীয়) মধ্যাহ্নকালে রবীন্দ্রনাথের বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়া দেখে এরূপ অনুমানই স্বাভাবিক যে রবীন্দ্রনাথ ঐ সময়ে কোনো স্কুলেরই ছাত্র ছিলেন না !

(৪০) 'শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী' (৩য় সংস্করণ, ১৯২৭) শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্তী কর্তৃক সম্পাদিত। (পৃঃ ১১১)।

(৪১) 'He was a Brahmo, closely connected with the Tagore family'—'Indian Awakening and Bengal' (3rd ed, 1976) Nemai Sadhan Bose, (p. 264.)

(৪২) 'আমার বাল্যকথা'—সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। 'ভারতী', আশ্বিন, ১৩১৯ (পৃঃ ৬৫৩)। 'আমার বাল্যকথা' সত্যেন্দ্রনাথের এই স্মৃতিচারণটি 'ভারতী' পত্রিকার ১৩১৯ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা থেকে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত

হয়। এর পর 'আমার বোম্বাই প্রবাস' অংশটিও ঐ পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয় এবং দুটি রচনাই একসঙ্গে 'আমার বাল্যকথা ও আমার বোম্বাই প্রবাস—সচিত্র' নামে ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

(৪৩) 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর' (মহর্ষির সার্ধ-শতবর্ষ পূর্তি উৎসব উপলক্ষে সংস্করণ, ৬ই মাঘ, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ) অজিতকুমার চক্রবর্তী। (পৃঃ ৩৩৫)

(৪৪) 'জীবনস্মৃতি' (চৈত্র, ১৩৪৪), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (পৃঃ ১৪৬)।

(৪৫) আলোচ্য সময়কালে ব্রজনাথ দে মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউশনের সঙ্গে কিভাবে যুক্ত ছিলেন, সে বিষয়ে বিভিন্ন লেখকের রচনায় বিভিন্ন উল্লেখ পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের 'জীবন স্মৃতি'-তে (পৃঃ ১২১) তিনি 'মেট্রোপলিটান কলেজের সুপারিন্টেন্ডেন্ট'; সরলাদেবীর 'জীবনের ঝরাপাতা' (ফাল্গুন, ১৮৭৯ শকাব্দ] গ্রন্থে (পৃঃ ১৫) তিনি 'মেট্রপলিটনের হেডমাষ্টার'; প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রজীবনী, ১ম খণ্ড' [৪র্থ সংস্করণ, ১৩৭৭] গ্রন্থে (পৃঃ ৪৪) তিনি 'মেট্রোপলিটান স্কুলের শিক্ষক'; চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিদ্যাসাগর' [ষষ্ঠ সংস্করণ, ১৯২৩] গ্রন্থে [পৃঃ ৩৮০, পাদটীকা] তিনি 'মেট্রপলিটনের শিক্ষক'; প্রশান্তকুমার পালের 'রবিজীবনী, ১ম খণ্ড' [১লা বৈশাখ, ১৩৮৯] গ্রন্থে দু'বার [পৃষ্ঠা ২১০ ও ৩০১] তিনি 'মেট্রোপলিটান স্কুলের সুপারিন্টেন্ডেন্ট' এবং একবার (পৃঃ ২৯২) 'মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউশনের সুপারিন্টেন্ডেন্ট' রূপে উল্লিখিত হয়েছেন। এ বিষয়ে 'বিদ্যাসাগর কলেজ শতবর্ষ স্মরণিকা' (আগষ্ট, ১৯৭৫) গ্রন্থের 'মেট্রো পলিটান ইনষ্টিটিউশনের ইতিহাস' শ্রীসুরেশপ্রসাদ নিয়োগী লিখিত] রচনাটি পড়লে দেখা যায় যে, ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাস থেকে সেখানে যখন এফ্.এ ক্লাশ চালু হয়, তখন বিভিন্ন স্থান থেকে 'সংগ্রহ' করে যে ছয় জন ব্যক্তিকে বিদ্যাসাগর 'অধ্যাপক' পদে নিযুক্ত করেন, তাঁদের মধ্যে একজন হচ্ছেন এই ব্রজনাথ দে। (পৃঃ ৩৭০) সম্ভবতঃ এর তিন-চার-বছর বাদে, অর্থাৎ গুপ্ত সভাটির আয়ুষ্কালে, অধ্যাপনা ছাড়াও 'স্কুল' বা 'কলেজ' বিভাগের, (হয়ত বা এক সঙ্গে দুইটিরই) 'সুপারিন্টেন্ডেন্ট' হিসাবে কিছু প্রশাসনিক দায়িত্ব ব্রজনাথকে বহন করতে হয়েছিল।

(৪৬) 'বিদ্যাসাগর কলেজ শতবর্ষ স্মরণিকা' (আগষ্ট, ১৯৭৫) গ্রন্থ-ধৃত পূর্বোক্ত 'মেট্রোপলিটান ইন্সটিটিউশনের ইতিহাস' রচনাটিতে দেখা যায় যে ব্রজনাথের মতো রামসর্বস্ব ভট্টাচার্যকেও বিদ্যাসাগর মহাশয় ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে এফ্.এ

ক্লাশে পড়াবার জন্যে 'অধ্যাপক' পদে নিযুক্ত করেছিলেন। (পৃঃ ৩৭০)

(৪৭) 'জীবনের ঝরাপাতা' (ফাল্গুন, ১৮৭৯ শকাব্দ) সরলা দেবী। (পৃঃ ১৫)

(৪৮) বহু-বিজ্ঞাপিত 'বোমার যুগের কথা' রচনাটি নির্দিষ্ট সময়ের কিছু পরে 'বিজলী'র দ্বিতীয় বর্ষ অষ্টম সংখ্যা [২২শে পৌষ, ১৩২৮, ইং ৬ই জানুয়ারী, ১৯২২] থেকে 'দ্বাপান্তরের পথে' নামে প্রকাশিত হতে শুরু করে। মধ্যে দুটি সংখ্যা [১৮ ও ২১ সংখ্যা] বাদ দিয়ে ২৭ সংখ্যায় [৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯, ইং ১৯শে মে, ১৯২২] 'দ্বীপান্তরের দু'চার কথা' শীর্ষক অধ্যায় প্রকাশে রচনাটি সমাপ্ত হয়। ঠিক দুমাস পরে, আটটি সংখ্যা বাদ দিয়ে, ৩৬ সংখ্যা [৫ই শ্রাবণ ১৩২৯, ইং ২১শে জুলাই, ১৯২২] থেকে 'দ্বীপান্তরের কথা' নামটি পরিবর্তিত হয়ে 'বোমার যুগের 'কাহিনী', 'দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, পূর্ব প্রকাশিতের পর' এই প্রকারে চিহ্নিত হয়ে প্রকাশিত হতে শুরু করে। তবে এ রচনাটিও ঠিক ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় নি, মাঝে মাঝে দু একটা সংখ্যা বাদ গেছে, যেমন ৪১ সংখ্যা [৮ই ভাদ্র, ১৩২৯, ইং ২৫ আগষ্ট, ১৯২২], ৫১ সংখ্যা [২৪শে কার্তিক, ১৩২৯, ইং ১০ই নভেম্বর, ১৯২২] ইত্যাদি।

(৪৯) 'বিজলী' পত্রিকার দ্বিতীয়বর্ষ, প্রথম সংখ্যার [২রা অগ্রহায়ণ, ১৩২৮, ইং ১৮ই নভেম্বর, ১৯২১] --পৃষ্ঠায় বারীন্দ্রকুমার ঘোষ-স্বাক্ষরিত 'লেখকের কৈফিয়ৎ'-অংশে বারীন্দ্রকুমার লিখেছেন, 'আমরা মরা মানুষের পর্যন্ত নাম সাবধানে করবো, যাঁরা প্রাণে প্রাণে বেঁচে গিয়ে গোলে হরিবোল হয়ে আছেন এ কাহিনী তাঁদের বেপর্দা করবে না।' বস্তুতঃ বারীন্দ্রকুমার তাঁর রচনায় পরলোকগত ব্যক্তিদের নাম উল্লেখ করেন নি, এবং জীবিত ব্যক্তিদের সম্পূর্ণ নাম উল্লেখ না করে নামের আদ্যাক্ষরগুলি ব্যবহার করেছেন, যেমন 'য-দা', অর্থাৎ যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পরবর্তীকালের নিরালম্ব স্বামী [১৮৭৭-১৯৩০], 'আড়বালিয়ার 'অ' বি', অর্থাৎ অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য [১৮৮২-১৯৬২], 'তখনকার একজন লব্ধকামা ব্যারিষ্টার, এখন দেহরক্ষা করেছেন,' অর্থাৎ 'অনুশীলন সমিতি'র সভাপতি ব্যারিষ্টার প্রমথনাথ মিত্র [১৮৫৩-১৯১০], যিনি 'পি. মিত্তির' নামেই সমধিক খ্যাতছিলেন, ইত্যাদি।

(৫০) এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের উক্তি উদ্ধৃত করা যেতে পারে, 'আমাদের দলের মধ্যে বয়সে সকলের চেয়ে যে ব্যক্তি ছোটো তাহার সঙ্গেও তাঁহার বয়সের কোনো অনৈক্য ছিল না। তাঁহার বাহিরের প্রবীণতা শুভ্র মোড়কটির

মতো হইয়া তাঁহার অন্তরের নবীনতাকে চিরদিন তাজা করিয়া রাখিয়া দিয়াছিল। এমন কি, প্রচুর পাণ্ডিত্যেও তাঁহার কোনো ক্ষতি করিতে পারে নাই, তিনি একেবারেই সহজ মানুষটির মতোই ছিলেন। জীবনের শেষ পর্যন্ত অজস্র হাস্যোচ্ছ্বাস কোনো বাধাই মানিল না—না বয়সের গাম্ভীর্য, না অস্বাস্থ্য, না সংসারের দুঃখ কষ্ট, না মেধয়া না বহুলা শ্রুতেন কিছুতেই তাঁহার হাসির বেগকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারে নাই'। 'জীবনস্মৃতি' (পুনর্মুদ্রণ, চৈত্র, ১৩৪৪) পৃঃ ১৫৩-১৫৪।

(৫১) 'বিজলী' পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যায় প্রদত্ত 'লেখকের কৈফিয়ৎ' রচনায় বারীন্দ্রকুমার অবশ্য লিখেছেন, 'আমার স্মৃতি বার বছরের দেশান্তরী জীবনের কষ্টে ম্লান হয়ে গেছে। অনেক কথাই ভাঙ্গা ভাঙ্গা হয়ে আধ-ভোলা স্বপ্নের মত মনে মনে জাগছে।'

(৫২) বাংলা ১২৮৪ শ্রাবণ (জুলাই, ১৮৭৭) থেকে প্রকাশিত মাসিক 'ভারতী' পত্রিকার অর্ধশত বৎসরের আয়ুষ্কালে মাঝে মাঝে তার প্রকাশ বিশেষ অনিয়মিত হলেও ১৩১৫ সাল থেকে স্বর্ণকুমারী দেবী যখন দ্বিতীয়-বার 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদনা-ভার গ্রহণ করেন, 'তখন ভারতী আবার তার হৃত-গৌরব ফিরে পেল। ঠিক ১লা তারিখে কাগজ বের হওয়া, সেই সঙ্গে শ্রেষ্ঠ লেখকদের লেখায় ভারতীর পাতা ভরে উঠলো'—'ভারতী : ইতিহাস ও রচনাপঞ্জী' (অক্টোবর, ১৯৮৪)-সুনীল দাস। (পৃঃ ৪১) এই পর্বে স্বর্ণকুমারী দেবী ১৩২১ পর্যন্ত ছয় বৎসর 'ভারতী'র সম্পাদিকা ছিলেন।

(৫৩) পরবর্তী কালে রচিত জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনীগ্রন্থগুলি—বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি' (১৩২৬), মন্মথনাথ ঘোষের 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ' (১৩৩৪), ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর' (১৩৫৪), সুশীল রায়ের 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ' (১৩৭০) এদের কোনটিতেই রচনাটির নামমাত্রও উল্লিখিত হয় নি।

(৫৪) Bengal Library Catalogue, Third quarter ending 30th Semptember, 1912 p 118 যে মাসের পত্রিকা সেই মাসের ১লা তারিখে প্রকাশ করাই 'প্রবাসী'র একটা বড় বৈশিষ্ট্য ছিল। ১৩১৯ সালের ১লা শ্রাবণ ছিল ১৭ জুলাই, ১৯১২, বুধবার। সুতরাং Bengal Library Catalogue-কে মান্য করলে বলতে হয় 'প্রবাসী'র ১৩১৯

শ্রাবণ সংখ্যা নির্দিষ্ট তারিখের একদিন আগেই অর্থাৎ ৩১শে আষাঢ় প্রকাশিত হয়েছিল।

(৫৫) Bengal Library Catalogue, Third quarter ending 30th September 1912, p. 4.

(৫৬) Bengal Library Catalogue, Third quarter ending 30th September 1912 অনুযায়ী রবীন্দ্রনাথের 'ছিন্নপত্র' গ্রন্থের প্রকাশকাল ২৮শে জুলাই, ১৯১২ পৃ: ২৮) এবং 'অচলায়তন' গ্রন্থের প্রকাশকাল ২রা আগষ্ট, ১৯১২ (পৃ ৭)। 'জীবনস্মৃতি,' 'ছিন্নপত্র' এবং 'অচলায়তন'-এর মুদ্রাকরের 'printer') নাম রণগোপাল চক্রবর্তী এবং ঠিকানা—৫৫নং আপার চিৎপুর রোড, কলকাতা বলে এখানে উল্লিখিত হয়েছে। আসলে এই ঠিকানাটি হোল আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রেসের। সুতরাং প্রকাশকাল দেখে বুঝতে পারা যায় যে গ্রন্থ তিনটি এই প্রেসে এক সঙ্গেই মুদ্রিত হচ্ছিল।

(৫৭) অবশ্য রবীন্দ্রনাথ যে বারীন্দ্রকুমার ঘোষের 'বোমার যুগের কাহিনী' রচনাটি পড়েছিলেন, এমন কোন নিঃসংশয় প্রমাণ আমাদের হাতে নেই। তবে পত্রিকাটির সঙ্গে তাঁর যে কিঞ্চিৎ যোগাযোগ ছিল তার প্রমাণ আছে। 'বোমার যুগের কাহিনী' রচনাটি প্রকাশের বেশ কয়েকমাস আগে থেকে [১ম বর্ষ ৪৮ সংখ্যা, ২৮শে অক্টোবর, ১৯২১ থেকে] 'বিজলি'তে তা বিজ্ঞাপিত হতে থাকে। কিন্তু বিজ্ঞাপিত সময়ে প্রকাশিত হতে পারবে না এই মর্মে বারীন্দ্রকুমার 'শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি' নামক পত্রে [২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ২৫শে নভেম্বর, ১৯২১] এবং 'বিজলীর কর্মকর্তা' প্রদত্ত বিজ্ঞাপনে [২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ৯ই ডিসেম্বর, ১৯২১] 'বিশেষ বাধা'-র উল্লেখ রচনাটি সম্পর্কে জনচিত্তে ঔৎসুক্য সঞ্চার করে থাকবে বলে মনে হয়। যাই হোক, 'বিজলী'তে বারীন্দ্রকুমারের এই রচনাটি প্রকাশের পূর্বে এবং পরে বিজলীতে রবীন্দ্রনাথের রচনাদি প্রকাশের একটি তালিকা এখানে সঙ্কলন করে দিচ্ছে, তা থেকে পত্রিকাটির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগের পরিমাণ প্রকাশ পাবে—

১ম বর্ষ ৫০ সংখ্যার [২৫শে কার্তিক ১৩২৮, ১১ই নভেম্বর, ১৯২১]-১০ পৃষ্ঠায় উপরের দিকে একটা ঘর কেটে বড় বড় অক্ষরে লেখা 'আর্য পাবলিশিং হাউসের বই সম্বন্ধে শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট রবীন্দ্রনাথের পত্র'। অতঃপর রবীন্দ্রনাথের সেই পত্রটি মুদ্রিত হয়েছে এবং পরবর্তী অনেকগুলি সংখ্যায় সম্পূর্ণ এক পৃষ্ঠা ব্যাপী 'আর্য পাবলিশিং

হাউস' প্রকাশিত গ্রন্থ-তালিকার সঙ্গে এই পত্রটিও মুদ্রিত হয়েছে। ২য় বর্ষ ৩৩ সংখ্যা [৩০ জুন, ১৯২২] ১০ পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথের 'পুনরাবৃত্তি' নামক একটি রচনা প্রকাশিত হয়েছে এবং পাদটীকায় উৎকীর্ণ হয়েছে, 'প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯'। [মনে হয় রচনাটি প্রবাসী পত্রিকার সম্পাদক বা লেখকের অনুমতি নিয়েই এখানে পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল] ২য় বর্ষ ৩৯নং সংখ্যা [১১ই আগষ্ট, ১৯২২]-র ৬ পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ 'হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধান'—রচনার শেষে মুদ্রিত 'শান্তিনিকেতন, শ্রাবণ ১৩২৯'। এটিও 'শান্তিনিকেতন' পত্রিকা থেকে কবির অনুমতি নিয়েই পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল বলে মনে হয়। ২য় বর্ষ ৪৬ সংখ্যার' 'শারদীয় সংখ্যা' [২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৯২২] ৫ পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথের 'খেলা' কবিতা প্রকাশিত। ৩য় বর্ষ, ৪২ থেকে ৪৪ সংখ্যাত্রয়ে [৩১শে আগষ্ট থেকে ১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৩] দেশের তৎকালীন অবস্থা সম্পর্কে কবির অভিমত ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে [interview-এ] সংগ্রহ করে সাংবাদিক [৪৪ সংখ্যা থেকে 'বিজলী'র সম্পাদক নলিনীকান্ত সরকারের সঙ্গে যুগ্ম সম্পাদক] মৃণালকান্তি বসু 'রবীন্দ্রসদনে' নামে প্রকাশ করেন। ৩য় বর্ষ ৪৩ সংখ্যার [৭ই সেপ্টেম্বর ১৯২৩] ৭ পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথের দুটি 'গান' ['ভীরুকে ভয় দেখাবি···' এবং 'আমার আঁধার আলোর কাছে···'] মুদ্রিত। ৩য় বর্ষ ৪৮ সংখ্যা 'শারদীয় সংখ্যা' [১১ অক্টোবর, ১৯২৩]-র ১-৩ পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথের 'কৈফিয়ৎ' প্রবন্ধ এবং ৩০ পৃষ্ঠায় 'যাত্রা' কবিতাটি মুদ্রিত। কবিতাটির শেষে 'বঙ্গবাণী, কার্তিক' শব্দদুটি উৎকীর্ণ। [১৩৩০ সালের কার্তিক সংখ্যা 'বঙ্গবাণী' কি ২৫শে আশ্বিনের পূর্বেই প্রকাশিত হয়েছিল ?] ৪র্থ বর্ষ ১৫ সংখ্যা [১০ই ফাল্গুন, ১৩৩০]-র ৩১৫-৩১৬ পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথের 'যৌবনবেদনা রসে উচ্ছল আমার দিনগুলি' কবিতাটি মুদ্রিত। কবিতাটির শেষে মুদ্রিত 'প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩৩০'। ৪র্থ বর্ষ ১৭ সংখ্যা [২৪শে ফাল্গুন, ১৩৩০]-র ৩৫১ পৃষ্ঠায় রবীন্দ্র-নাথের 'গান' ['আমার শেষ পারাণীর কড়ি কণ্ঠে নিলাম গান···'] মুদ্রিত। ৪র্থ বর্ষ ১৮ সংখ্যা [১লা চৈত্র, ১৩৩০]-র ৩৮৩-৩৮৫ পৃষ্ঠায় 'অধ্যাপক মনোমোহন ঘোষ : রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধাতর্পণ' মুদ্রিত হয়েছে। পাদটীকায় লেখা আছে, 'শ্রীযুক্ত সুখেন্দুরঞ্জন রায়, এম্ এ মহাশয় কর্তৃক অনুলিখিত'। ['বিজলী'র সম্পূর্ণ file কোথাও পাই নি।]

(৫৮) রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থের ঠিক কতগুলি সংস্করণ হয়েছিল, তা বলতে পারছি না। এ বিষয়ে 'জীবনস্মৃতি'-র 'পুনর্মুদ্রণ, চৈত্র ১৩৪৪' সংস্করণের আখ্যা পত্রের অপর পৃষ্ঠায় যে তালিকাটি আছে, তা এই-রূপ : 'প্রথম সংস্করণ- বৈশাখ, ১৩১৯' (এটি ভুল, আমরা পূর্বেই 'জীবন-স্মৃতি'-র সঠিক প্রকাশ কাল পেয়েছি ২৫শে জুলাই, ১৯১২ অর্থাৎ ৯ই শ্রাবণ ১৩১৯) এর পর কতকগুলি * * * * তারকা চিহ্ন দেওয়া আছে। এই তারকা-চিহ্নিত শূন্য অংশগুলির দ্বারা 'জীবনস্মৃতি'র আরো কোন সংস্করণ বা পুনর্মুদ্রণ হয়েছিল কিনা, তা বুঝতে পারা যায় না। অতঃপর পাই 'পুনর্মুদ্রণ, মাঘ, ১৩৩৫ , পুনর্মুদ্রণ, মাঘ, ১৩৪০ , পুনর্মুদ্রণ, চৈত্র ১৩৪৪'। 'জীবনস্মৃতি'র ১৩৫২ সালের সংস্করণ থেকে জানতে পারা যায় যে '১৩৪৮ সালের অগ্রহায়ণ' মাসে গ্রন্থটির একটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তখন পরলোকে।

(৫৯) সামান্য দেশলাই কাঠি ও তার আলোক (অগ্নি) সৃষ্টির ক্ষমতাকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ এখানে যে মধুর পরিহাস সৃষ্টি করেছেন, ভিন্ন দেশে, ভিন্ন সময়ে ও ভিন্ন পরিবেশে দেশলাইয়ের এই ক্ষমতাকে নিয়ে পরিহাস প্রচেষ্টা কিভাবে একটা সুগঠিত মন্ত্রিসভার পতনের অন্যান্য কারণের মধ্যে একটি কারণে পরিণত হয়েছে , সে কথা এখানে প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করছি। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে Gladstone-মন্ত্রিসভার অর্থদপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ('Chancellor of the Exchequer' Mr Robert Lowe রাজস্ববৃদ্ধির জন্য উপস্থাপিত বাজেটে দেশলাইয়ের উপর সামান্য কর ধার্যের প্রস্তাব করেন এবং প্রত্যেক দেশলাই বাক্সের উপর 'Ex Luce Lucellum' এই শব্দ তিনটি মুদ্রিত করার কথা বলেন শব্দ তিনটির অর্থ হল 'A little profit out of light', আলো থেকে সামান্য আয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইংল্যাণ্ডে তুমুল আন্দোলন সুরু হয়ে গেল [Lowe আনীত প্রস্তাবটিকে ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে Brighton-এর এক সভায় অধ্যাপক Fawcett, M P-র উপরিহাস টিপ্পনী হল, 'Mr Lowe's unfortunate fondness for fantastic financial tricks', 'Speeches on some current Political Questions', London, 1873, p 266] এই ব্যবসার সঙ্গে জড়িত হাজার হাজার বালক-বালিকা, যাদের রুজি দেশলাই কাঠি ও দেশলাই বাক্স তৈরী করা, তারা প্রায় বিদ্রোহ ঘোষণা করলো, প্রস্তাবিত করের বিরুদ্ধে তাদের বিরাট-বিরাট শোভাযাত্রা

লণ্ডনের রাজপথে দিনের পর দিন বেরুতে শুরু করলো, ফলতঃ ইংল্যাণ্ডের আলোই নিভে যাবার উপক্রম হোল ('It was proved that the imposition recommended by Mr Lowe would put the light most effectually,) এরূপ অভাবনীয় পরিস্থিতির বিরুদ্ধে লড়া করা যে-কোন সরকারের পক্ষেই অসম্ভব, কেননা 'The contest was pitiful, painful and ludicrous; no Ministry could endure it long. সুতরাং Mr Lowe বাধ্য হয়ে 'withdrew his unlucky proposal along with his ill-omened joke'. ইতিমধ্যে নানা বিষয়ে, বিশেষতঃ আয়ারল্যাণ্ডের ভূমি-সংস্কার বিষয়ক আইন প্রণয়ন করতে গিয়ে Gladstone-মন্ত্রিসভা জনপ্রিয়তা হারাতে শুরু করেছিল। Lowe সাহেবের অভিনব প্রস্তাবটি সে মন্ত্রিসভার প্রায় মৃত্যু-ঘণ্টা (death-knell) বাজিয়ে দিল। ঐতিহাসিকের মন্তব্য হোল: 'The popularity of Gladstone's Government was all the time somewhat impaired by the line of action, and even perhaps by the personal deportment of some of its member's. 'A History of our own times' Vol-V (1908) Justin McCarthy, p 319.

(৬০) প্রথম অধ্যায়ের ২৬৭-সংখ্যক পাদটীকা (পৃ: ১২৯-১৩০) দ্রষ্টব্য। সুরেন্দ্রনাথ-যোগেন্দ্রনাথের যৌথ উদ্যোগেই সেকালের যুবমানসে যে একটা নতুন চেতনার সঞ্চার হয়েছিল, এই ঐতিহাসিক সত্যটি স্বীকার ক'রে ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর Swami Vivekananda : Patriot-Prophet' (1954) গ্রন্থের ১৬৭ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, 'He (Surendranath) acquainted the youth of the country with the life and deed of the great Italian revolutionary, Joseph Mazzini At the same time, the lives of Mazzini and Garibaldi were translated into Bengalee by Jogendranath Vidyabhusan... Thus a new generation began to grow with a new out look'. স্যার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী এই সময়ে প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র ছিলেন। পরিণত বয়সে স্মৃতি চারণ প্রসঙ্গে তিনি তাঁর 'স্মৃতিরেখা' (আশ্বিন, ১৩৪০) গ্রন্থে লিখেছেন, 'ইটালীয়ান স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতা ম্যাটসিনি ও গ্যারিবল্ডীর জীবন বৃত্তান্ত ও মর্মকথা তরুণদের হাতে হাতে ফিরিত। নেপোলিয়ান বোনাপার্ট যেরূপ হোমারের মহাকাব্য বালিশের তলায় রাখিয়া ঘুমাইতেন, সেইরূপ অনেক অনেক বঙ্গের ভাবী

'আশাম্বলে'রা ম্যাট্‌সিনি ও গ্যারিবল্ডীর জীবনী বালিশের তলায় রাখিয়া ঘুমাইতেন এবং অন্তরঙ্গ বন্ধুদের বিবাহ উপলক্ষে উপঢৌকন দিতেন' (পৃঃ ১৬৪)। [তখনও পর্যন্ত যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ ছাড়া অপর কোন লেখকের লেখা ম্যাট্‌সিনি-গ্যারিবল্ডীর জীবনী প্রকাশিত হয়নি, এটি মনে রাখা দরকার]। বিপ্লবী ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় তাঁর 'বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি' (আষাঢ়, ১৩৬৩) গ্রন্থে লিখেছেন, 'বিদ্যাভূষণ আগে থেকে বিপ্লবের আগুন ছড়িয়ে বেড়াতেন।…তার মধ্যে ম্যাটসিনি ও গ্যারিবল্ডির কথা বাংলাভাষায় সকলের আমলে আনতে তিনি সক্ষম হন'। (পৃঃ ১৯৮) এমন কি বঙ্গভঙ্গোত্তর যুগেও বাংলাদেশের বিপ্লবীরা যে ম্যাট্‌সিনি-গ্যারিবল্ডির জীবন-কাহিনী [তখনও যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ ব্যতীত অপর কোন লেখকের প্রকাশিত জীবনী গ্রন্থের সন্ধান আমরা পাইনি, সুতরাং এই জীবনী দুটি যোগেন্দ্রনাথের লেখা বলে মনে করি] দ্বারা বিপ্লবাদর্শের শিক্ষা গ্রহণ করতো, সেকথা 'Sedition Committee (1918) Report' (New print, March, 1973)-এ স্বীকার করা হয়েছে 'The Bhagavat Gita, the writings of Vivekananda and the lives of Mazzini and Garibaldi, were part of the course…' (পৃঃ ২৩) তাছাড়া সুরেন্দ্রনাথ-প্রোক্ত রজনীকান্ত গুপ্তের নাম বাদ দিয়ে [যেহেতু রজনীকান্ত গুপ্ত ইতালীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস বা ম্যাট্‌সিনি-গ্যারিবল্ডীর সম্পর্কে কিছু লেখেন নি] বলতে হয় যোগেন্দ্রনাথ সম্পর্কে সুরেন্দ্রনাথের এই 'persuaded' শব্দটির [যার অর্থ বুঝিয়ে-সুজিয়ে রাজী করান] ব্যবহার তাঁর, অর্থাৎ যোগেন্দ্রনাথ সম্পর্কে আমাদের শ্রদ্ধাবোধ জাগাবার পক্ষে অন্তরায় সৃষ্টি করে। কেননা সুরেন্দ্রনাথের কলকাতায় ফেরার পূর্বেই 'আর্যদর্শন' পত্রিকার যে ১৪টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল, সেইগুলিতে স্থান-প্রাপ্ত রচনাগুলি [১ম অধ্যায়ের ২২৭ সংখ্যক পাদটীকা (পৃঃ ১২২) দ্রষ্টব্য।] একটু অভিনিবেশ সহকারে দেখলেই বোঝা যায় যোগেন্দ্রনাথ প্রথমাবধি কোন্‌দিক দিয়ে জাতিকে জাগাবার চেষ্টা করেছেন বা করতে চাইছেন। এমতাবস্থায় প্রায় সদ্য-পরিচিত সুরেন্দ্রনাথ তাঁকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে, তাঁর বক্তৃতার আদর্শে ['in the spirit of my addresses'] লিখতে রাজী করালেন এবং যোগেন্দ্রনাথও ম্যাট্‌সিনি বিষয়ে লিখে ফেল্লেন, ব্যাপারটা বোধ হয় এত সহজ ছিল না। বস্তুতঃ এই জাতীয় রচনার পশ্চাতে যোগেন্দ্রনাথের যে দীর্ঘদিনের প্রস্তুতি বা আয়োজনের প্রয়োজন ছিল, তার আভাস মাত্রও সুরেন্দ্রনাথের উক্তিতে ধরা পড়েনি [ব্যাপারটা

অনেকটা মাদ্রাজ-প্রবাসী মধুসূদনের কাছে গৌরদাস বসাক-মারফৎ প্রেরিত বেথুনের উপদেশপূর্ণ পত্র-দ্বারা মধুসূদনের রাতারাতি বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়ে বিখ্যাত হয়ে যাওয়ার সাধারণ ভ্রান্ত ধারণার স্মারক], যেটা প্রকাশ পেয়েছে, সেটা সুরেন্দ্রনাথের আত্মাভিমান, যাতে ইতিহাসের মর্যাদা রক্ষিত হয়নি।

(৬১) এবিষয়ে প্রথম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

(৬২) সত্যেন্দ্রনাথের ইংল্যাণ্ডে অবস্থিতিকালে (১৮৬২-৬৪) ইতালীর মুক্তি সংগ্রাম অনেকটা সাফল্য-মণ্ডিত হলেও, তখন পর্যন্ত সম্পূর্ণ শেষ হয়নি, কেননা ম্যাট্‌সিনি-শিষ্য গ্যারিবল্ডী রোম জয় করতে গিয়ে এই সময়ে (আগষ্ট ১৮৬২-র শেষ দিকে) পরাজিত, আহত ও প্রায়-বন্দী হন। অনতিবিলম্বে ম্যাট্‌সিনি-গ্যারিবল্ডী-সংক্রান্ত অপর দুটি ঘটনায় সারা ইংল্যাণ্ড তোলপাড় হয়ে যায়। প্রথম ঘটনাটি হোল এই—ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ানকে হত্যার একটি ষড়যন্ত্র ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে প্রকাশ পায়। স্বয়ং ম্যাট্‌সিনি এই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়িত এরূপ সন্দেহ ঘনীভূত হয় আর একটি সূত্র থেকে। Palmerston-মন্ত্রিসভার সত্যনিযুক্ত সদস্য ('Lord of the Admiralty') মানবতাবাদী James Stansfeld (1820 98)-এর সঙ্গে ম্যাট্‌সিনির বিশেষ হৃদ্যতা ছিল এবং ম্যাট্‌সিনিকে 'Mr Fiori বা 'Flowers' বলে Stansfield তাঁর পত্রে সম্বোধন করতেন। প্যারিসে ধৃত ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে 'Greco' নামক একজনের কাছ থেকে একটি পত্র আবিষ্কৃত হোল, যে-পত্রে তাকে Stansfeld এর লণ্ডনের (35, Thurloe Square) ঠিকানায় 'Mr. Flower'-এর কাছ থেকে টাকা সংগ্রহ করতে বলা হয়েছিল। সংবাদটি সমগ্র ইংল্যাণ্ডে দারুণ উত্তেজনার সৃষ্টি করে, লণ্ডনে অবস্থানরত ম্যাট্‌সিনি এবং ষ্ট্যান্সফিল্ড উভয়েই এ বিষয়ে তাঁদের সংযোগের কথা অস্বীকার করেন। সরকার বিরোধী Tory দলের মুখপাত্রস্বরূপ Disraeli এই সুযোগে Stansfeld ও মন্ত্রিসভাকে প্রবলভাবে আক্রমণ করেন, এবং জানান যে অনেকদিন আগে Stansfeld-কে Mazzini একদা উত্তেজিত করেছিলেন 'সার্ডিনিয়ার সম্রাট চার্লস এ্যাল্‌বার্টকে হত্যা করবার জন্যে। ফলে House of Commons-এ নিদারুণ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়, মন্ত্রিসভার পতন আসন্ন হয়ে ওঠে। Stansfeld তথা মন্ত্রিসভাকে রক্ষা করতে John Bright তাঁর যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতায়

এক স্থানে অত্যন্ত লঘু পরিহাসের সঙ্গে জানান যে অতীতের কৃতকর্মকে ধরে বর্তমানকে বিচার না করাই ভাল, কেননা পঁচিশ-তিরিশ বছর আগে (আসলে ১৮৩৪ সালে) স্বয়ং Disraeli সাহেবও তাঁর 'A Revolutionary Epick' কাব্যে দুরাত্মাদের মৃত্যুতে উচ্ছ্বসিত ভাষায় বেদনা প্রকাশ করেছিলেন। Disraeli সাহেব সঙ্গে সঙ্গে প্রবল প্রতিবাদে ফেটে পড়লেন, তুমুল বাদানুবাদের মধ্যে Bright সাহেব তখনকার মতো ক্ষমা প্রার্থনা করলেও ব্যাপারটা কিন্তু এত সহজে মিটে গেল না। Disraeli ঐ কাব্যটির বহুস্থান পরিবর্তন করে অনতি-বিলম্বে একটি নূতন সংস্করণ প্রকাশ করলেন এবং ব্যাপারটার মিটমাট করবার জন্যে সেটি Lord Stanlery-কে 'উৎসর্গ' করলেন। কিন্তু কোন উৎসাহী ছিদ্রান্বেষী 'British Museum'-এ রক্ষিত কাব্যটির ১ম সংস্করণের একমাত্র খণ্ড (the only available copy) থেকে বিতর্কিত অংশগুলি উদ্ধার করে 'The Morning Star' পত্রিকায় প্রকাশ করে দেন। ফলে তা 'created first an immense sensation and then an out burst of universal laughter'. 'Reminiscences, vol-II (London : 1899) Justin McCarthy (pp 189-190) Justin McCarthy-'A History of our own times', (London : 1908) গ্রন্থের ৪র্থ খণ্ডের ১৩ থেকে ১৯ পৃষ্ঠায় এবং George Macaulay Trevelyan-রচিত 'The Life of John Bright,' (London : 1913) গ্রন্থের ৩২৮—৩২৯ পৃষ্ঠাতেও এ বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ প্রাপ্তব্য।

দ্বিতীয় ঘটনাটি হোল : ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের ৩রা এপ্রিল (রবিবার) পুত্র মিনোত্তী ও অন্যান্য সহযোগে গ্যারিবল্ডীর ইংল্যাণ্ডে আগমন। ২৮শে এপ্রিল পর্যন্ত ২৫ দিনের এই সফরে গ্যারিবল্ডী বিপুলভাবে অভ্যর্থিত হন। ইতালীর মুক্তি-সংগ্রামে সৈন্য, অর্থ ও অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে ইংরেজদের সাহায্যের কথা গ্যারিবল্ডী বহুবার সশ্রদ্ধভাবে উল্লেখ করেন। তা সত্ত্বেও Lord Palmerston, Lord Derby প্রমুখ কিছু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি একটু উন্নাসিক নিয়ে গ্যারিবল্ডীকে তাচ্ছিল্য করে প্রথম দিকে একটু সরে ছিলেন। পক্ষান্তরে, Gladstone প্রথম থেকেই গ্যারিবল্ডীর সম্বর্ধনা ও আদর-আপ্যায়নে বিশেষ উৎসাহ ও আনন্দ প্রকাশ করতে থাকেন। সাউ-থ্যাম্পটন থেকে ৫ই এপ্রিল (মঙ্গলবার) গ্যারিবল্ডী লণ্ডনে এসে উপস্থিত হলে সমগ্র লণ্ডন সহর আনন্দে যেন পাগল হয়ে ওঠে। গ্যারিবল্ডীর বাংলা জীবনী লেখক যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ লিখেছেন, 'লণ্ডনে তাঁহার অভ্যর্থনায় যে সমারোহ হইয়াছিল

তাহা বর্ণনা করা অসাধ্য'। ঐ সময়ে লণ্ডনে অবস্থান-রত আইরিশ ঐতিহাসিক Justin McCarthy তাঁর 'A History of our own times' গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে (পৃ: ৩৯৫) যে প্রত্যক্ষ বর্ণনা করেছেন, তা এই : 'Men of the class of Lord Palmerston cared nothing for Garibaldi. Men like Lord Derby disliked and despised him ; but the crowd ran after him (Garibaldi), and leaders on both sides, after having looked on for a moment with contempt, and another moment with amazement, fairly pulled off their hats and ran with the crowd, shouting and hallooing like the rest. The peerage then rushed at Garibaldi. He was beset with Dukes, mobbed by Countesses'. P 395. (G.M. Trevelyan রচিত 'The Life of John, Bright', গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে Garibaldi-র সম্বর্ধনার বিস্তৃত বিবরণ আছে)।

I.C.S. পরীক্ষোত্তীর্ণ সত্যেন্দ্রনাথ এই সময়ে ভারতে প্রত্যাবর্তনের জন্ম প্রস্তুত হচ্ছিলেন। সুতরাং পূর্বোক্ত দুটি ঘটনা তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন বলে মনে হয় এবং এমন কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা দুটি তিনি আত্মীয়-পরিজনদের মধ্যে বিলাতের অভিজ্ঞতা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন বলে মনে করা যায়। যদিচ স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী-কে লিখিত তাঁর পত্রাবলী, যা কন্যা ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণী 'পুরাতনী' গ্রন্থে (১ম সংস্করণ, ১৮৭৯ শকাব্দ) সঙ্কলন করেছেন, সেখানে ঘটনা দুটির উল্লেখমাত্র নেই, অথবা সত্যেন্দ্রনাথের স্মৃতিকথা 'আমার বাল্যকথা ও বোম্বাই প্রবাস' (১৯১৬) গ্রন্থেও এসম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায় না।

(৬৩) ' রবিজীবনী, ১মখণ্ড' (বৈশাখ. ১৩৮৯) প্রশান্তকুমার পাল। (পৃঃ ২৯১)

(৬৪) বিপিনচন্দ্র পাল তাঁর 'সত্তর বৎসর' রচনায় লিখেছেন যে ছাত্রসভায় ('Students' Association') সুরেন্দ্রনাথের প্রথম বক্তৃতা হোল 'পঞ্চনদে শিখ প্রভুশক্তির অভ্যুদয়' ('প্রবাসী', অগ্রহায়ণ, ১৩৩৫, পৃঃ ৪২২)। এটি তাঁর 'Memories of my Life and Times' (1932) গ্রন্থের ২৪২-পৃষ্ঠাতেও উল্লিখিত হয়েছে, তবে উভয়ত্রই বক্তৃতাটির কোন তারিখ দেওয়া হয় নি। যোগেশচন্দ্র বাগলও তাঁর 'ভারতের মুক্তি সন্ধানী' (১৯৫৮) গ্রন্থের ১৫৫-পৃষ্ঠায় লিখেছেন যে সুরেন্দ্রনাথ ছাত্রসভায় 'শিখশক্তির' অভ্যুদয়', 'ম্যাটসিনি জীবনকাহিনী ও নব্য ইটালী' শীর্ষক বক্তৃতাগুলি দিয়েছেন, কিন্তু কোনটারই তারিখ তিনিও দেন নি। সুরেন্দ্রনাথ ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের শেষ পাঁচ ছয় মাসে (জুলাই থেকে

ডিসেম্বর) কলকাতার ছাত্রদের সামনে অর্থাৎ ছাত্রসভায় ম্যাট্‌সিনি সম্পর্কে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, বা আদৌ দিয়েছিলেন কিনা, তার নিঃসংশয় প্রমাণ আমরা এখনও পাইনি। ১৮৭৬ থেকে ১৮৮০ পর্যন্ত সময়কালে প্রদত্ত তাঁর বক্তৃতাবলীর যে সঙ্কলন রামচন্দ্র পালিত কর্তৃক 'Speeches ot Babu Surendranath Banerjea, 1876-80' নামে ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল, তাতে দেখা যায় যে সুরেন্দ্রনাথের ১৮৭৬ সালের তিনটি, ১৮৭৮ সালের পাঁচটি ও ১৮৭৯ সালের একটি, অর্থাৎ মোট দশটি বক্তৃতা স্থান লাভ করেছে। এই চার বছরে সুরেন্দ্রনাথ যে আরো অনেক বেশি বক্তৃতা করেছিলেন, তা বুঝতে পারা যায় তাঁর আত্মজীবনী 'A Nation in Making' (১৯২৫) গ্রন্থের ৩৫-পৃষ্ঠা থেকে 'I was in great demand as a speaker and never spared myself'. রামচন্দ্র পালিত সঙ্কলিত 'Speeches…' গ্রন্থে দেখা যায় যে ১৮৭৬ সালের তিনটি বক্তৃতার মধ্যে 'ম্যাট্‌সিনি সম্পর্কিত বক্তৃতাটি সুরেন্দ্রনাথ ১৮৭৬ সালের ২রা এপ্রিল 'উত্তরপাড়া হিতকরী সভা'তে করেছিলেন। রামচন্দ্র পালিতের সঙ্কলন গ্রন্থটি যে অসম্পূর্ণ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সুতরাং বিপিনচন্দ্রের সংবাদটিকে শিরোধার্য করে এবং যোগেশচন্দ্রের তথ্যটিকে সমর্থন জানিয়ে বলা যায় যে শিখ শক্তির অভ্যুদয় ছাড়াও সুরেন্দ্রনাথ ১৮৭৫ সালের শেষ দিকে কলকাতার 'ছাত্রসভা'য় ম্যাট্‌সিনি সম্পর্কে বক্তৃতা করেছিলেন।

(৬৫) 'The secret revolutionary Societies of Italy and Russia must have inspired Rajnarain and his associates in setting up this society'.—'Indian Political Associations and Reforms of Legislature, 1818-1917' (1st ed. November. 1965) Biman Behari Majumder. p. 95.

(৬৬) 'বেশ মনে আছে আমাদের ছেলেবেলায় কোনো সময়ে ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের চিরন্তন জুজু রাশিয়ান কর্তৃক ভারত আক্রমণের আশঙ্কা লোকের মুখে আলোচিত হইতেছিল।'—'জীবন স্মৃতি' (চৈত্র, ১৩৪৪) রবীন্দ্রনাথ। (পৃঃ ৭২-৭৩)

(৬৭) 'ভারত-রুশ কথাঃ বাঙালীর রুশ চর্চা' (জুন, ১৯৭৬) কেশব চক্রবর্তী (পৃঃ ৩৭-৩৮)

(৬৮) ঐ, (পৃঃ ৮৩)

(৬৯) এবিষয়ে ইতস্ততঃ প্রাপ্ত কয়েকটি দৃষ্টান্ত সঙ্কলন করছি: ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ২রা এপ্রিল উত্তরপাড়া হিতকরী সভায় সুরেন্দ্রনাথ 'Joseph Mazzini'

শীর্ষক বক্তৃতায় প্রসঙ্গতঃ আয়ারল্যাণ্ডের মুক্তি-সংগ্রামে 'United Irish Club of Irishmen'-এর উল্লেখ করেছিলেন। তাঁর অন্যান্য বক্তৃতায় আইরিশমুক্তি-সংগ্রামের প্রসঙ্গ মাঝে মাঝে এসেছে। শ্রীঅরবিন্দের রচনাদিতেও আয়ারল্যাণ্ডের উল্লেখ পাওয়া যায়। নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তীর 'বিদ্রোহী আয়র্লণ্ড' গ্রন্থটি ১৩৩৫ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। ১৩১৯ সালের আষাঢ় সংখ্যা বঙ্গদর্শন পত্রিকায় বিপিনচন্দ্র পালের 'ভারত, আয়ারল্যাণ্ড ও বৃটিশ সাম্রাজ্য-নীতি' প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ১৯৪৮ সালের মে মাসের 'Modern Review' পত্রিকায় Prof. J. Sen রচিত 'The Indo-Irish Parallel : A Study in Dominion 'Status' প্রবন্ধে লেখক যদিচ বলেছেন, 'In spite of variation, the Irish struggle in many ways has supplied the inspiration, the technique and ideal of the Indian independence movement' (p 361), কিন্তু তিনি ইতস্ততঃ 'Anglo-Irish union', 'the spacious days of Grattan', 'Sein Fein' ইত্যাদির সংক্ষিপ্ত উল্লেখমাত্র করে ১৯১৬ সালের পর থেকেই এই সাদৃশ্য দেখাবার চেষ্টা করেছেন। সম্প্রতি প্রকাশিত 'রবীন্দ্রচর্চা' (রবীন্দ্রজয়ন্তী, ১৩৯২) গ্রন্থের 'আয়র্লণ্ড, বঙ্গদেশ ও রবীন্দ্রনাথ' অধ্যায়ে দেবীপদ ভট্টাচার্য এ সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করার চেষ্টা করেছেন।

(৭০) অবশ্য ১৯১৩ সালের ৬ই নভেম্বর কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে 'Rede Lecture' দিতে গিয়ে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের 'Chancellor' (এবং ভারতের একদা 'ভাইসরয়') Lord Curzon উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ের ইংল্যাণ্ডের বক্তাদের মধ্যে Bright সাহেবকে তৃতীয়স্থান দিয়ে বলেছেন, 'Daniel O' Connell appears to me to have been the greatest mob orator that we ever had in this century, and he also excelled in Parliament···Mr. Gladstone was scarcely, if at all, inferior to O'Connell ; Mr. Bright was a third'.—'Modern Parliamentary Eloquence' (London, 1914) Earl Curzon of Kedleston, p. 16.

(৭১) 'Speeches on Questions of Public Policy,' by the Right Honourable John Bright, M.P. (New York, 8th edition).

1898. 1st ed. 1868), Edited by James E. Thorold Rogers, pp. 184—185.

প্রায় এই সময়েই "England, Ireland, and America' শীর্ষক প্রবন্ধের 'Ireland' অংশে Richard Cobden-এর (১৮০৪-৬৫) স্বীকারোক্তিতে অনুরূপকথাই প্রকাশ পেয়েছে, '…our efforts have been directed towards the assistance of states for whose welfare we are not responsible ; whilst our oppression and neglect have fallen upon a people over whom we are endowed with the power and accountable privileges of government—and the extent of the injustice of our statesmen becomes fully disclosed. The spectacle of Ireland, operating like a cancer in this side of England….' —'The Political writings of Richard Cobden, Vol-I' (London 4th edition, 1903 ; 1st edition, 1867), p. 74.

(৭২) 'I have seen the Indian in his forest, and the Negro in his chains, and thought, as I contemplated their pitiable condition, that I saw the very extreme of human wretchedness, but I did not know then the condition of unfortunate Ireland. Like the Indian, the Irishman is poor and naked : but he lives in the midst of a society where luxury is eagerly sought, and where wealth is honoured. Like the Indian, he is destitute of the physical comforts which human industry and commerce of nation procure ; but he sees a part of his fellows enjoying the comforts to which he can not aspire. In the midst of his greatest distress, the Indian preserves a certain independence, which has its dignity and its charms. Though indignant and famished, he is still free in his deserts, and the sense of this liberty : alleviates many of his sufferings : the Irish man undergoes

the same destitution without possessing the same liberty he is subject to rules and restrictions of every sort : he is dying of hunger, and restrained by law : a sad condition, which unites all the vices of civilisation to all those of savage life. Without doubt, the Irishman who is about to break his chains, and has faith in futurity, is not quite so much to be bewildered as the Indian or the slave Still, at present day, he has neither the liberty of the savage nor the bread of servitude.' "Ireland : Social, Political, and Religious, Vol-I' (London, 1839) by Gustave de Beaumont, (Edited by : W. C. Taylor, LL.D, of Trinity College. Dublin), pp. 268-269. গ্রন্থটিতে Beaumont সাহেবের এই বক্তব্যের সময় কাল উল্লিখিত হয়নি, তবে বিখ্যাত আইরিশ বিপ্লবী Charles Gavan Duffy (পরবর্তীকালে 'Sir') তাঁর বিশাল 'Young Ireland : A fragment of Irish History, 1840-50' (London. Paris, NewYork, 1880) গ্রন্থে জানিয়েছেন যে ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে আয়ারল্যাণ্ডে উপস্থিত হয়ে Beaumont-সাহেব একথাগুলি বলেছিলেন, 'An eminent French statesman (Gustave de Beaumont) visiting Ireland in 1824, declared that he had seen Indian in his wigwam, and the negro in his chains but the condition of the Irish tenant-at-will was worse than that of the savage or the slave' pp. 142—143.

(৭১) কবি Thomas Moore তাঁর ৪ খণ্ডের 'History of Ireland' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের (London, 1835) দ্বিতীয় অধ্যায়ে ('Antiquity of the Irish people') আইরিশদের (Celtic) প্রাচীন ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ('rites and usages'), অগ্নিপূজা, বিভিন্ন নৈসর্গিক বস্তু (পাথর ইত্যাদি)-কে পূজা ইত্যাদি ভারতবর্ষ ('East') থেকে ফিনিশীয়দের দ্বারা আয়ারল্যাণ্ডে প্রবর্তিত হয়েছিল বলে উল্লেখ করেছেন। বিশেষভাবে আয়ারল্যাণ্ডের 'Watch Towers or beacons'-গুলির

স্থাপত্য (গঠন-প্রণালী) ইত্যাদির সঙ্গে বিহারের ভাগলপুর অঞ্চলের দুটি স্তম্ভের আশ্চর্য সাদৃশ্য দেখিয়ে Moore সাহেব লিখেছেন, 'But there is yet a far more striking corroboration of this view of the origin of the Round Towers. While in no part of Continental Europe has any building of a similar construction been discovered, there have been found, near Bhaugulpore, in Hindostan, two towers, which bear an exact resemblance to those of Ireland. In all the peculiarities of their shape,—the door or entrance, elevated some feet above the ground,—the four windows near the top, facing the cardinal points, and the small rounded roof,—these Indian temples are, to judge by the description of them, exactly similar to the Round Towers ; and, like them also, are thought to have belonged to a form of worship now extinct and even forgotten'. (pp 30-31.) সম্ভবতঃ ভারতবর্ষ ও আয়ারল্যাণ্ডের সম্পর্ক নিয়ে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপের পণ্ডিতমহলে কিছু আলোচনা হয়েছিল, যে-কারণে বিখ্যাত প্রধান মন্ত্রী Disraeli ('Earl of Beaconsfield)-এর পিতা Issac D' Israeli (1766-1848) তাঁর 'Curiosities in Literature' (London, 1791 ; 3rd edition, 1867) গ্রন্থের 'Literary Follies' প্রবন্ধে সে সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করেছিলেন, 'The Irish antiquaries mention public libraries, that were before the flood ; and Paul Christian Lisker, with profounder erudition, has given an exact catalogue of Adam's. Messieurs O'Flaherty, O'Connar, and O' Halloran, have most gravely recorded as authentic narrations the wildest legendary traditions ; and more recently, to make confusion doubly confounded, others have built up what they call theoretical histories on these nursery tales. By which species of black art they

contribute to prove that an Irishman is an Indian, and a Peruvian may be a Welshman, from certain imigrations which took place many centuries before Christ, and some about two centuries after the flood !' (p.113.) সম্প্রতি প্রয়াত ডঃ হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'ঋগ্বেদ পরিচয়' ('হরফ'-প্রকাশিত 'ঋগ্বেদ সংহিতা, প্রথম খণ্ড', ১৯৭৬) প্রবন্ধে লিখেছেন, '…বৈদিক যুগে বর্ণিত অশ্বমেধ যজ্ঞের মত অনুষ্ঠান আলতাই টার্কদের মধ্যে এখনও প্রচলিত আছে এবং আয়ারল্যাণ্ডে খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রচলিত ছিল'। (পৃ: ৪৫)

(৭৪) 'Young Ireland : A fragment of Irish History' (1880) Sir Charles Gavan Duffy, pp. 93-94.

(৭৫) ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে মন্ত্রিসভা গঠন করে Gladstone আইরিশদের প্রতি কিঞ্চিৎ সুবিচারের জন্য ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে Irish Church. Irish Land, Irish University Education ইত্যাদি Bill উপস্থিত করতে থাকলে, তার সমালোচনায় বিখ্যাত Disraeli সাহেব অবশ্য একস্থানে বলেন, '…the people of Ireland were a religious people the Roman Cathlic majority, who formed five-sixths of the population…… ' 'Lord—Beaconsfield : A Biography, (London, 2nd edition, 1879) T. P.O' Connor, p. 580.

(৭৬) '…long before the American war created a new race of Irish men—the Irish American soldiers'. 'An outline of Irish History' (London, তারিখনেই) Justin H. Mc-Carthy, p. 134.

(৭৭) 'He ('the Irish-American soldier') had the bright, humourous countenance of the Celts, with the peculiar litheness and military swager of the American 'boy—in—blue' —'A history of our own times, vol-IV' (London: 1908) Justin McCarthy, p. 134.

(৭৮) ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৪ আগষ্ট House of Commons-এ বক্তৃতায় John Bright বলেন, 'Driven forth by poverty, Irish emigrate in large numbers, and in what ever quarter of the world an Irishman sets his foot, there stands a bitter and implacable enemy of England'—'Speeches of John Bright' (1898) ed. by J.E.T. Rogers, p 159.

Bright সাহেবের এই উক্তিতে একটু ত্রুটি আছে। কথাটা তিনি এমনভাবে বলেছেন যাতে মনে হয় আয়ারল্যাণ্ডের দারিদ্র্য-পীড়িত অর্থাৎ দরিদ্র শ্রেণীর মানুষরাই যেন আয়ারল্যাণ্ড ছেড়ে পালিয়েছিল। পক্ষান্তরে আইরিশ ঐতিহাসিক Justin H. Mc Carthy তাঁর 'An outline of Irish history' গ্রন্থে বলেছেন যে আয়ারল্যাণ্ডের ধনী ব্যক্তিরা যেমন আয়ারল্যাণ্ড ত্যাগ করেনি, তেমনি দরিদ্ররাও আয়ারল্যাণ্ড ছেড়ে পালাতে পারেনি—যারা পালিয়েছিল, তারা হোল নিম্ন-মধ্যবিত্ত অর্থাৎ যাদের ঘট-বাটি বেচে জাহাজের ভাড়া সংগ্রহের সামর্থ্য ছিল। Richard Cobden-এর 'Political Writings, Vol-I' (4th edition, 1903) গ্রন্থের ৬৫ পৃষ্ঠা থেকে জানা যায় যে তখন এই জাহাজের ভাড়া ছিল প্রায় দু পাউণ্ড ('The expense of transporting an individual from Limerick to the shores of America by such a method would probably not exceed two pounds')। তাছাড়া শুধু দারিদ্র্যের কারণেই নয়, ইংরেজদের অসহনীয় শোষণে, দমনমূলক 'Coercion Act'-এর চোটে, প্রোটেষ্ট্যান্টদের 'Orangemen of the most bitter kind'-দের গুঁতোয় এবং সর্বোপরি ক্রমাম্বয় (এ যুগের ভাষায় 'লাগাতার') দুর্ভিক্ষের হাত থেকে প্রাণ বাঁচাতেই, সামান্য পুঁজিপাটা যাদের ছিল, তারা সে সব বিক্রী করে বা ধার করে মাতৃভূমি ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল। আইরিশ ঐতিহাসিক P.S.O'Hegarty-লিখিত 'A History of Ireland under the Union, 1801-1922' (London, 1st edition 1952) গ্রন্থে আমাদের এরূপ মন্তব্যের সমর্থন আছে, 'Starving and hungry tenants every where gave up their land in order to qualify for relief, and depopulation and clearences

swept the country···Those who could find or borrow the money to pay the fare, emigrated, those who could not starved and sickened and died'. p.318.

(৭৯) ১২-টি অধ্যায়ে ('chapter') বিন্যস্ত স্মৃতিকথা 'Irish Recollections' (New York & London, প্রকাশকাল নেই) গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে Justin McCarthy লিখেছেন, 'I make these comments here, because I am anxious to impress upon the minds of my readers, that we, the young Nationalists of Ireland in those days, were as ardent admirers of England's literature, ancient and modern, as the most enthusiastic Englishman could be'. (p. 34) ১৪৩ পৃষ্ঠাতেও আবার বলেছেন, 'We, the Irishmen of young Ireland'—ইত্যাদি। বইটিতে তাঁর বন্ধু ও একদা সহকর্মী বহু আইরিশ বিপ্লবীর প্রসঙ্গ আছে।

(৮০) Justin McCarthy (1830-1912) বহু গ্রন্থের লেখক এবং ১৮৭৯ থেকে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বৃটিশ পার্লামেন্টের সভ্য ছিলেন। গত শতকের আশির দশকে তিনি কলকাতায় এসেছিলেন। চতুর্থ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের (১৮৮৭) সভাপতি George Yule ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই ডিসেম্বর কলকাতার National Literary Club-এ William Wedderburn, M.P.-কে যে ভোজসভায় আপ্যায়িত করেন, তাতে আমন্ত্রিত ৭০ জন বিশিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে Justin McCarthy, M.P. উপস্থিত ছিলেন। দ্রঃ 'Speeches by George Yule' (2nd edition, 1890), edited by Raj Jogeshwar Mitter, p. 139.

(৮১) 'They were all youngmen, they were all Protestants, they were all dazzled by the success of the French Revolution' —'An outline of Irish history', Justin H.Mc. Carthy,p 72. লক্ষণীয় এই যে অষ্টাদশ শতাব্দীতে আয়ারল্যাণ্ডের মুক্তিসংগ্রামে ক্যাথলিকদের সঙ্গে আইরিশ প্রোটেষ্ট্যান্টরাও হাত মিলিয়ে ছিল এবং এই পর্যায়ে নেতৃস্থানীয় Wolfetone, Fitzerald প্রমুখ ছিলেন প্রোটেষ্ট্যান্ট।

(৮২) ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে ভারতে ইংরেজ সম্প্রদায়ের ব্যভিচার-অনাচার যে কত প্রবল ছিল, তা ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের ১লা আগষ্ট তারিখে House of Commons-এ Bright সাহেবের বক্তৃতাতে উল্লিখিত হয়েছে 'Perjury and wrong are universal wherever the Courts of the Company's Service have been established in India'.—'Speeches of John Bright', p. 54.

(৮৩) ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে জুন House of Commons-এর বক্তৃতায় John Bright বলেন যে ভারতে ইংরেজ কর্মচারীদের বেতন ইংল্যাণ্ডের প্রধান মন্ত্রী প্রভৃতির সমান, 'The East India Government scatters about at Bombay, Calcutta, Madras, Agra, Lahore. and half adozen other cities, which are upto the mark of those of Prime Minister and Secretaries of State in this Country'. —'Speeches of John Bright', p. 23

(৮৪) 'In the Days of the Company'. (Calcutta : 1920) Douglas Dewar, p. 17.

(৮৫) 'Dancing was always a favourite amusement in Calcutta, and the ladies being in the minority did their best to redress the balance by each dancing as many dances as she possibly crowd into one night. One writer described Calcutta ladies as darcing from nine in the evening till five o'clock in the morning.'—'Calcutta : Past & Present' (New edition : 1978) Kathleen Blechyden p. 98.

(৮৬) অপরিমেয় ধনদৌলত নিয়ে স্বদেশ-প্রত্যাগত ইংরেজরা রাজসিক ভাবে জীবন কাটাতো বটে, কিন্তু ইংল্যাণ্ডের লোকেরা তাদের পাত্তা দিতো না, সেখানকার সংবাদপত্র ও সম্ভ্রান্ত লোকেরা তাদের 'execrable Banditi', 'Plunderers of the East' বলে ঘৃণাপ্রকাশপূর্বক 'এক ঘরে' করে রাখতো, সেখানে তাদের অসৎ উপায়ে অর্জিত সম্পদ সম্পর্কে নানা কুৎসা রটতো, নাম বিকৃত করে কবিতাদি রচনার দ্বারা তাদের ব্যঙ্গ করা হোত।

এ সম্পর্কে Lester Hutchinson-রচিত 'The Empire of the Nabobs' (London : 1937) গ্রন্থের ৮৬-৮৭ পৃষ্ঠাদ্বয় দ্রষ্টব্য।

(৮৭) এবিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার জন্য শ্রীঅনল মিত্রের 'কলিকাতায় বিদেশী রঙ্গালয়' (শ্রাবণ, ১৩৭৪) গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

(৮৮) 'সুতানটি সমাচার' (মার্চ, ১৯৬২) বিনয় ঘোষ, পৃঃ ১৩৯—১৪২

(৮৯) 'Dictionary of Indian Biography' (Beneras : Delhi, 1971) C. E. Buckland. p. 230.

(৯০) 'The Good Old Days Honourable John Company' (New edition 1964). W. H. Carey, p. 140.

(৯১) 'Reminiscences and anecdotes of Great men of India, Part-II'. (Riddhi edition, 1983) Ramgopal Sanyal, pp. 114-115.

Colonel Duane'-কে 'Marquis Cornwallis,' বিতাড়ন করেন বলে যে সংবাদ Carey সাহেব তাঁর গ্রন্থে দিয়েছেন, সে বিষয়ে কিঞ্চিৎ সংশয় আছে। গভর্নর-জেনারেল' হিসাবে ভারতে Corwallis-এর কার্যকাল হোল সেপ্টেম্বর, ১৭৮৬ থেকে নভেম্বর, ১৭৯৩ পর্যন্ত। সুতরাং Carey-প্রদত্ত সংবাদ স্বীকার করলে এই সময়কালের মধ্যেই 'Duane'-এর বিতাড়ন ঘটেছিল ধরতে হয়। পক্ষান্তরে রামগোপাল সান্যাল তাঁর পূর্বোক্ত গ্রন্থে 'Calcutta Review' পত্রিকা থেকে যে অংশ সঙ্কলন করেছেন, তাতে দেখা যায় যে Duane-এর পত্রিকা ১৭৯৪ সালে প্রকাশিত হয়েছিল এবং ১৭৯৪ সালের ডিসেম্বরের একেবারে শেষদিকে (৩০শে বা ৩১শে তারিখে) 'William Duane'-কে জাহাজে চাপিয়ে ভারতবর্ষ থেকে বিদায় করা হচ্ছে। বৎসর, মাস, মায় তারিখ পর্যন্ত দিয়ে এখানে বহিষ্কারের ঘটনাটিকে যেরূপ নাটকীয়ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, তাতে Carey-প্রদত্ত সংবাদ অপেক্ষা এটিকেই অধিকতর বিশ্বস্ত ও গ্রহণ-যোগ্য বলে মনে হয়। 'Colonel Duane' ও William Duane' অবশ্যই দুজন পৃথক ব্যক্তি নন।

(৯২) 'By this time, it seems, he had become something almost of a public institution in Calcutta whom no foreign

visitor could afford to miss visiting'—'Rammohun Roy, vol-I' (1958) Iqbal Singh, p. 166.

(১৩) 'The Life and Letters of Raja Rammohun Roy' (1962 edition) S. D. Collet, pp 172-173.

(১৪) 'The Irish men who are proud of their nationality will not readily forget this tribute of appreciation and succour from one of the earliest pioneers of the national movement in India' Ibid, p 173.

(১৫) Ibid, p. 177.

(১৬) '...Your Majesty is well aware that a free press has never caused revolution in any part of the world...where as, where no freedom existed, and grievances consequently remained unrespresented and unredressed, innumerable revolutions have taken place, or if prevented by the armed force of the Government, the people continued ready for insurrection.'—'The English Works of Raja Rammohun Roy, Part-IV' (1947), edited by Kalidas Nag & Debajyoti Burman, p, 22.

পরাধীন দেশে বিপ্লব স্বষ্টির মূল কারণটি যে আয়ারল্যাণ্ডের প্রাচীন ও সমসাময়িক ইতিহাস থেকেই রামমোহন পেয়েছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

(১৭) আয়ারল্যাণ্ডের ঘোরশত্রু (ইংল্যাণ্ডের একাধিকবার প্রধান মন্ত্রী) Sir. Robert Peelআয়ারল্যাণ্ডকে যে সাধারণ আইন ('ordinary law') দ্বারা শাসন করা হয় নি, তা স্বীকার করে ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে Parliament-এর 'in one of his speeches in 1829...stated that in scarcely one year since the Union was Ireland governed by ordinary law'—'The Leaders of Public Opinion in Ireland' (London: New edition, 1871) William Edward Hartpole Lecky, p. 26I.

(১৮) 'Supposing that some 100 years hence the Native character becomes elevated from constant intercourse

with Europeans and the aquirements of general and political knowledge as well as of modern arts ard sciences, is it possib'e that they will not have the spirit as well as the inclination to resist effectually any unjust and oppressive mearsures serving to degrade them in the scale of society? It shculd not be lost sight of that the position of India is very different from that of Ireland to any quarter of which an English fleeet may suddenly convey a body of troops that may force its way in the requisite direction and succeed in supressing every effort of a refractory spirit...'The Engbish Works of Raia Rammohun Rov, Part-IV' (1947) Edited by K. D. Nag & D Burmar, p 103.

(৯৯) ১৮২০ সালে Henry Grattan-এর মৃত্যুর অব্যবহিত পর থেকেই ক্যাথলিকদের মুক্তি (Catholic Emancipation) আন্দোলনের পুরোধাপুরুষ O' Connell-এর নামের পূর্বে স্থির বিশেষণ রূপে 'Uncrowned king' শব্দদুটি যুক্ত হতে দেখা যায়। পরবর্তীকালে তাঁকে আইরিশদের 'মুক্তিদাতা' ('Liberator') রূপেই উল্লেখ করা হতে থাকে।

(১০০) এই সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সংবাদপত্রাদিতে Daniel O'Connell-এর সংবাদ কি পরিমাণে প্রকাশিত হোত, সে বিষয়ে Robert Dunlop, M. A তাঁর 'Daniel O' Connell and the Revival of National life in Ireland' (New York & London : 1908) গ্রন্থের ২৩৯ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, 'Let the reader turn to any old newspaper, English, Irish, or Continental, belonging to the years 1827 to 1847, and the name he is sure oftenest to encounter will be that of O'Connell'.

(১০১) 'Daniel O'Connell and the Revival of National Life in Ireland' : (1908) Robert Dunlop, M. A. pp. 217-221.

ইংরেজদের চোখ যে সহজে খোলে না, তার প্রমাণ দিতে গিয়ে ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর, লণ্ডনের এক সভায় John Bright প্রসঙ্গক্রমে

'Catholic Emancipation Bill' পাশ করাতে প্রতিক্রিয়াশীল ইংরেজদের সতর্ক করতে ১৮২৯ সালে Duke of Wellington যে কথাগুলি বলেছিলেন, তা উদ্ধার করেছেন, 'Either give political power and representation through Catholic Members to the Catholics of the United kingdom, or encounter the peril and loss of civil war in Ireland'—'Speeches of John Bright. p 396

(১০২) 'The Last Days in England of the Rajah Rammohun Roy' (1915) Mary Carpenter, p 114

(১০৩) 'Thomas Moore…our national poet'. 'Irish Recollections (New York and London, প্রকাশকাল নেই) Justin Mc. Carthy, p 5.

(১০৪) সেকালে লণ্ডন শহরের সর্বাধিক অভিজাত Savie Row-স্থ 'Holland House'-এ ইংল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী ও বিখ্যাত ব্যক্তিরা ভোজন করতে আসতেন। বিখ্যাত রাজনীতিজ্ঞ যাজক Sydney Smith (1771-1845) Lady Holland-কে এক পত্রে লিখেছেন, 'I know nothing more agreeable than a dinner at Holland House; but that must not begin at ten in the morning, and last till six. I should be capable for the last four hours of laughing at Holland's jokes, eating Raffaell's cakes, or repealling Mr. Allen's attack upon the Church'—Sydney Smith' (London: 1905) George W.E. Russell, p 206. ইংল্যাণ্ডের রাণী, ইংল্যাণ্ডের ছজন প্রধানমন্ত্রী, বেলজিয়ামের রাজা King Leopold প্রভৃতি বিখ্যাত ব্যক্তির চিকিৎসক (Byron, Coleridge, Moore প্রভৃতির বন্ধু-চিকিৎসক) Sir Henry Holland, Bart (1788-1873) তাঁর স্মৃতিকথা 'Recollections of Past Life' (London: 1872) গ্রন্থে বহুবার Holland House-এর সপ্রশংস উল্লেখ করেছেন, এখানে নিয়মিত ভোজনার্থে আসা বিখ্যাত ব্যক্তিদের নামের তালিকা দিয়েছেন। ১৮৩১-৩৩ সালে (রামমোহনের ল ও অবস্থিতিকালে) Holland House-এর অবস্থা সম্পর্কে Sir Henry

লিখছেন, 'During the progress of the Reform Bill and the agitations attending it, the Holland House dinners were often a sort of miniature Cabinet, in the persons and the matters discussed. (পৃ: ২৩১), Mrs. Grote তাঁর স্বামীর (George Grote-1794-1871) জীবনী 'The Personal Life of George Grote' (London: 1873) গ্রন্থেও 'Holland House' সম্পর্কে সপ্রশংস উল্লেখ করেছেন (পৃ: ১৩২) সেকালের লণ্ডনের বিখ্যাত ব্যক্তিদের জীবনী ও স্মৃতিকথাগুলিতে Holland House-এর বহু উল্লেখ পাওয়া যায়।

রামমোহন রায়কে নিয়ে Moore সাহেবের আয়োজিত ভোজসভাটি কোথায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তার উল্লেখ Moore-এর ডায়েরিতে নেই, তবে Moore-এর বিশিষ্ট বন্ধু (ইংল্যাণ্ডের একাধিকবার প্রধানমন্ত্রী এবং Moore-এর ৮ খণ্ডে সম্পূর্ণ 'Memoirs Journals and Correspondence'-এর সম্পাদক) Lord John Russell উক্ত গ্রন্থের ৬ষ্ঠ খণ্ডের Preface অংশে (p. XV) যা বলেছেন, 'Among the houses where Moore was most in the habit of dinning when in London, was Holland House,' তা থেকে এবং Holland House এর পূর্বোক্ত গুরুত্ব ও আভিজাত্যের কথা স্মরণ করে মনে হয়, আলোচ্য-ভোজ সভাটি এখানেই বসেছিল।

প্রসঙ্গতঃ আর একটি কথাও মনে রাখা দরকার। এই সময়ে লণ্ডনে তাঁর স্ত্রী 'Bessy'-কে নিয়ে থাকবার একটা আস্তানা থাকলেও Mocre সাহেব অনেক সময়েই তাঁর বন্ধু-বান্ধবদের বাড়িতে, এমনকি সরাইখানা ('inn')-তেও রাত্রিবাস করছেন বলে তাঁর ডায়েরিতে পাওয়া যায়। তাঁর এই অবস্থা সম্পর্কে তাঁর বন্ধু 'Lord R' অর্থাৎ Lord John Russell-এর পরিহাসকে উদ্ধৃত করে ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে ডিসেম্বরে ডায়েরিতে Moore লিখেছেন, 'he said I was that class of persons in London who Coloquhoun mentions, who, when they rise in the morning, have not the least idea of where they are to sleep at night'.—'Memoirs, Journals and Correspondence of Thomas Moore, vol-IV' (London. 1854)

Edited by the Right Honourable Lord John Russell, M.P. p. 241.

(১০৫) Thomas Moore তাঁর ডায়েরিতে ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই জুন তারিখে লিখেছেন, 'Dined with Macdonald at eight: company Fazakarley, T. Baring, Wilmot Horton, Sir. A. Johnston, Robert Grant, and the Brahmin Rammohun Roy, a very remarkable man, spearing English perfectly, and knowing all about English institutions, even to the, details of Scotch boroughs. Said that most of the Brahmins are Deists. Gave an account of a society at Calcutta, formed of persons of all countries, religious and seets—Hindoos, Mussulmen, Protestants, Catholics. A sort of service performed at their meetings, from which all such names as marked any particular faith, as Christ, Mohomet, &c &c, were excluded; but the name of God in all languages and forms, whether Jehovah, Brahma, or any other such title retained.'
'Memoirs, Journal and Correspondence of Thomas Moore vol-IV (London 1854) ed. by. Lord John Russell, pp. 196-197. Moore-এর ডায়েরির ত্রুটি দেখিয়ে সম্পাদক Lord John Russell চতুর্থ খণ্ডের 'Preface' অংশে (p. X) লিখেছেন, 'The defect of Moore's Journal, in my opinion, is that while he is at great pains to put in writing the stories and jokes, he seldom records a serious discussion or notices the instructive portion of the conversation in which he bore apart' দেখা যাচ্ছে আলোচ্য ভোজসভাটির নাতি-বিস্তৃত বিবরণ-সংকলন এমনি একটা দুর্লভ ব্যতিক্রম। রামমোহনের বিশাল ব্যক্তিত্ব, বা ব্রহ্মধর্ম সম্পর্কে তাঁর আলোচনা Moore-এর যে শ্রুতিপ্রদ ঠেকেছিল তার কারণ আছে। Moore-এর এই সময়কার ডায়েরির পাতাগুলি ওল্টালে দেখা যায় যে তিনি এই সময়ে ঈশ্বরতত্ত্ব (theology)

নিয়ে মশগুল হয়েছেন, লণ্ডনের পুরানো বইয়ের দোকানে-দোকানে ঘুরে তিনি ধর্মসম্বন্ধে বইপত্রাদি কিনছেন এবং ধর্মকে উপজীব্য করে তিনি এই সময়ে 'Travels of an Irish Gentleman in search of a religion, (1839) বইটি লিখছেন। বিশাল পাণ্ডিত্য ও তীক্ষ্ণযুক্তিবোধের সহায়তায় রামমোহন ধর্ম সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন, তা যে Moore সাহেবের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করবে, তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। প্রসঙ্গতঃ এখানে আর একটি সংবাদ দেওয়া দরকার। নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়' (৪র্থ সংস্করণ,) গ্রন্থের ৪৬৭ পৃষ্ঠায় Moore-এর ডায়েরি থেকে ভোজসভাটির বিবরণ উদ্ধার করতে গিয়ে যে সংবাদ পরিবেশন করেছেন, তাতে কয়েকটি তথ্যগত ভুল আছে। নগেন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'ফরাসীদেশে অবস্থিতি কালে রামমোহন রায় এক দিবস প্যারিস নগরস্থ কোন হোটেলে সুপ্রসিদ্ধ সর টমাস মুরের সহিত আহার করিয়াছিলেন'। একটি বাক্যেই তিনি তিনটি ভুল করেছেন। প্রথম, রামমোহন প্যারিসে গিয়েছিলেন ১৮৩২ সালের শরৎকালে ('autumn') এবং ১৮৩৩ সালের জানুয়ারীর মধ্যেই তিনি লণ্ডনে ফিরে আসেন। মজার ব্যাপার হোল নগেন্দ্রনাথ এটি জানতেন এবং তাঁর গ্রন্থে তা উল্লেখও করেছেন। অথচ Moore-এর ডায়েরি থেকে '6th June, 1831'-এর সম্পূর্ণ বর্ণনাটি উদ্ধার করেও রামমোহনের সঙ্গে Moore-সাহেবের প্যারিসে মোলাকাৎ ঘটাতে গিয়ে সব ব্যাপারটাকে তিনি গোলমাল করে ফেলেছেন। দ্বিতীয়, ভোজসভাটি যে কোথায় বসেছিল Moore-এর ডায়েরিতে তার কোন উল্লেখ নেই (পূর্বে বলা হয়েছে)। তৃতীয়, কবি Thomas Moore 'সর' (Sir) উপাধি পাননি। আসলে পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীর বিখ্যাত অনুবাদক ও 'Utopia' গ্রন্থের লেখক Thomas More (1478-1535), চার্চের উপরে রাজাকে স্থান দিতে অস্বীকার করায় যাঁর ফাঁসী হয়েছিল, তিনি 'স্যার' উপাধিযুক্ত ছিলেন। এঁর সঙ্গে নাম-সাদৃশ্যে নগেন্দ্রনাথের এই ভুলটি ঘটেছে। আরো একটা সামান্য ভুল আছে, সেটা অবশ্য মুদ্রণ প্রমাদ— ভোজ সভায় উপস্থিত 'Fazakarley', যিনি পার্লামেন্টের সদস্য এবং Liberal party-র অন্তর্গত ছিলেন, তিনি নগেন্দ্রনাথের গ্রন্থে 'Fazakar Aly'-তে পরিণত হয়েছেন।

(১০৬) Edward Stanley তাঁর ডায়েরিতে ('Journal') ১৮৩১ সালের ১৭ই আগস্ট লিখেছেন, 'What a difficult case is that of Rammohan Roy—so totally different from anything one has the experience of. His starting-point so different—his grand object having been to throw aside all the mysteries and miracles of his own religion to get at the real essence of it, in which he is quite right; and yet when he naturally follows the same process in our religion, he finds himself, to his great surprise, quite wrong. He is certainly no more a Christian than I should be a Mahometan because I made extracts of what I thought good in the Koran, but he seems a wonderful man in having done so much, and one can entirely enter into the difficulty of his making another step in advance, with the specimens he has had since he came here of both Christian practice and doctrine, and his not being able to understand the professional technical language of the clergy of all sects that have been with him, or to make himself understood by them.'.—'Memoirs of Edward and Catherine Stanley' (London. 1879) Edited by their son Arthur Penrhyn Stanley, DD. p.294.

(১০৭) 'The agitation for Reform swept like a storm over the land; the Crown, the House of Lords, the House of Commons as it was then constituted,—all existing institutions seemed for a while endangered, and there was that uneasiness and excitement in the public mind which presage and sometimes prepare a revolution. In such moments, politics become, of course, the paramount subject of interest'.—'Lord Beaconsfield : A Biography' (London, Belfast : 2nd edition, 1879) T.P.O' Connor, p. 43.

(১০৮) ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে Miss Kiddell-কে লিখিত পত্রে রামমোহন Reform Bill সম্বন্ধে বলেছেন, '·· on the success of which the welfare of England, nay of the world depends', জুলাই মাসে William Rathbone-কে পত্রে বলেছেন,'···salvation of the nation, nay, of the world'—'The Life and Letters of Raja Rammohan Roy' (1962) S. D Collet, p. 333.

(১০৯) Ibid, p. 313.

(১১০) ১৮২৮ সালের জুলাই মাসে আয়ারল্যাণ্ডের 'Clare' কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হলেও Daniel O'Connell পার্লামেন্টে প্রবেশাধিকার পাননি। ১৮২৯ সালের এপ্রিলে Catholic Emancipation Bill বিধিবদ্ধ হলেও পার্লামেন্টে প্রবেশাধিকারের জন্য তাঁকে পুনরায় নির্বাচন যুদ্ধে নামতে বাধ্য করা হয়। তবে এবার নির্বাচিত হয়েও ক্যাথলিক O'Connell পার্লামেন্টের প্রচলিত শপথবাক্য পাঠ করতে অস্বীকার করায় ইংল্যাণ্ডে ভীষণ অস্বস্তিকর অবস্থার সৃষ্টি হয় ('Daniel' O Connell and the Revival of National life in Ireland', London: 1908. Robert Dunlop, p. 221) আয়ারল্যাণ্ডের বিভিন্ন অঞ্চলে ক্ষুব্ধ-অপমানিত আইরিশরা নানা নাশকতা-মূলক কাজকর্ম শুরু করে। প্রায় বৎসর দেড়েক এরূপ অবস্থায় কাটবার পর ১৮৩০ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী তিনি প্রথম House of Commons-এ তাঁর আসনে বসতে পান। এমন 'বিতর্কিত' ব্যক্তিটি এই সময়েই আবার দুটি বিশেষ ঘটনায় ইংল্যাণ্ডের সর্বস্তরের মানুষের কাছে আলোচনার বস্তু হয়ে পড়েন।

সারা অষ্টাদশ শতাব্দী জুড়ে আয়ারল্যাণ্ডের সর্বশ্রেণীর মানুষের চারিত্রিক মান খুবই নিম্নগামী ছিল—পোষাক পরিচ্ছদ ইত্যাদিতে চূড়ান্ত বাবুগিরি, অপরিমেয় মদ্যপান, স্ত্রীলোকের জন্য লড়াই (duel), বলপূর্বক নারীহরণ ('forcible abduction') এগুলি, 'through nearly the whole of the eighteenth century, probably more common in Ireland than in any other European country, and it prevailed both among the genty and among the peasants.' ('The Leaders of Public Opinion in Ireland'. London, new edition, 1871. Willam Edward Hartpole

Lecky, pp 250-251) জাতীয় চরিত্রের এই অধঃপতন O'Connell সাহেবের প্রথম জীবনে দেখা দিয়েছিল বলে Lecky তাঁর পূর্বোক্ত গ্রন্থে (পৃঃ ৩১৯) জানিয়েছেন। আমাদের আলোচ্য সময়কালে দেখা যায় যে Ellen Courtney নাম্নী জনৈকা মহিলার সঙ্গে O'Connell দীর্ঘদিন অবৈধভাবে যুক্ত আছেন এবং O'Connell-এর ঔরসে উক্ত মহিলার গর্ভজাত পুত্রকে O'Connell-এর বিবাহিতাপত্নীর পুত্রেরা রাস্তায় মারধোর করেছে, এই সংবাদ Times পত্রিকা মারফৎ প্রকাশিত হওয়ায় আইরিশ-বিদ্বেষী ইংল্যাণ্ডের জনসমাজ তা রসিয়ে রসিয়ে উপভোগ করতে থাকে। [প্রায় ৭০ বৎসর বয়সেও রাজদ্রোহের অপরাধে জেলে আবদ্ধ (৩০শে মে থেকে ৭ই সেপ্টেম্বর, ১৮৪৪) বিপত্নীক O'Connell একটি সুন্দরী যুবতীর প্রতি আসক্ত হয়ে তাকে বিয়ে করার জন্যে কি পরিমাণ ক্ষেপে উঠেছিলেন, সে কথা ঐ সময়ে ঐ জেলে একই অপরাধে আবদ্ধ Charles Gavan Duffy-র গ্রন্থে পাওয়া যায়। 'Young Ireland : A fragment of Irish history'. London, Paris and New York, 1880. Sir Charles Gavan Duffy, pp 530-531].

দ্বিতীয় ঘটনাটি হোল—Mr. Raphael নামক জনৈক ধনবান্ আর্মেনীয় O'Connell-এর বিরুদ্ধে এই সময়ে অভিযোগ করেন যে পার্লামেন্টের নির্বাচনে Raphael-কে প্রার্থীরূপে দাঁড় করাবেন এবং Whig-মন্ত্রিসভা থেকে Raphael-কে ব্যারনেটের খেতাব ('baronetsy') পাইয়ে দেবেন বলে O'Connell তাঁর কাছ থেকে টাকা খেয়েছেন। ঘটনাটিতে ইংল্যাণ্ডে ও আয়ারল্যাণ্ডে বিশেষ হৈচৈ সৃষ্টি হয় এবং লণ্ডনে এই অভিযোগের সত্যাসত্য নির্ণয়ের জন্য একটি 'Select Committee' গঠিত হয়। এই কমিটি তদন্ত করে শেষাবধি অবশ্য O'Connell-কে নির্দোষ বলে ঘোষণা করে। ঘটনাটির ফলশ্রুতি হোল, 'the controversy created a deep dislike in Ireland to the system of nominating obscure strangers to be Irish representatives'. ('Young Ireland', Sir Charles Gavan Duffy. p.6.)

আয়ারল্যাণ্ডের প্রতি রামমোহনের সহানুভূতি ও সেখানের দুর্ভিক্ষে রামমোহনের সাহায্য প্রেরণ, বিশেষতঃ রামমোহন তাঁরই মতো নিয়মতান্ত্রিক পথে দেশের মঙ্গলের জন্যে এতদূর দেশে এসেছেন, সম্ভবতঃ এসকল

সংবাদ O' Connell সাহেব জানতেন। বিশেষতঃ প্রায়-পারিবারিক বন্ধু ও আয়ারল্যাণ্ডের জাতীয় কবি Moore-এর কাছ থেকে রামমোহনের বিশাল ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে তিনি অবহিত হয়েছিলেন বলে মনে হয়। [১৮৩১-৩২ সালে O' Connell-এর সঙ্গে Moore-এর সম্পর্ক যে যথেষ্ট হৃদ্য ছিল তার বহু প্রমাণ Moore-এর ঐ সময়কার ডায়েরিতে আছে। পরে নানা কারণে সে সম্পর্কের দ্রুত অবনতি ঘটে এবং ১৮৩৬ সালে দুজনের মধ্যে কিছু দিনের জন্য প্রায় মুখ দেখাদেখি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল ('The Graville Diary', London : 1927. edited by Philip White well Wilson. p 142).

রামমোহনের সঙ্গে O' Connell-এর সাক্ষাৎ-পরিচয়ের কোন স্পষ্ট প্রমাণ এখনও পাই নি, তবে O' Connell সাহেবের দুটি রচনার তুলনা মূলক আলোচনা এবং তাঁব প্রধান সহকর্মী Richard Lalor Shiel-এর জীবনের একটি বিশেষ ঘটনা থেকে এ বিষয়ে কিছু পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়। O'Connell-এর মৃত্যুর ২৮ বৎসর পর তাঁর বক্তৃতা ও চিঠিপত্র ১৮৭৫ সালে ডাবলিন থেকে শ্রীমতী M. F. Cusack কর্তৃক 'The Speeches and Public Letters of the Liberator' নামে দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় খণ্ডের ৩৩১-৩৭০ পৃষ্ঠায় আয়ারল্যাণ্ডের বিখ্যাত রাজনীতিজ্ঞ বিশপ Rev Robert Daly-কে ১৮২৬ সালের ২২শে জুন তারিখে O' Connell সাহেবের লেখা ৩১-পৃষ্ঠাব্যাপী একটি পত্র আছে। পত্রটিতে মূলতঃ ধর্মতত্ত্ব (theology) নিয়ে আলোচনা করলেও O'Connell প্রসঙ্গতঃ অতি সংক্ষেপে ভারতীয় অর্থাৎ হিন্দুদের ধর্মাচরণের প্রতি কটাক্ষ করেছেন। খ্রীষ্টান পাদ্রী ও ভ্রমণকারীরা হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে যে মিথ্যা ও উদ্ভট কথা সারা ইউরোপে প্রচার করেছিল, O' Connell সাহেবের হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞান তখন পর্যন্ত তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তিনি পত্রের একস্থানে লিখেছেন, 'I donot know, nor can I conjecture, of what materials your mind may be composed—whether it be, as I suspect, imbued with sour secterianism, of so bitter and ungenerous a nature that your worship rather resembles the fear-inspired invocation of the demon by the ignorant Indian, that

charitable and humble hope, which I think Christianity was formed to create and foster'. (p. 355) ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তিনি যে ভুলধারণা পোষণ করে আসছিলেন এবং এজন্য যে মূলতঃ ইংরেজি পত্র-পত্রিকাগুলিই দায়ী, একথা O'Connell সাহেব ১৮৩৩ সালের ৮ই অক্টোবর (রামমোহনের মৃত্যুর ১১ দিন পরে) তাঁর নির্বাচক-মণ্ডলীর ('To my Constitute') উদ্দেশ্যে প্রায় ৬০-পৃষ্ঠাব্যাপী পত্রের 'Indian Reform Bill' বিষয়ক (৫ পৃষ্ঠাব্যাপী) আলোচনায় একাধিক বার বলেছেন। এই অংশটিতে দেখা যায় ভারতের ঐ সময়কার খুঁটিনাটি অবস্থা সম্পর্কেও O' Connell কি পরিমাণ ওয়াকিবহাল। ইতিমধ্যে পার্লামেণ্ট কর্তৃক গঠিত 'Select Committee'-র সামনে ভারতের ভূমি, রাজস্ব, আইন ইত্যাদি সম্পর্কিত নানা প্রশ্নের লিখিত উত্তর রামমোহন দাখিল করেছিলেন এবং সেগুলি ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকেই লণ্ডনের 'Smith Elder & Co' দ্বারা পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। এগুলি O'Connell অবশ্যই পড়েছিলেন—East India Company-কে পুনরায় ভারত শাসনের অধিকার (charter) দেওয়ার বিষয়ে তিনি পার্লামেন্টে দিনের পর দিন কঠোর সমালোচনা করেন বলে তিনি স্বয়ং তাঁর এই পত্রে জানিয়েছেন। এই সমালোচনার মালমশলা তিনি প্রধানতঃ রামমোহনের পুস্তিকাদি থেকেই পেয়েছিলেন বলে মনে করি। তবে শুধু রামমোহনের পুস্তিকাগুলি পাঠ করাই নয়, এই পত্রে ভারতের সম্পর্কে বৎসর সাতেক পূর্বের অবজ্ঞার বদলে যে একটা শ্রদ্ধার ভাব ফুটে উঠেছে, O' Connell-এর দৃষ্টিভঙ্গীর এই মৌলিক পরিবর্তন যে রামমোহনের সঙ্গে তাঁর সাহচর্যের ফলেই সম্ভব হয়েছিল, এবিষয়ে আমাদের কোন সন্দেহ নেই।

১৮২৩ সালে ইংরেজ সরকার কর্তৃক সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ-প্রচেষ্টার ফলে রামমোহনের বন্ধুস্থানীয়, 'Calcutta Journal-এর সম্পাদক James Silk Buckingham (1786-1855) ভারতবর্ষ থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন। লণ্ডনে এসে পত্রিকাদি সম্পাদনা ও নানা বিষয়ে গ্রন্থাদি রচনা দ্বারা অচিরে তিনি সেখানকার সমাজে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন এবং ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে Shefield কেন্দ্র থেকে পার্লামেন্টের সভ্যরূপে নির্বাচিত হন। O'Connell সাহেবের দক্ষিণ-

হস্তস্বরূপ Richard Lalor Shiel ১৮৩২ সালে আয়ারল্যাণ্ডের Tippearary কেন্দ্র থেকে পার্লামেন্টের সভ্যরূপে নির্বাচিত হন। কিছুদিন পরেই পার্লামেন্টের Mathew Devonshire Hill নামক সদস্য Sheil-এর চরিত্র-হনন করেছেন বলে Shiel অভিযোগ করেন। Lord Althrop'ও পার্লামেন্টে Shiel-এর বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করলে ঘটনাটি মারাত্মক আকার ধারণ করে। শেষাবধি Shiel-এর উত্থাপিত দাবী Sir. Robert Peel কর্তৃক সমর্থিত হলে বিষয়টি তদন্ত করার জন্য পার্লামেন্ট Sir Robert Peel ও Sir. Henry Hardinge-এর নেতৃত্বে একটি Committee গঠন করে। এই Committee-র সামনে পার্লামেন্টের সদস্য Daniel O'Connell হিল-সাহেবকে জেরা করেন, 'Mr Devonshire Hill was examined by Mr. O'Connell—after stating that his information was Mr Silk Buckingham, who now denied that he had ever meant to convey such an impression to Mr. Shiel…' শেষাবধি Hill সাহেব উচ্চস্বরে কাঁদতে কাঁদতে Shiel-এর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করায় ঘটনাটির পরিসমাপ্তি হয়। ['The Speeches of the Right Honourable Richard Lalor Shiel, with Memoir by Thomas Macnevin', Dublin : 2nd edition, Nodate, pp 37-38] এই ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে Buckingham-এর মধ্যস্থতায় সেকালের লণ্ডনে উপস্থিত দুই 'বিখ্যাত' ব্যক্তি রামমোহন এবং Daniel O'Connell-এর আলাপ-পরিচয় হওয়া সম্ভব বলে মনে করি।

(১১১) Benjamin Disraeli (1904 ? 1805-1881) ১৮৩৩ সালের ১লা সেপ্টেম্বর তাঁর খণ্ডিত ডায়েরি ('Mutilated Diary')-তে লিখেছিলেন, 'Poetry is the safety valve of my passions, but I wish to act what I write.…My works are embodification of my feelings In Vivian Grey I have portrayed my active and real feeling. In Alroy my ideal ambition. Contarini Fleming, the Psychologial Romance, is a development of my poetic character. This trilogy is the secret history of my feelings'. ('The Life of Benjamin

Disraeli, vol-I'. London : 1929. W. F. Monypenny and G. E. Buckle, p 240.) প্রথম প্রকাশিত 'Vivian Grey' (1826) উপন্যাসের প্রথম পৃষ্ঠাতেই Disraeli জীবনের উচ্চাভিলাষ আপনার্থে motto-স্বরূপ মুদ্রিত করেছিলেন, 'Why, then, the world's mine oyster, which I with sword will open'. ১৮২৮ সালে প্রকাশিত 'Papanlilla' উপন্যাসে Disraeli-র প্রচণ্ড অহং জ্ঞান তাঁর লেখক-বন্ধু Bulwer Lytton-এর মনে ভীতি সঞ্চার করেছিল। ১৮৩১ সালে প্রকাশিত উপন্যাস 'The Young Duke' এর নামকরণ তাঁর লেখক-পিতাকে পর্যন্ত বিভ্রান্ত বিমূঢ় করেছিল। ১৮৩২ সালের মে মাসে প্রকাশিত আত্মজীবনী-মূলক 'Contarini Fleming' উপন্যাসের নায়কের মুখ দিয়ে তিনি ঘোষণা করেছিলেন, I longed to wave my inspiring sword at the head of the armies'. উপন্যাসটির অন্যত্র নায়কের মুখ দিয়ে বলিয়েছিলেন যে নায়কের পিতা 'placed his arms affectionately in mine, and said to me, 'My son, you will be the Prime Minister of—; perhaps something greater,' ১৮৩৩ সালের মার্চে প্রকাশিত 'The Wonderous tale of Alroy' উপন্যাসেও উচ্চাভিলাষী ডিসরেলীর ব্যক্তি-জীবনের ছায়াপাত ঘটেছে।

১৮৩০ সালের জুনের শেষ দিকে William Meredith-এর সঙ্গে ডিসরেলী যখন সিরিয়া, ইরাক, ঈজিপ্ট প্রভৃতি অঞ্চলে ভ্রমণোদ্দেশ্যে বহির্গত হন, তার পূর্ব থেকেই ইংল্যাণ্ডের আবহাওয়া উত্তপ্ত হতে শুরু হয়েছিল। ইহুদীদের ইংল্যাণ্ডে নানা অসুবিধা দূরীকরণের জন্য পার্লামেন্টে Robert Grant কর্তৃক এই এপ্রিলে উপস্থাপিত 'Jewish Emancipation Bill'-এর পক্ষে ও বিপক্ষে Lord John Russell এবং Sir Robert Peel-এর মধ্যে তুমুল বাক্‌যুদ্ধ হয়ে যায় এবং ১৭ই মে (১৮৩০) নবাগত সদস্য Daniel O'Connell বিলের পক্ষে জোর ওকালতি করেন ('Speeches and Public Letters of the Liberator, vol. I,' Dublin ; 1875, Cusack, pp. 59-62)। ডিসরেলী-পরিবারের হিতৈষী সলিসিটার Austen-এর পত্নী Sara Austin ১৮৩০ সালের জুলাই মাসে বিদেশীবাসী Disraeli-র উচ্চাকাঙ্ক্ষা উদ্রিক্ত

করতে এক পত্রে লিখেছিলেন, 'I should have liked you to have had a picking out of this general election ; it should be a famous opening and lots to say'. (Monypenny & Buckle, pp. 205-206) বিদেশ ভ্রমণকালে ডিসরেলী 'Alroy' ও 'Contarini Fleming' লিখেছেন এবং 'Galignani' পাঠ করে ইংল্যাণ্ডের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে বিশেষ ওয়াকিবহাল থাকতেন। এই সময়ে পিতা, ভ্রাতা ও ভগ্নিকে লিখিত পত্রগুলির মধ্যে (এরূপ ১৪টি পত্র ১৮৮৫ সালে ভ্রাতা Ralph Disraeliকর্তৃক 'Home Letters' নামে প্রকাশিত হয়) ২৮ শে মে (১৮৩১) ভগ্নি Sarah-কে লিখিত সর্বশেষ পত্রের মধ্যে পার্লামেন্টে (১লা মার্চ, ১৮৩১) উপস্থাপিত 'Reform Bill' সম্পর্কে তাঁর কৌতূহল ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার আভাস পাওয়া যায়। ২৪শে জুলাই (১৮৩১) ডিসরেলী লণ্ডনে ফেরেন—উপস্থাপিত Reform Bill 'লর্ডস সভা' কর্তৃক পরিত্যক্ত হওয়ায় এই দিনই পার্লামেন্ট ভেঙ্গে যায় এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের বহুস্থানে দাঙ্গা শুরু হয়। সাহিত্যিক ডিসরেলীও সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতিকে অবলম্বন করে আত্মপ্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হলেন।

Lord George Bentinck-এর জীবনী লিখতে গিয়ে Disraeli যে কথা বলেছিলেন, 'A literary man who is a man of action, is a double-edged weapon'. ('Lord George Bentinck : A Political Biography,' London : 5th edition, 1852, p. 15) সেকথা এই সময়কার Disraeli-র পক্ষে বিশেষভাবে খাটে। Tory-দলের সমর্থক বিত্ত-কৌলীন্যহীন ইহুদী পরিবারের সন্তান Disraeli পার্লামেন্টে প্রবেশের জন্য সিংহবিক্রমে ('Lord Beconsfield', London 4th edition, 1890, by J A. Froude, p 49) উঠে পড়ে লাগলেন। 'In England of 1831, this world of politics was indisguisable from the world of fashions. The entrance to Parliament lay through the drawing-rooms'. ('Disraeli', London : Reprinted 1927, Andre Maurois, translated by Hamish Miles, p.58.) সুতরাং বুদ্ধিমান Disraeli লণ্ডনের সর্বাধিক প্রভাবশালীনি অভিজাত মহিলা, যাঁর বাড়িতে ইংল্যাণ্ডের প্রধান মন্ত্রী থেকে আরম্ভ করে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের নিয়মিত যাতায়াত ছিল, সেই Lady

Blessington-এর সজ্জিত বৈঠকখানায় দিনের পর দিন হানা দিতে সুরু করলেন। ('The Most Gracious Lady Blessington', London: 4th edition, 1897, by J.Fitzerald Molloy, pp 232-240)। এছাড়া বিচিত্র পোষাকে সজ্জিত হয়ে Lady Cork, Lady Eliot প্রভৃতির বৈঠকখানাতেও তাঁর রীতিমতো আবির্ভাব ঘটতে লাগলো। "Black velvet coat, poppy-coloured trousers broidered with gold, a scarlet waist coat' -ভূষিত ডিসরেলী মূর্তি দেখে Carlyle তাঁকে 'a fantastic ape' বলে উল্লেখ করেছিলেন। ('The Most Gracious Lady Blessington, p 243.) এবং Mr. Motleyকে Lady Dufferin বলেছিলেন 'he (Disraeli) made a fool of himself by appearing in such fantastic shape, never guessing for what reason it had been adopted.' (Froude, p 53) লেখক-বন্ধু Lytton-এর বাড়ি তো তাঁর প্রায় নিজের বাড়ি হয়েই দাঁড়িয়েছিল। সেকালে এমন কোন 'party' হোত না, যাতে Disraeli উপস্থিত না থাকতেন ('Disraeli', London : MCMXXVII, by D.L.Murray, p 57.) এই সব পার্টিতে মহিলাদের সঙ্গে যেমন তিনি অবাধে মিশতেন, তেমনি বিখ্যাত-বিখ্যাত ব্যক্তিদের সঙ্গে প্রায় ঘাড়ে-পড়ে তিনি আলাপ পরিচয় করতেন। ১৮ই এপ্রিল (১৮৩২) ভগ্নি সারা-কে কবি Thomas Moore-এর সঙ্গে তাঁর আলাপের কথা বর্ণনা করতে লিখেছেন, 'I stumbled over to Tom Moore, to whom I introduced myself'.) অতঃপর Moore-এর সঙ্গে তাঁর সামান্য কথাবার্তা বর্ণনার পরেই তিনি লিখেছেন, 'Romohun Roy was there' ('Lord Beconsfield's Correspondence with his sister. 1832-1852', London, 1886, p.7) যে ভাবে তিনি সংক্ষেপে রাম-মোহনের নাম উচ্চারণ করেছেন, তাতে বোঝা যায় রামমোহন ইতিমধ্যেই ডিসরেলী পরিবারেও বিশেষ পরিচিত হয়ে গিয়েছেন।

১৮৩২ সালের প্রথম দিক থেকেই High Wycombe কেন্দ্রের দুটি আসনের মধ্যে একটি থেকে নির্বাচিত হওয়ার জন্যে তিনি প্রবল উদ্যমে বিভিন্ন পার্টি ও ড্রইংরুমে যাওয়া ও বিখ্যাত ব্যক্তিদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে ওঠার চেষ্টাকে

বাড়িয়ে দেন। ('London in those days had a Watteau-like Charm : dinners, balls, river-parties. Disraeli shared in every thing'. Andre Maurois, p 65), নির্বাচনের সুবিধার্থে তিনি Daniel O' Connell, Hume, Sir Francis Burdett প্রভৃতির প্রশংসাপত্র সংগ্রহ করে তার কোন কোনটিকে রাস্তায় পোষ্টার হিসাবে মারতে শুরু করে দিয়েছেন। বস্তুতঃ পক্ষে পার্লামেন্টে প্রবেশার্থী প্রায়-উন্মত্ত Disraeli-র (মুখে Reformer বলে ঘোষণা করলেও) এই সময়ে কোন নীতিই ছিল না, অর্থাৎ তিনি Whig, Tory, Reformer ঠিক্ কোন পার্টির অন্তর্ভুক্ত, এটি শুধু সাধারণ লোকই নয়, তাঁর ভগ্নি পর্যন্ত ধরতে না পেরে শঙ্কিত হয়েছেন, তাঁর নির্বাচনী প্রচারের যিনি প্রধান, Mr. Huffam, তিনিও বিভ্রান্ত হয়েছেন। এই সময়েই ডিসরেলীকে 'unscrupulous time-server' (Monypenny & Buckle, p. 215) বলে লোকের ধারণা হয়। এই সময়ে Lady Blessington-এর বিখ্যাত মজলিশেও রামমোহনের সঙ্গে সেখানের নিয়মিত-অতিথি Disraeli-র সাক্ষাৎ-পরিচয় ঘটে থাকতে পারে ['The Most Gracious Lady Blessington' গ্রন্থের ১১৪ পৃষ্ঠায় কিছু বিশিষ্ট নামের সঙ্গে 'Indian Princes' শব্দটি আমাদের এরূপ অনুমানের কারণ]। বিশেষ করে Thomas Moore-এর ডায়েরিতে প্রাপ্ত Lytton Bulwer-এর বাড়িতে সমবেত বিখ্যাত ব্যক্তিদের মধ্যে পাশাপাশি বসা রামমোহন ও ডিসরেলীর চিত্র থেকে বোঝা যায় যে ঐ সময়কার লণ্ডনের বিখ্যাত পুরুষ, যাঁর সঙ্গে রাজনীতি বিষয়ে আলোচনার জন্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা দিনের পর দিন দলে দলে গিয়েছিলেন, সেই রামমোহনের সঙ্গে উচ্চাকাঙ্ক্ষী Disraeli সাহেবও নিজের গরজেই ইতিপূর্বে দেখা করেছিলেন (ডিসরেলীর পত্রে রামমোহনের উল্লেখ এই সিদ্ধান্তকেই সমর্থন করে।) ১৮৩২ সালের ১লা এপ্রিল তারিখের ডায়েরির একেবারে শেষে Moore লিখেছেন, 'Went to Mrs. Lytton Bulwer's assembly, and found such a Collection as is seldom brought together ; there was young Disraeli, and Rammohun Roy, and Lord Mulgrave, and Mrs. Leigh (Lord Byron's sister), and Godwin···'. ('Memoirs···Thomas Moore, vol-VI,' p 257)

(১১২) এ বিষয়ে Mary Carpenter রচিত 'The Last Days in England of the Rajah Rammohun Roy' (1915) গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

(১১৩) ১৮৩৩ সালের ৮ই অক্টোবর তারিখে Daniel O'Connell-এর নির্বাচক মণ্ডলীর উদ্দেশ্যে প্রকাশিত 'To my Constitute' শীর্ষক বিশাল ইস্তাহারের ভারতবর্ষ সম্পর্কিত অংশটি পড়লে বোঝা যায় যায় ভারতবর্ষের ভূমি, রাজস্ব, আইন ইত্যাদি সম্পর্কে তাঁর ধারণার মূল উৎস রামমোহনের ঐ সময়ে 'Smith Elder & Co' দ্বারা প্রকাশিত পুস্তিকাগুলি। ভারতে East India Company-র অমানবিক শাসনব্যবস্থার উল্লেখ করে এখানে তিনি বলেছেন, 'But the limits of a letter are insufficient to explain the vicious and atrocious conduct of the East India Company towards the Natives; the grinding and desolating effects of what is called 'the land revenue'. It is a system of monstrous ond perfect oppression' (p 420) কিন্তু এত চেষ্টার পরেও যে East India Company-কে পুনরায় ভারত শাসনের সনদ দেওয়া হোল, যার সঙ্গে ভারতের 'The destinies of more than one hundred millions of human beings are involved' (p. 418), তাতে 'India for self-government' (p. 419) এর অনুমাত্র সুযোগ তো ছিলই না. পরন্তু 'The new India Bill does not go the root of the evil. It does indeed little to ameliorate the state ot the Natives' (p. 420),এটি কান্তদর্শীর মতো O' Connell সাহেব স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলেন। ভারতের জমির সমস্যা, জমিদারদের ঔদাসীন্য, খাজনা ও খাজনা আদায়ে চূড়ান্ত অত্যাচার এবং আইনের (বিচারের) তারতম্য (তাঁর ভাষায়, 'The most defective and multifarious scheme, or plan, or rather hotch-potch, ot administration of law', p. 421 ইত্যাদিকে পাঁচটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করে তিনি সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন। ফলতঃ এই সূত্রেই তিনি ইংরেজ-শাসিত আয়ারল্যাণ্ড ও ভারতবর্ষের মধ্যে বিশেষ সাদৃশ্য দেখতে পেয়ে লিখেছিলেন, 'There is another strange coincidence between the history of India and the sad

story of Ireland. The subjugation of the former was only the enactment on a broader scale of the system of rapacity and deception by which the latter was subjugated' (p 421.) ভারতের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে সাধারণ লোকের অজ্ঞতার মূল কারণ যে ইংরেজি পত্রপত্রিকাগুলির শঠতানি, এসম্পর্কে তিনি একাধিকবার পত্রে উল্লেখ করেছেন, যেমন 'Much of this inattention was occasioned by the ignorance or gross miscondnct, or both, of the reporters. The debates of the East India Bill were but all suppressed. A miserable, inaccurate outline of these debates was all that was given to the public' (p 420). Daniel O' Connell-এর এই পত্রটি M. F. Cusack-এর 'The Speeches and Public Letters of the Liberator' (Dublin, 1875) গ্রন্থের ২য় খণ্ডে প্রাপ্তব্য।

(১১৪) 'The life of Lord John Russell, vol-I,' (London : 1891) Spencer Walpole, p 180.

(১১৫) 'The Last Days in England of the Rajah Rammohan Roy' (1915) Mary Carpenter, pp 212-213.

(১১৬) 'Our freedom struggle in England'. Joges Chandra Bagal 'Modern Review,' December, 1948.

(১১৭) 'আয়র্লণ্ড, বঙ্গদেশ ও রবীন্দ্রনাথ : রবীন্দ্রচর্যা' (১৩৯২) দেবীপদ ভট্টাচার্য।

(১১৮) 'The chief, indeed practically the only food of the Irish peasantry then, as now, was the potato…'—'An out line of Irish History' (London, তারিখ নেই) Justin H. McCarthy, p 88.

(১১৯) 'Memoirs of Dwarakanath Tagore' (1870) গ্রন্থে কিশোরী চাঁদ মিত্র লিখেছেন 'Dwarakanath left for Ireland in the autumm of 1845' (p 109). শরৎকাল ('autumn') যে আয়ারল্যাণ্ড

ভ্রমণের সর্বাধিক প্রশস্ত সময় এটি প্রায় ঐ সময়ে আয়ারল্যাণ্ড ভ্রমণকারিণী শ্রীমতী Catherine M.Connell-এর 'Excursions in Ireland, during 1844 and 1850, with a visit to the late Daniel O'Connell' (London: 1852) গ্রন্থ থেকেও পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন, 'Best season of visiting Killerney··· preferably the autumnal months' (p 76) 'রবীন্দ্র চর্চা (১৩৯২) গ্রন্থের 'আয়র্লণ্ড, বঙ্গদেশ ও রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে দেবীপদ ভট্টাচার্য দ্বারকানাথের আয়ারল্যাণ্ড ভ্রমণের মাসটিকে 'আগষ্ট' বলে উল্লেখ করেছেন, আমরা সময়টিকে আর একটু পিছিয়ে সেপ্টেম্বরের শেষদিক বা অক্টোবরের প্রথম দিক ধরার পক্ষপাতী।

(১২০) Daniel O'Connell নিয়মতান্ত্রিক পথে আন্দোলনাদির দ্বারা, বিশেষ ভাবে ইংল্যাণ্ডের ক্ষমতাসীন Whig Party-র সঙ্গে দীর্ঘদিন আঁতাত পাতিয়ে আয়ারল্যাণ্ডের সুবিধা আদায়ের জন্য যে চেষ্টা করছিলেন, তা কেল্টিক স্বাতন্ত্র্যাভিমানী আইরিশদের, বিশেষতঃ জাতীয়তাবাদী উগ্রপন্থী যুবকদের আদৌ গ্রহণযোগ্য ছিল না। তাছাড়া 'Repeal Association' -এ O'Connell-এর 'Dictator' ও 'Boss'-সুলভ মনোভাব, বিশেষ করে তাঁর দ্বিতীয় পুত্র John O'Connell, M.P, (জন্ম: ১৮০৬), যিনি বৃদ্ধ-পিতাকে অনেকটা শিখণ্ডির মতো খাড়া করে পিছন থেকে কলকাটি নেড়ে মাতব্বরী করছিলেন, তাঁর সে হীনচক্রান্ত অনেকের পক্ষেই অসহনীয় হয়ে উঠেছিল। এর উপর Association-এর সভ্য হবার জন্যে যে বিশেষ ধরনের শপথ (oath) গ্রহনের ব্যবস্থা চালু হয়েছিল, তাও ছিল অনেকের পক্ষে অবমাননাকর। ইতিমধ্যে Charles Gavan Duffy কর্তৃক ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই অক্টোবর থেকে প্রকাশিত 'The Nation' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে 'Young Ireland' নামে যে সমিতিটি গড়ে তোলার চেষ্টা হচ্ছিল, যার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন Smith O'Brien, John Mitchell, Thomas Davis, Francis Meaghar, John Blake Dillon প্রভৃতি উগ্রপন্থী যুবক. তাঁরা হিংসাত্মক পথে দেশের স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেওয়ারই পক্ষপাতী ছিলেন। এই সব কারণেই Daniel O'Connell-এর সংগঠনের মধ্যে বিভেদ ঘটে।

(১২১) ১১০-সংখ্যক পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

(১২২) কিশোরী চাঁদ মিত্র এ-বিষয়ে তাঁর 'Memoirs of Dwarakanath Tagore' (1870) গ্রন্থে লিখেছেন, 'In company with O'Connell, he visited the lakes of Killerney and other lions. With O'Connell he used to exchange ideas on political questions, but he never sympathised with the extreme views of the great demagogue for the repeal of the Union and the regeneration of Ireland' (pp 115-116)'. কিশোরী চাঁদ মিত্রের এই অংশটি দেবীপদ ভট্টাচার্যের 'রবীন্দ্র চর্যা' গ্রন্থের আয়র্লণ্ড, বঙ্গদেশ ও রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধে একটু ভিন্নভাবে উদ্ধৃত হয়েছে, 'They discussed their common problems as subjects of foreign rule ; but when O'Connell saw the solution as independence, Dwarakanath looked forward to a stronger opinion based on racial and religious equality.'

(১২৩) এই ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের কথা আইরিশরা কোন দিন ভুলতে পারেনি। বিখ্যাত আইরিশ নাট্যকার George Bernard Shaw (1856-1950) তাঁর 'Man and Superman' (1903) নাটকের চতুর্থ অঙ্কে 'Violet' ও' Malone' এই দুটি চরিত্রের সংলাপের মধ্যে সেই দিনগুলির কথা এইভাবে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, 'Malone—Me father died of starvation in Ireland in the black 47 May be youve heard of it. Violet—The Famine ? Malone [with smouldering passion] No, the starvation. When a country is fullo food, and exporting it, there can be no famine, Me father was starved dead and I was starved out to America in me mother's arms, English rufe drove me and mine out of Ireland'.

(১২৪) Ireland' (London : 5th edition, MDCCCXCII) The Hon'ble Emily Lawless, p. 399.

(১২৫) ইংরেজ সরকার ভারতবর্ষ থেকে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত আয়ারল্যাণ্ডে শস্য আমদানি করার আশ্বাস দিয়েছিল (কাজে তা করা হয়নি) এবং লোক-দেখানো সামান্য কয়েকটি Relief Committee স্থাপন করেছিল, সেগুলি

যে কি পরিমাণ অপদার্থ ছিল, তা এই সময়ে Lord John Russell-এর লেখা এবং Lord Russell-কে লেখা Lord Bessborough, H. Lobouchere, Sir. Charles Wood প্রমুখের পত্রগুলি পড়লে বোঝা যায় ('The Later Correspondence of Lord John Russell, 1840-1878, vol-I', (London : 1925), pp. 149-172) পক্ষান্তরে Daniel O'Connell ১৮৪৬ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী 'Famine and Disease in Ireland' নামে যে বক্তৃতা করেন, সেখানে ১৮৪২-৪৫ সালে আয়ারল্যাণ্ড থেকে গম, যব, ওট প্রভৃতি শস্যের রপ্তানীর যে পরিসংখ্যান দিয়েছেন, তাতে দেখা যায় যে ১৮৪২ সালে দুর্ভিক্ষ-কবলিত আয়ারল্যাণ্ড থেকে সৈন্য পাহারায় তিন থেকে তিনগুণ পরিমাণ শস্য ১৮৪৫ সালে রপ্তানী করা হয়েছে। 'The Speeches and Publie Letters of the Liberater, Vol-I (Dublin, 1875) M.F. Cusack, p. 146.

(১২৬) 'A duke of the blood royal remarked, 'I understand that the rotten potatoes and sea-weed, or even grass properly mixed, afford a very whole-some and nutritious food. We all know that Irish man can live upon anything, and there is plenty of grass in the fields, even if the potato crop should fail'.—'Daniel O' Connell and the Revival of National life in Ireland' (New York & London : 1908) Robert Dunlop. M. A. p. 370.

(১২৭) 'An outline of Irish history' (London : No date) Justin H. McCarthy, p. 89.

(১২৮) Ibid, pp 94-96.

(১২৯) 'Ireland' (London: 5th edition, MDCCCXII) Hon'ble Emily Lawless, p. 404.

(১৩০) 'Our freedom struggle in England'. J. C. Bagal. 'Modern Review', December. 1948.

(১৩১) 'Dictionary of National Biography, Vol-XV' (Reprinted, 1973) p. 925.

(১৩২) 'The Diaries of John Bright'. (London : 1st published,

1930) with a forward by Philip Bright. ১৮৫৩ সালের ৩১শে মে তারিখের Diary-তে Bright লিখেছেন, 'House questions on India. Contrary to all rumour and expectation; the Government announced their intention to bring forward their India Bill on Friday. Debate on Irish Church going on, Lord John (Russell) spoke most liberally on the subject, which forced me to reply. Considered to be effective by my friends, judging from the Cheers···' (p 145) ৩রা জুন (১৮৫৩) তারিখে তিনি লিখেছেন, '···House. Sir Charles Wood spoke from ½ past 5 to ½ past 10 indefending Indian Government and explaining his proposed measures···When the minister sat down I rose and spoke from ½ past 10 to ½ past 12, answering many of his statements, and attacking his plan of amending the Court of Directors. The House quiet and interested. I never spoke with more ease and satisfaction. So many compliments and congratulations when I sat down as to force me to ask myself whether I was not more pleased at my own success that having done so many thing for good govt. in India···' (p. 145).

(১৩৩) 'Speeches on Questions of Public Policy by the Right Honourable John Bright, M. P' (New York : 8th edition, 1898) 'Preface', p VII.

(১৩৪) 'Young Ireland : A fragment of Irish history, 1840-1850' (London, 1880)-Sir Charles Gavan Duffy, p 348.

(১৩৫) ১১৩-সংখ্যক পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

(১৩৬) 'A history of Ireland under the Union, 1801-1922' (London : 1st edition, 1952) P. S. O' Hegarty, p. 416.

(১৩৭) 'A provisional government was established in the neighbourhood of Union Square, New York, with all

the array and mechanism of an actual working administration'.—'A history of our own times, Vol-IV, (London' 1908) Justin Mc Carthy, 130

(১৩৮) 'A history of our own times, Vol-IV'. (London : 1908) Justin McCarthy, p 130.

(১৩৯) 'British Paramountcy and Indian Renaissance, Part-II' (2nd edition 1981) General Editor : R. C. Majumdar, p. 253.

(১৪০) অন্যান্য কারণের মধ্যে প্রধান দুটি কারণের একটিহোল দাস ব্যবসা বন্ধ করার ব্যাপারে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যে মন-কষাকষির সুযোগে Divide et empera-নীতিতে পোক্ত ইংরেজ দক্ষিণ আমেরিকাকে মদত দিয়ে সেখানে গৃহযুদ্ধ বাধিয়ে দেয়, এবং দ্বিতীয়টি হোল ইংরেজ জাহাজ 'Albama' কর্তৃক আমেরিকার পণ্যবাহী জাহাজগুলিতে লুটপাট।

(১৪১) 'A history of our own times, vol-IV' (London : 1908) Justin McCarthy, pp 142-143

এই সময়ে পার্লামেন্টে আইরিশদের পক্ষে ওকালতি করতে গিয়ে Mill সাহেব কি পরিমাণ অপদস্থ হয়েছিলেন, সেকথার উল্লেখ পাওয়া যায় তাঁর আত্মজীবনীতে 'I was so unfavourably received by the House, that more than one of my friends advised me (and my own judgment agreed with the advice) to wait, before speaking again, for the favourable opportunity that would be given by the first great debate of the Reform Bill'. 'Autobiography,' (London 3rd edition, MDCCCLXXIV) p. 288.

(১৪২) 'A history of our own times, vol-IV' (London : 1908) J. McCarthy, p. 145.

(১৪৩) Ibid, p. 149.

(১৪৪) 'Our freedom struggle in England.' J.C. Bagal. 'The Modern Review', December, 1948 p. 463.

(১৪৫) বিলাত থেকে প্রত্যাবর্তনের পর সুরেন্দ্রনাথ ১৮৭৫ সালের জুলাই থেকে

ডিসেম্বরের মধ্যে যে বক্তৃতাগুলি করেছিলেন, সেগুলি পাইনি। তবে ১৮৭৬ থেকে ১৮৯৪ সালের মধ্যে প্রদত্ত বক্তৃতাগুলি (সবগুলি নয়, অনেকগুলি) রামচন্দ্র পালিত কর্তৃক দুইখণ্ডে (১৮৭৬-১৮৮০ এবং ১৮৮০-১৮৮৪) এবং রাজ যজ্ঞেশ্বর মিত্র কর্তৃক দুই খণ্ডে (১৮৮৪-১৮৯১ এবং ১৮৯১-১৮৯৪) সঙ্কলিত ও প্রকাশিত হয়। এই চারখণ্ডে দেখা যায় যে সুরেন্দ্রনাথ তাঁর অনেকগুলি বক্তৃতাতেই আয়ারল্যাণ্ডের দুর্দশা ও সমকালীন আইরিশ নেতাদের নামোল্লেখ সহ কীর্তিকলাপের কথা বলেছেন।

ক্ষীরোদকুমার দত্তের 'অনুশীলন সমিতির পি, মিত্র' (তারিখহীন), 'Hooghly College Register, 1836-1936' (1936), বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত সম্পাদিত 'Freedom Struggle and Ausilan Samity' (March 1979), জীবন তারা হালদারের 'অনুশীলন সমিতির ইতিহাস' (৪র্থ সংস্করণ, ১৯৭৭) প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে প্রাপ্ত সংবাদাদি সংগ্রহ করে দেখা যায় আই, সি, এস. পরীক্ষার্থী রূপে প্রমথনাথ মিত্র (১৮৫১-১৯১০) ১৮৭১ বিলাতে যান এবং ১৮৭৫ সাল পর্যন্ত সেখানে অবস্থানকালে ঘোড়ায় চড়া, মুষ্টিযুদ্ধ, অসিচালনা প্রভৃতিতে পারদর্শিতা অর্জন করেন। এই সময়েই তিনি আইরিশ, ইতালীয়, রুশীয় প্রভৃতি দেশের বিপ্লব সংস্থা সমূহের কার্যকলাপ সম্বন্ধে অবহিত হয়েছিলেন। যুদ্ধবিদ্যা শেখবার জন্যে তিনি প্রথমে ইংল্যাণ্ডের ও পরে ফ্রান্সের সৈন্যবাহিনীতে প্রবেশের জন্যেও চেষ্টা করেন। ব্যারিষ্টার হয়ে দেশে ফেরার পরেও সশস্ত্র সংগ্রাম দ্বারা ভারতের স্বাধীনতা-অর্জনের স্বপ্ন তাঁর ছিল। ১৯০২ সালের ২৪শে মার্চ কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত 'অনুশীলন সমিতি'র সভাপতির পদে তিনি বৃত হন, এবং যুবকদের লাঠি খেলা, সাঁতার কাটা, ঘোড়ায় চড়া প্রভৃতি অনুশীলনে প্রভূত উৎসাহদান করেন। অব্যবহিত পরে তিনি ঢাকায় গিয়ে বিখ্যাত পুলিন দাশের নেতৃত্বে সেখানে ঐ সমিতির শাখা কেন্দ্র খোলেন। এইভাবে সারা দেশময় শক্তিশালী যুব-সম্প্রদায়ের সাহায্যে উপযুক্ত সময়ে সশস্ত্র-অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা তাঁর ছিল। তিনি একাধিকবার সে চেষ্টাও করেছিলেন বলে কোন কোন সূত্র থেকে জানা যায়। ১৯০৬ সালে 'নিখিলবঙ্গ বৈপ্লবিক সমিতি'-র এবং কলকাতায় সুবোধচন্দ্র মল্লিকের বাড়িতে অনুষ্ঠিত 'নিখিল বঙ্গ বিপ্লবী সম্মিলনে'র সভাপতি হয়েছিলেন এরূপ

উল্লেখও পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁর স্বপ্ন ও সাধ বাস্তবে রূপায়িত করবার পূর্বেই আকস্মিক সন্ন্যাস-রোগে ১৯১০ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর তাঁর দেহান্ত ঘটে। ইংরেজি ও বাংলায় লেখা তাঁর কয়েকটি গ্রন্থ আছে। কলকাতার বিখ্যাত বসু-মল্লিক পরিবারের সন্তান মন্মথচন্দ্র মল্লিকের (১৮৫৩-১৯২২) জীবনকথা-'Bengal-Past & Present' পত্রিকার জুলাই-ডিসেম্বর, ১৯৭৯ পত্রিকায় অমলেন্দু দে রচিত 'Raja Subodh Chandra Mallick and his times' নামক বিস্তৃত রচনায় পাওয়া যায়। মন্মথচন্দ্র উচ্চ-শিক্ষালাভার্থে ১৮৭১ সালের শেষ দিকে বিলাতে গিয়াছিলেন এবং ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ব্যারিষ্টার হন। প্রায় চার বৎসরের এই প্রবাস-জীবনে তিনি 'Artists' Crops of Volunteers' এবং 'University Voluntary Crops-এর সভ্য ছিলেন এবং ল্যাটিন, ফরাসী ও সংস্কৃত ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। লর্ড নর্থব্রুককে বিদায় অভিনন্দন জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে প্রস্তাব ও প্রস্তাবাদি গ্রহণের জন্যে কলকাতার টাউন হলে ১৮৭৬ সালের ২৪ শে এপ্রিল যে সভা অনুষ্ঠিত হয়, তাতে মন্মথচন্দ্র 'Lord Northbrook had not served India to the satisfaction of its people and Indians, therefore would not favour the idea of adopting a resolution in praising him' এই মর্মে সংশোধনী প্রস্তাব আনয়ন করেন। ঐ সভায় স্বয়ং বঙ্গেশ্বর Sir Richard Temple উপস্থিত ছিলেন। সভাকক্ষে তুমুল গোলযোগের মধ্যে মন্মথচন্দ্র সহ দশজন বাঙালী সভাকক্ষ থেকে বেরিয়ে যান। জীবনের শেষ প্রায় ২৭ বৎসর তিনি ইংল্যাণ্ডেই কাটান, তবে এই সময়ের মধ্যে এশিয়ার নবোদ্ভূত শক্তিশালী দেশ জাপানে তিনি একাধিকবার গিয়েছিলেন এবং ভারত ও জাপানের মধ্যে মৈত্রীবন্ধন সুদৃঢ় করার চেষ্টা করেন। মন্মথচন্দ্র হলেন তৃতীয় ভারতীয় (অন্য দুজন হলেন দাদাভাই নৌরজী এবং মনচারজি ভাওয়ানগিরি) যিনি দুবার (১৯০৬ ও ১৯১০) বিলাতের Liberal Party দ্বারা সমর্থিত হয়ে পার্লামেন্টের সভ্যপদের জন্য নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছিলেন। ইংরেজি ভাষায় লিখিত মন্মথচন্দ্রের কতকগুলি পুস্তক আছে।

(১৪৬) 'British Paramountcy and Indian Renaissance, Part-II'(2nd edition, 1981) General Editor : R.C. Majumdar, p 500.

(১৪৭) 'The scheme for a Constitutional Reform Association sprang from the Irish party at Westminister. In 1874, Frank Hugh O'Donnell, who claimed to be directing brain of Issac Butt's parliamentary group, and who took it upon himself to represent the unenfranchised Empire, had suggested that Indian political leaders should co-operate with the Irish.'—'The Emergence of Indian Nationalism' (1st Indian Reprint, 1982) Anil Seal, p. 258.

(১৪৮) ২৮ শে ডিসেম্বর, ১৮৭৫-এ প্রকাশিত নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'ভুবন-মোহিনী প্রতিভা-'র সমালোচনায় কিশোর রবীন্দ্রনাথ 'Irish Melodies' থেকে অনূদিত অংশ বিশেষ ব্যবহার করেছিলেন। প্রশান্তকুমার পাল তাঁর 'রবি-জীবনী, ১ম খণ্ড' (১৩৮১) গ্রন্থে (পৃঃ ৩১৫-৩১৬) জানিয়েছেন যে এই সমালোচনারও আগে 'মালতী পুঁথি'-তে রবীন্দ্রনাথ-অনূদিত 'Irish Melodies' কাব্যের অংশ বিশেষ আছে।

(১৪৯) 'The Indian Mirror,' 6th June, 1875, p. 6.

শব্দসূচী ঃ

অশুদ্ধি সংশোধন :

পৃষ্ঠা…পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩ … ১৪	পরলোকো	পরলোকে
৫ … ১৩	প্রকাশ করেছে।	প্রকাশ করেছে। ১৭
১২ … ২	করেছেন	করছেন
১৪ … ১	The Great Wahabi	The Great Wahabi Case
১৭ … ১২	রিচার্ডও	রিচার্ড
২১ … ২০	কালীকৃণ্ড	কালীকৃষ্ণ
২২ … ২১	খুবসভা	যুবসভা
৪০ … ১৯	১৮৭৪	১৯০৫
৪১ … ১০	‘শ্রমজীবী সমিতি’	‘শ্রমজীবী সমিতি’র
৪২ … ২২	England of	of England
৪৩ … ১৬	যথো	যযো
৪৮ … ২০	বক্ষ্যমান	বক্ষ্যমাণ
৫৪ … ১৭	S·epticiom	Seepticism
৭০ … ৫	আমাদের দুর্গোৎসব	আমার দুর্গোৎসব
৭৩ … ৯	এক্ষনীকার	এক্ষণ কার
৭৭ … ১৪	রাএপ্রিল	২রা এপ্রিল
৯২ … ৪	Aucklad	Auckland
৯৫ … ৭	the which	the expenses to which
৯৬ … ২৭	2 nestion	Question
১১০ … ২৫	২য় খণ্ডে	দুই খণ্ডে
১৮৬ … ২৬	সুখ্যতঃ	মুখ্যতঃ
১৯১ … ১৪	বসবাম	বসবাস
২২৪ … ১	Uhited	United